ব্রাহ্মণ্য ভাবধারা ও আধুনিক হিন্দু মন

অশোক রুদ্র

পিপলস্ বুক

১২, বঙ্কিম চ্যাট

কলকাতা—৭

BRAHMANYA BHABDHARA O ADHUNIK HINDU MON

প্রথম প্রকাশ—ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮

প্রকাশক :
বিভা রায়
পিপলস্ বুক সোসাইটি
১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০৭৩

মুদ্রক :
কল্পনারানী মাইতি
নিউ গ্রন্থপরিক্রমা প্রেস
৩০/১বি, কলেজ রো
কলকাতা ৭০০০০৯

প্রচ্ছদ—প্রবীর সেন

মঞ্জুকে

কৃতজ্ঞতা সহকারে

মুখবন্ধ

এই গ্রন্থের বারোটি অধ্যায়ের প্রথমটি ছাড়া আর এগারোটি অধ্যায়েরই বিষয়বস্তু প্রবন্ধাকারে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, ঐ প্রবন্ধগুলিকে কিঞ্চিৎ পরিমার্জিত করে অধ্যায়গুলিকে দাঁড় করানো হয়েছে। মূল প্রবন্ধের নাম ও প্রকাশের বিবরণ প্রত্যেকটি প্রবন্ধের শেষে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু এই গ্রন্থটি কোনক্রমেই একটি প্রবন্ধ সংকলন নয়। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ যার অংশ বিশেষ বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধের আকারে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

যদিও গ্রন্থটির অধিকাংশ অধ্যায়ে যা আলোচিত হয়েছে তার বিষয় ধর্মসংক্রান্ত কিন্তু তার পিছনে যে অনুপ্রেরণা কাজ করেছে তা রাজনৈতিক। আমার ধারণা এই যে সমাজকে পরিবর্তিত করতে হলে শুধু অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বা শুধু রাষ্ট্রের কাঠামোকে পরিবর্তন করাটাই যথেষ্ট নয়, মানুষের মনকে পরিবর্তন করা অত্যন্ত প্রাথমিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের মনকে পরিবর্তন করতে হলে সেই মনকে বুঝতে হয়। আমার ধারণা যে আধুনিক ভারতবাসীর মনকে কখনই বোঝা সম্ভব নয় যদি এই মনের উপর ব্রাহ্মণ্য ভাবধারার প্রভাবকে ভাল করে না বোঝা হয়।

মার্কসবাদী চিন্তাধারায় ইতিহাসের গতিকে বুঝতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক ধারণার আশ্রয় নেওয়া হয়। যথা, উৎপাদন ব্যবস্থা (mode of production), সমাজ ব্যবস্থা (social formation), ভিত্তি কাঠামো (infra-structure) ও উপরিস্থিত-কাঠামো (super-structure)। এই উপরিস্থিত কাঠামোর এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল যাকে ইংরেজীতে বলে 'ইডিয়োলজি'। ইতিহাসের যে কোন পর্বে ইডিয়োলজির ঐতিহাসিক কাজ হল তৎকালীন উৎপাদন ব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থাকে জনমানসে গ্রহণযোগ্য করে সেই ব্যবস্থাদের স্থিতিশীলতা প্রদান করা।

সাম্প্রতিক মার্কসবাদী আলোচনায় ভারতবর্ষের আধুনিক ও মধ্যযুগীয় ইতিহাসকে আধা-সামন্ততন্ত্র, সামন্ততন্ত্র প্রভৃতি তাত্ত্বিক ধারণার কাঠামোয় ধারণ করার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। আমাদের মতে এই প্রচেষ্টা কিছুমাত্রই সাফল্য অর্জন করেনি। আমাদের মতে ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের গতিকে তাত্ত্বিক আধার দানের জন্য সম্পূর্ণ নূতন এক উৎপাদন ব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থার ধারণার প্রয়োজন, যে ধারণাগুলির সঙ্গে মার্কসকথিত Asiatic mode of production এর একাত্মতা থাকবে না কিন্তু আত্মীয়তা থাকবে। এই তাত্ত্বিক ধারণায় এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে ইডিয়োলজিকে, যাকে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে আমরা ধর্ম বলে চিনে নিতে পারি। গ্রন্থটির প্রথম অধ্যায়ে ব্রাহ্মণ্য ভাবধারার কিছু বৈশিষ্ট্য, যা আধুনিক হিন্দুমনকেও চিহ্নিত করে, তার আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটির অন্তিম অধ্যায়ে সামন্ততন্ত্র বা আধাসামন্ততন্ত্রের বিকল্প হিসাবে এক ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের ধারণার সূত্রপাত করা হয়েছে, অন্তবর্তী দশটি অধ্যায়ে ব্রাহ্মণ্য ভাবধারার বিভিন্ন দিকের বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

এই আলোচনায় সাক্ষ্য প্রমাণরূপে আমরা যা পরিবেশন করেছি তা রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক সাহিত্য থেকে সংগৃহীত উদ্ধৃতি। এই বিশেষ সাহিত্যের উপর নির্ভর করার কারণ প্রথম অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করে রাখা যাক্ যে যেখানেই কোন ব্যতিক্রমের উল্লেখ করা হয়নি সেইখানেই আমরা নিম্নলিখিত অনুবাদগুলি ব্যবহার করেছি। মহাভারতের ক্ষেত্রে কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ। রামায়ণের ক্ষেত্রে "আর্যশাস্ত্র" প্রকাশিত অনুবাদ। এবং পুরাণ উপপুরাণের ক্ষেত্রে পঞ্চানন তর্করত্ন কৃত অনুবাদ। প্রত্যেকটি অধ্যায়ের শেষে একটি করে উদ্ধৃতি-নির্দেশক বা উল্লেখপঞ্জী দেওয়া হয়েছে। 'মহাভারত' ও 'রামায়ণ' কথা দুইটি কোথাও ব্যবহার হয়নি, শুধুমাত্র পর্ব ও কাণ্ডের উল্লেখ করা হয়েছে। বলাই বাহুল্য এই ব্যাপারে ভুল বোঝার কোন অবকাশ নেই।

গ্রন্থটি আয়তনে ক্ষুদ্র। কিন্তু এর পশ্চাতে লেখকের সামান্য ধী-ক্ষমতার এক খুব বড় অংশই ব্যয়িত হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে চিন্তা ও পাঠ শুরু করি প্রায় কুড়ি বৎসর আগে। পৌরাণিক সাহিত্য থেকে উদ্ধৃতি সংগ্রহের সময় ও পরিশ্রম সাপেক্ষ কাজটি শুরু করা হয় ১৯৬৮ সালে। এই কাজে আমি প্রভূত সাহায্য পেয়েছিলাম তৎকালে গবেষণার ছাত্র ও বর্তমানে বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রী প্রণবানন্দ যশের কাছ থেকে। তাঁর কাছে আমার ঋণ কৃতজ্ঞতা সহকারে স্মরণ করি। একই সাহায্য কিয়ৎপরিমাণে পেয়েছিলাম আমার ভগিনীতুল্যা দীপা মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। তাঁকেও ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জানাই শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায়কে আমার এই প্রচেষ্টায় উৎসাহ প্রদানের জন্য।

অশোক রুদ্র
শান্তিনিকেতন

প্রথম অধ্যায়

আলোচ্য বিষয় ও আলোচনার কাঠামো

১

হিন্দু কথাটি অর্বাচীন। কিন্তু আজকের দিনের ভারতবর্ষীয়দের প্রসঙ্গে শব্দটি যথেষ্টই অর্থবহ বলে মনে করি। এক ইসলাম ধর্ম অনুসরণকারীদের বাদ দিলে এই মহাদেশের অধিবাসীদের আর সকলের মধ্যেই খুঁজলে একটি বিশেষ মনের ধাঁচ বা গঠন আবিষ্কার করা যায়। এই মনটিকে গঠন করেছে যে ভাবধারা তাদের উৎস আমার মতে নিহিত রয়েছে প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণদের প্রচারের মধ্যে, যে প্রচারকে এক অত্যাশ্চর্য সঙ্গতি সহকারে পরিবাহিত করা হয়েছিল একই কালে বিভিন্ন প্রণালীতে—উচ্চমার্গের দর্শন, মধ্যস্তরের শাস্ত্র এবং সাধারণ লোকের উপযোগী রামায়ণ, মহাভারত, অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণ প্রভৃতিতে। এই ভাবধারাকে আমরা ব্রাহ্মণ্য ভাবধারা আখ্যা দেবো। আজকের দিনের হিন্দুমনকে বুঝতে গেলে এই ব্রাহ্মণ্য ভাবধারাকে বোঝা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। যারা খোলাখুলিভাবেই সনাতন হিন্দু আচার অনুষ্ঠান রীতিনীত মেনে চলে শুধু তাদের কথাই বলা হচ্ছে না। বৌদ্ধ খৃষ্টান জৈন এদেরকেও এর মধ্যে অন্তর্গত করা হচ্ছে। শুধু সাধারণ অশিক্ষিত বা অর্ধ-শিক্ষিত জনগণের কথাও না, আমাদের সমাজে শিক্ষায় দীক্ষায়, সংস্কৃতিতে আচরণে যারা একেবারেই শীর্ষস্থানীয়, যারা নিজেদের খুবই আধুনিক মনের অধিকারী বলে মনে করে থাকে, যাদের কেউ কেউ বা উগ্ররকমের পাশ্চাত্ত্য বুর্জোয়া ভাবধারায় সিঞ্চিত, অপর কেউ বা মার্কস্‌বাদী সমাজ ও রাজনৈতিক দর্শনকে গ্রহণ করে নিয়েছে, এদের সকলের মধ্যেই সন্ধান করলে একই মৌলিক মানসিক গঠন লক্ষ্য করা যায় বলে আমার ধারণা।

এই মানসিক গঠনের সৃষ্টিকারী ব্রাহ্মণ্য ভাবধারার আলোচনাই আমাদের পুস্তকের বিষয়বস্তু। আমরা আমাদের আলোচনায় উচ্চমার্গের দর্শন ও মধ্যস্তরের শাস্ত্রগুলিকে একেবারেই এড়িয়ে যাব, সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করব রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক সাহিত্যের উপর। তার কারণ এই যে আমাদের মতে এই সাহিত্যের দ্বারা সাধারণ ভারতবাসীর জীবনধারা যতটা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছে ততটা উচ্চতর মার্গের দার্শনিক চিন্তার দ্বারা হয়নি। শুধু তাই না, এই পুরাকাহিনীগুলির সঙ্গে ভারতবর্ষীয় জনমানসের সম্পর্ক একতরফা নয়। আমরা জানি যে এই সাহিত্যগুলি কোন এক সময় একজন সাহিত্যকারের দ্বারা সৃষ্ট হয় নি। দীর্ঘকালের উপর দিয়ে অসংখ্য অজ্ঞাত লেখকদের সংযোজনে সমৃদ্ধ হয়ে এইগুলি গড়ে উঠেছে। এই পদ্ধতিতে এই সাহিত্য যেমন জনমানসকে প্রভাবান্বিত করেছে তেমনি জনমানসের মূল্যবোধও এই সাহিত্যের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। এই কারণে আজকের সাধারণ হিন্দু মানুষের মন বোঝার জন্য এই সাহিত্য আমাদের কাছে সর্বাপেক্ষা উপযোগী মনে হয়েছে।

২

ব্রাহ্মণ্য ধারার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে পাপপুণ্যের বিচার, ধর্মাধর্মের বিশ্লেষণ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে যে রাশি রাশি পরিমাণে পাপ ও পুণ্যের বিবরণ পাওয়া যায় তাদের বিশ্লেষণের উপযোগী করে শ্রেণীবদ্ধ করার প্রচেষ্টা করব। খুব সম্ভবত অন্য কোন দেশেরই প্রাচীন সাহিত্যে ও শাস্ত্র চিন্তায় নীতিদুর্নীতি নির্ণয় নিয়ে এত অনুসন্ধান করা হয় নি। রামায়ণ মহাভারতের সঙ্গে তুলনীয় যে সব মহাকাব্য অন্যান্য সভ্যতার প্রাচীন পর্বে রচিত হয়েছিল তাদের নায়ক নায়িকারা প্রায়ই সম্পূর্ণ নীতির চেতনাহীন, আদিম শারীরিক ও মানসিক প্রবণতার দ্বারা তারা প্রায় সম্পূর্ণভাবেই চালিত হত। নীতিচেতনা তাদের মধ্যে কিছু থেকে থাকলেও তা ছিল অত্যন্ত স্থূল আকারের। প্রাচীন ভারতীয় নীতিচিন্তায় স্থূলতার কোন অভাব ছিল না। পাপপুণ্য সংক্রান্ত রাশি রাশি চিন্তা যা আমাদের পৌরাণিক সাহিত্যকে বৈশিষ্ট্য প্রদান করে তার মধ্যে যে প্রভূত পরিমাণে কখনো হাস্যকর কখনো কিম্ভুত কিমাকার কুসংস্কারের প্রাধান্য থাকবে তা মোটেই আশ্চর্য নয়। যা আশ্চর্য তা এই যে তাদেরই সঙ্গে সহাবস্থান করে আছে বিভিন্ন উচ্চস্তরের নীতিচিন্তা, উচ্চতম স্তরে যা এমন নীতিঘটিত দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের সৃষ্টি করে যাকে কখনও বিংশ শতাব্দীর সমকালীন বলে মনে হয়। এই প্রসঙ্গে রামের তথাকথিত পিতৃআজ্ঞা পালন করে বনবাসে যাওয়ার নৈতিকতার সম্পর্কে রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, কৈকেয়ী, কৌশল্যা, ভরত প্রভৃতি নাটকের প্রধান কুশীলবরা যে বিভিন্ন সূক্ষ্ম পরপরস্পর বিরোধী যুক্তি দিয়ে একটি ধর্মসংকটের সৃষ্টি করেন তার দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ধর্মের আপেক্ষিকতার বিষয়ে এমন একটি existentialist দৃষ্টিভঙ্গী দেশে বিদেশের পৌরাণিক সাহিত্যে আর কোথাও এত চমৎকারভাবে প্রকাশিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

নৈতিকতা নিয়ে এই প্রকার চিন্তাভাবনা যে দেশের প্রাগৈতিহাসিক ঐতিহ্যে এত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে সেই দেশের ঐতিহাসিক যুগে সমাজ জীবনে নৈতিকতার মান কি করে অতটা নেমে গিয়েছিল তা আপাতদৃষ্টিতে একটি জটিল প্রহেলিকা। মধ্যযুগে বিদেশ থেকে আগত পর্যটকেরা যারা ভারতবর্ষ সম্পর্কে অনেক সাক্ষ্য রেখে গিয়েছেন তাঁদের অনেকেই ভারতবর্ষের লোকেদের চূড়ান্ত রকমে মিথ্যাচারী ও অন্য নানানভাবে দুর্নীতিপরায়ণ বলে বর্ণনা করে গিয়েছেন। তাঁদের কথার উপর কতটা আস্থা রাখা হবে তার আলোচনা না করেও একথা নিশ্চয়ই বলা যায় যে ব্রিটিশদের ভারতে আগমনের কালে ভারতবর্ষীয়দের সমবেত তথা ব্যক্তিগত নৈতিক আচরণের মধ্যে এমন কোন গুণের অস্তিত্ব বেশী খুঁজে পাওয়া যায় না যাকে কোন ধর্ম অনুসারেই প্রশংসনীয় মনে করা যায়। বস্তুতঃ পুরুষকার বা চারিত্র বলতে যা বোঝায় তা এই দেশীয় মানুষের মধ্যে সেই যুগে খুবই কম পরিলক্ষিত হত। অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে নৈতিক অন্ধকার সমাজ জীবনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল বিংশ শতাব্দীতে তা অনেকটাই কেটে গিয়েছে সন্দেহ নেই। তথাপি স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে দুর্নীতি, যে বিষয়ে সকলেই সোচ্চার কিন্তু যার প্রতিকারের পথ কেউই দেখাতে পারছে না, তাও নিশ্চয়ই সম্ভব হোত না যদি না এযুগেও এদেশীয় ব্যক্তি মানুষের সত্ত্বা চারিত্রের অভাবে পঙ্গু দশাগ্রস্ত হত। চিন্তায়

নৈতিকতা উপর এতদূর গুরুত্ব-প্রদান এবং আচরণে এতদূর নৈতিক শিথিলতা—এর মধ্যে যে সংঘাত তা কিন্তু নিতান্তই আপাতিক না। আমরা আলোচনা করে দেখাব যে এই দুইটি ঘটনার মধ্যে কোনোই বিরোধ নেই। বর্তমান কালের এবং পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক যুগের ভারতবর্ষীয়দের আচরণে নীতিহীনতা প্রাগৈতিহাসিক যুগের চিন্তায় নীতি সর্বস্বতারই সাক্ষাৎ ও প্রত্যক্ষ ফল।

এই প্রসঙ্গে এ দেশের হাল-আমলের সমাজতাত্ত্বিকদের অনেকের সঙ্গে আমার দৃষ্টিভঙ্গীর একটি মূলগত প্রভেদের দিক নিজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ভারতীয় সমাজ জীবনে যত দোষ ত্রুটি সবেরই মূল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদে নিহিত, আজকের বাঙালী মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির সব রোগের বীজ বপন করেছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত—এরকম একটা ধারণা আজকাল খুবই সাধারণভাবে গৃহীত। আমরা এই সূত্রটিকে একেবারেই গ্রহণযোগ্য মনে করি না। আমাদের মতে ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের প্রভাবের তুলনায় পশ্চিম থেকে আগত যেকোন প্রভাবই আজ অবধি অত্যন্ত নগণ্য রয়ে গিয়েছে।

৩

প্রথমেই নেওয়া যাক্ আমাদের ধর্মীয় চিন্তায় যান্ত্রিকতার প্রভাবের কথা। যান্ত্রিকতা বলতে আমরা বুঝছি কিছু রীতিবদ্ধ ক্রিয়াকলাপের অমোঘ ফলস্বরূপ কিছু প্রার্থিত বস্তু বা অবস্থার প্রাপ্তি। যে কোন দেশের ধর্মীয় চিন্তাতেই কম বেশী পরিমাণে এই যান্ত্রিকতা বর্তমান। ধর্মীয় চিন্তা যত বেশী পরিমাণে আদিম তত বেশী পরিমাণে তার মধ্যে এই যান্ত্রিকতার গুরুত্ব। কিন্তু আমাদের ধর্মীয় ঐতিহ্যকে তো আদিম আখ্যা দেওয়া যাবে না। তা সত্ত্বেও এই ঐতিহ্যে যান্ত্রিকতার স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্যই এই যে এতে একেবারে আদিম স্তরের যান্ত্রিকতায় আস্থা উচ্চতম ও সূক্ষ্মতম স্তরের দার্শনিক চিন্তার পাশাপাশি বিরোধহীন ভাবে সহাবস্থান করে। আজকের দিনের উচ্চতম স্তরের শিক্ষিত মানুষের ধর্মীয় ভাবজগতে চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে যে হরেক প্রকারের গুরুরা তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্যই এই যে তাঁরা একই কালে উচ্চমার্গের দর্শন চর্চা ও প্রচারও করেন আবার নানান্ অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ দ্বারা ভক্তদের চমকও লাগিয়ে দেন। আজকের সাঁইবাবা, একশ বছর আগের রামকৃষ্ণ এবং মহাভারতের কৃষ্ণ—এদের মধ্যে একই ধারা প্রবাহিত: উচ্চস্তরের তাত্ত্বিক বাণী গ্রহণ করাবার জন্য তাঁদের আশ্রয় নিতে হয় এমন ক্রিয়াকলাপের যা যাদুবিদ্যার সমপর্যায়ের।

এই যান্ত্রিকতা ধর্মীয় চিন্তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে দুই ভাবে। এর মধ্যে মানুষের হিতাহিত, মঙ্গল-অমঙ্গল, কল্যাণ-অকল্যাণের ধারণার অস্তিত্বই নেই। ফলে হিতাহিতের ধারণার উন্মেষই ঘটতে পারে নি। দ্বিতীয়তঃ, দার্শনিক চিন্তা, যা ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যেও যুক্তি-নির্ভর, তার সঙ্গে যান্ত্রিকতার আপোসের ফলে যুক্তিবাদিতার উন্মেষ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।

সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞান আশ্রয়ী যুক্তি নির্ভর মন এই কারণে আমাদের দেশে অত্যন্ত বিরল। আমাদের দেশের সংস্কৃতিতে কোন বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবাদী বিপ্লবই সংগঠিত হয় নি, যেমন হয়েছিল ইয়োরোপের রেনেসাঁসের যুগে। ইয়োরোপ ও আমেরিকার সাধারণ লোকেদের মধ্যেও যে কুসংস্কারের অস্তিত্ব নেই, তা মোটেও না। সে দেশেও মেলায় তাঁবু খাটিয়ে

জিপ্‌সী মেয়েরা হস্তরেখা বিচার করতে বসে, কৌতূহলী প্রমোদকারীরা জেনে নেয় তাদের প্রেমিকের সঙ্গে মিলন হবে কি হবে না, বিদেহী আত্মাদের সঙ্গে কথোপকথন করা জাতীয় ক্রিয়াকলাপও অনেক মহলে জনপ্রিয়। কিন্তু সে দেশে বিজ্ঞান ও কুসংস্কার একই মনে সহাবস্থান করে না। কুসংস্কার পিছু হটছে, বিজ্ঞান তার জমি দখল করে নিচ্ছে, কুসংস্কারে আস্থাশীল ব্যক্তিরা উত্তরোত্তর সংখ্যায় নগণ্য হয়ে উঠছে। বিশেষ করে বিজ্ঞানকে যিনি অধ্যয়ন অধ্যাপনা ও গবেষণার জন্য বেছে নিয়েছেন সেইরকম ব্যক্তি কোনপ্রকার কুসংস্কার মেনে চলছেন তা কল্পনাই করা যায় না। কিন্তু আমাদের দেশের বিজ্ঞানীদের মনটা স্পষ্টতই দুই ভাবে বিভক্ত। তাঁরা যখন তাঁদের গবেষণাগারে কাজ করেন তখন একটা 'মন' নিয়ে কাজ করেন। কিন্তু বাদবাকী সময় অন্য একটা 'মন' তাঁদের আচরণকে চালিত করে, যে মনটা আপামর জনসাধারণের আদিম সংস্কার-আশ্রয়ী মনের থেকে কিছুমাত্র ভিন্ন নয়।

যন্ত্রদের মধ্যে সবচেয়ে সরল ও বিশ্বজনীন উদাহরণ অবশ্যই পূজা, যাগযজ্ঞ ইত্যাদি। এই জাতীয় ক্রিয়াকলাপ অন্যান্য ধর্মীয় ঐতিহ্যেও আছে। কিন্তু এমন কিছু ধর্মীয় যন্ত্র এই ঐতিহ্যের অংশ যা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট, যার প্রতিরূপ অন্যান্য ধর্মীয় ঐতিহ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি। সর্বকালের সর্বদেশের সমাজেই স্তরভেদ আছে। কিন্তু আমাদের সমাজে বর্ণ ও জাতিভিত্তিক স্তরভেদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছে একটি অপবিত্রতার ধারণা ও তদ্‌ভিত্তিক আচরণ পদ্ধতি— যা একান্তই ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের অংশীভূত। ছুৎমার্গের কথা বলছি। কোন কোন স্তরের মানুষকে স্পর্শ করলে বা তার স্পর্শ করা খাদ্য গ্রহণ করলে পতিত হতে হয়—অপবিত্রতার এই ধারণা। এই ধারণার সঙ্গে কর্মফল ও পুনর্জন্মের যান্ত্রিক ধারণাগুলি যুক্ত হয়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যকে এক তাত্ত্বিক ভিত্তি দান ক'রে কেবলমাত্র তাকে তুলনাতীতভাবে ক্রূরই করে তোলে নি, তাকে অমোঘ অপরিবর্তনীয় রূপে প্রতিভাসিত ক'রে মানবতান্ত্রিক তথা গণতান্ত্রিক ধারণার উন্মেষকে অসম্ভব করে তুলেছে। দ্বিতীয় উদাহরণ—প্রায়শ্চিত্ত। যে কোন ধরণের এবং যত বড় পাপই করা হোক তার কিছু না কিছু প্রায়শ্চিত্তের বিধান শাস্ত্রে দেওয়া আছে। কৃত পাপের জন্য অনুতাপের প্রয়োজনের অবকাশ রাখা হয় নি। গঙ্গোদক, গোময়, ব্রাহ্মণভোজন প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্তের প্রকরণগুলি সবই নিরঙ্কুশ ভাবে যান্ত্রিক। এরকম বাহ্যিক উপায়ে যে পাপের ফলকে এড়িয়ে যাওয়া যায় সেই পাপের ধারণাটার সঙ্গে মানুষের বা সমাজের কল্যাণ অকল্যাণের অথবা কোন আন্তরিক শুদ্ধির সম্পর্ক নিশ্চয়ই নেই।

অনেক বেশি পরিমাণে ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরই বৈশিষ্ট্যবহনকারী যন্ত্রের উদাহরণ হল পুরাণবর্ণিত শাপ ও বর। শাপ ও বরের যান্ত্রিকতার বিশদ আলোচনা আমরা পঞ্চম ও অষ্টম অধ্যায়ে করব।

পৌরাণিক কাহিনীতে যেভাবে হত ঠিক সেইভাবে না হলেও ক্রিয়াকাণ্ডের মাধ্যমে অলৌকিক উপায়ে কোন মহার্ঘ পুরস্কার লাভ করা বা কোন শত্রুপক্ষের ক্ষতিসাধন করার সম্ভাবনায় আস্থা একেবারে অধুনা কালের ভারতীর মনেও খুবই প্রবলভাবে বর্তমান। দেবতার কাছে মানত করা, ধরনা দেওয়া, সাধু সন্ন্যাসী গুরু প্রভৃতিদের দ্বারা প্রদত্ত তাগাতাবিজ গ্রহরত্ন ও অন্যান্য মন্ত্রপূত বস্তুর ব্যবহার করা, শান্তিস্বস্ত্যয়নের উদ্দেশ্যে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান

করা প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ আজকের ভারতবর্ষে সমাজের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যেও প্রভূত পরিমাণেই প্রচলিত। অনুরূপ কুসংস্কারের অস্তিত্ব যে ইউরোপ ও আমেরিকার মানুষের মধ্যে পাওয়া যাবে না তা মোটেই নয়। কিন্তু মাত্রার ভেদ এতই বিশাল যে কোন তুলনার প্রশ্নই উঠতে পারে না।

৪

শাপ ও বরের চেয়ে আধুনিক হিন্দু মনে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে অপর একটি ধারণা, যা এই দুইটি মন্ত্রশক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। বলছি কৃচ্ছ্রের মাহাত্ম্যের কথা। শাপ দেওয়ার ও বরদান করার ক্ষমতা প্রায়শই অর্জন করা হত তপস্যার মারফত, কৃচ্ছ্রের ফলস্বরূপ। তপস্যা ছিল বর আদায় করার একটি যান্ত্রিক উপায়। কৃচ্ছ্র বা আত্মনিগ্রহ যত বেশী পরিমাণে করা হবে ফলপ্রাপ্তিও ঘটবে তত বেশী পরিমাণে। এই নিয়মটা ছিল প্রায় অমোঘ। বর প্রার্থনা ও বরপ্রদান করা উভয় পক্ষেই যে মনোভাবের প্রকাশ পেতো তা হ'ল এক পক্ষে মাত্রাহীন লোভ, হিংসা, দ্বেষ অপরদিকে যুক্তিহীন, বুদ্ধিহীন, উন্মাদসদৃশ অবিমৃষ্যকারিতা। এই বিষয়টি অষ্টম অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

কৃচ্ছ্রের সঙ্গে মহত্ত্বের এই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আধুনিক হিন্দু মনেও খুবই শক্তিশালী ভাবে সক্রিয় রয়েছে। আজকের দিনের ভারতবর্ষেও যে সব সাধক ব্যক্তিদের সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা আর ভক্তি নিবেদন করা হয়, তাঁদের অধিকাংশেরই গৌরবের ভিত্তি সমাজ সম্পর্কে তাঁদের কোন হিত-কারী কার্যকলাপ বা মনোভাব নয়। সেই ভিত্তিতে রয়েছে তাঁদের সাধনার কঠোরতা। শুধু কঠোরতা নয়, সাধনার মধ্যে যত বেশী বীভৎসতা সাধনার স্তরকেও মনে করা হয় তত বেশী উচ্চ। শবদেহ নিয়ে নাড়াচাড়া করা, মরার খুলিতে কারণ পান করা—এসব তো নিতান্তই সাধারণ ব্যাপার। যাঁরা সত্যিকারের মহাসাধক তাঁদের কেউ শীত গ্রীষ্ম এবং সাধারণ মানুষের শালীনতাবোধকে কাঁচকলা দেখিয়ে দিগম্বর অবস্থায় থাকেন, কেউ বা নিজের বিষ্ঠা ভক্ষণ করেন, ইত্যাদি।

তপস্যার দ্বারা জবরদস্তি করে বর আদায় করা যায় এই ধারণাটাও আধুনিক ভারতর্ষের রাজনীতির ক্ষেত্রে খুবই প্রকট ভাবে বর্তমান। উদাহরণ হিসেবে ভাবা যাক গান্ধীর দ্বারা প্রবর্তিত অনশন ধর্মঘটের পদ্ধতি। দাবিটা কী, তার যৌক্তিকতা বা নৈতিকতা কতটা, দাবির সমর্থনে জনমত কতটা আছে, দাবি মেটালে সমাজের উপকারই বা কতটা হবে আর অপকারই বা কতটা হবে—এসব কিছুই ধর্তব্যের মধ্যে নয়। উপবাস করে মহাত্মাজীর শরীর ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে, তাঁর ওজন কমছে, তাঁর নাড়ির গতি শ্লথ হয়ে আসছে, সুতরাং আগে হোক পরে হোক, ব্রিটিশ সরকারের আসনকে টলতে হবেই যেমন টলত ব্রহ্মার আসন, বিষ্ণুর আসন, অন্য দেবদেবীর আসন। ভারতবর্ষের জনগণও এই পদ্ধতিটির মধ্যে বেশ এক সুবিধাজনক অস্ত্র আবিষ্কার করেছে। কথায় কথায় অনশন ধর্মঘট করে দাবি আদায় করে নেওয়ার সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক যে রেওয়াজ ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে, তার মধ্যেও দেখি ঐ একই তপস্যার প্রতি আস্থা।

৫

ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত ধর্মীয় যন্ত্রগুলির মধ্যে এক ধরণের যন্ত্র আছে যার উদ্দেশ্য মোক্ষলাভের জন্য ইংরেজীতে যাকে 'শর্টকাট,' বলে সেই প্রকার পথ খুলে দেওয়া। শুধু তপস্যা নয়, অন্যান্য সব ধরণের সাধনভজন জাতীয় মোক্ষের অভিমুখী পন্থাগুলির অধিকাংশই অত্যন্ত দীর্ঘ। সাধন ভজন করে যেতে হয় সারাজীবন ধরে এবং একাধিক জন্ম ধরে। তপস্যা তো করা হোত সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ। কিন্তু এই সব অতিদীর্ঘ পন্থা নির্দেশ করে যে ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্য সে একই ঐতিহ্য বিকল্প ও সম্পূর্ণ বিপরীত হ্রস্ব পন্থারও নির্দেশ দেয়। তান্ত্রিক, কৌল, কাপালিক, সিদ্ধ প্রভৃতি তথাকথিত বামমার্গের সাধকদের অনুসৃত প্রণালীর কথা বলছি। ভারতবর্ষীয় ঐতিহ্যে ধর্মঅনুশীলনের মূল ধারার সর্বপ্রধান ভিত্তি হল ইন্দ্রিয়দের জয় করা। এই বিকল্প পন্থার মূল মন্ত্র ছিল আতিশয্যপূর্ণভাবে ইন্দ্রিয়দের চর্চা। পঞ্চ'ম'কারে সেবা যত উদ্ভট যত বীভৎস হবে সিদ্ধিলাভও হবে ত্বরান্বিত—এই ধারণা এই বিকল্প মার্গের কেন্দ্রস্থানীয়। একটি সংশ্লিষ্ট ধারণা ছিল—'শর্টকাট্' পথকে অধিকতর 'শর্ট' করে তোলা যায় রক্তের আহুতি দিয়ে। পশুবলি তো উপাচার হিসেবে খুবই সাধারণ ছিল। কিন্তু বলির শ্রেষ্ঠ ফল পাওয়া যেত নরবলি থেকে। এই আদিম চিন্তা ধারার সঙ্গেও আধুনিক ভারতবর্ষীয় মনের যোগ খুঁজে পাওয়া যায় বৈপ্লবিক রাজনীতির ক্ষেত্রে। এদেশে জাতীয়তাবাদকে জন্মই দেওয়া হয়েছিল ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের ভক্তি ও তৎসংশ্লিষ্ট বলিদানের ধারাকে সুচতুর ভাবে ব্যবহার করে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রকে অনুসরণ করে দেশকে কল্পনা করেছিলেন বাঙালীর জনপ্রিয় দেবী মাতৃরূপিনী দুর্গা ও একই কালে হিংস্রতার প্রতিমূর্তি কালী বা চণ্ডীর আকারে। এই সময়কার একজন বিপ্লবী লিখেছেন "শক্তি ও ধ্বংসের দেবতা কালী, দুর্গা বা ভবানীর নিকট আত্মনিবেদন করিয়া বিপ্লবীরা প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতেন। এই ধ্বংসের দেবতাদের সন্তুষ্টির জন্য বলির প্রয়োজন, অত্যাচারী ইংরেজ কর্মচারীরাই হইবে সেই বলি।" এই ধারা সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যেই সীমিত থাকে নি। সুভাষ বোস নাকি উদাত্ত কণ্ঠে জনগণকে সম্বোধন করে বলেছিলেন-"Give me blood, I will give you freedom." সুভাষ বোসও ছিলেন কালীভক্ত। কিন্তু মার্ক্সবাদী চারু মজুমদারও বলেছিলেন, শ্রেণীশত্রুর রক্তে হাত যে না ডুবিয়েছে সে সত্যিকারের কমিউনিষ্ট হয় নি। এই দুই উক্তি নির্ভুলভাবে এক রক্তের প্রতি আসক্তিকে প্রকাশ করে যার মূল অনুপ্রেরণা রাজনৈতিক নয়। একথা ঠিক যে কোন রক্তপাত না ঘটিয়ে সম্পূর্ণ অহিংস উপায়ে কোনো প্রকার সমাজ বৈপ্লবিক আন্দোলন সম্ভব নয়। কিন্তু রক্তের জন্যই রক্ত, হিংসার জন্যই হিংসার এই গাঢ় প্রবণতার উৎসকে মার্কসবাদে তো পাওয়া যাবেই না, এককালে আমাদের দেশের শিক্ষিত মহলে প্রভাবশালী গ্যারিবল্ডি প্রমুখ ইয়োরোপীয় বিপ্লবের প্রচারকারীদের মধ্যেও পাওয়া যাবে না। এই উৎস আমাদের মতে খুঁজে পাওয়া যাবে ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের তান্ত্রিক ধারায়।

জাতীয়তাবাদ এমনকি সমাজবাদী বিপ্লবের মধ্যেও ধর্মের এই অনুপ্রবেশ আমাদের দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষতির কারণ হয়েছে। অরবিন্দ ঘোষের পণ্ডিচেরীতে পলায়ন করে রাতারাতি ঋষি শ্রীঅরবিন্দে হওয়া, রাসবিহারী বসুর জাপানী ফ্যাসীবাদের চূড়ান্ত ক্রূর প্রকাশেও কিছু মাত্র বিচলিত না হয়ে জাপানে সরকারী অতিথি হিসেবে বাস করা, সুভাষ

বসুর বিদেশে সাহায্য লাভের প্রচেষ্টায় প্রথমে সোভিয়েত ইউনিয়ন পরে নাৎসী জার্মানীর মুখাপেক্ষী হওয়া, ব্যক্তিগত খুনের অভিযানে নকশালবাদের চরম বিপর্যয় ঘটা—এ সবই নির্ভুল ভাবে প্রমাণ করে যে বিশুদ্ধ রাজনৈতিক চিন্তার উন্মেষ এ দেশে এখনও ঘটে উঠতে পারে নি, ধর্মীয় প্রভাবের নির্মোক থেকে মুক্ত হতে পারে নি। এই প্রভাবের দরুণ আর একটি ক্ষতি যা হয়েছে তা হ'ল এমন এক দেশপ্রেমের প্রচার যার মধ্যে নেই দেশবাসীর প্রতি প্রেম। এমন এক সমাজবাদের প্রবর্তন যার মধ্যে নেই সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তি মানুষের কল্যাণ চিন্তা। দেশকে সমাজকে অগণিত সাধারণ ব্যক্তি মানুষের সমষ্টি হিসেবে না দেখে তাকে এক কল্পিত দেবীরূপে বন্দনা করলে বোধহয় এই অবস্থাই হয়।

৬

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম যখন এযাবৎ বর্ণিত যান্ত্রিকতার উর্দ্ধের কোন স্তরে উপনীত হয়েছে তখন তা প্রচার করেছে এমন একটি সুনীতির ধারণা যার মূল সূত্রই হোল তার আপেক্ষিকতা। সমাজের অন্তর্গত সব মানুষের জন্য একই নীতিবাদকে প্রযোজ্য বলে মনে করা হয় নি। মানুষের সামাজিক অবস্থার উপর নির্ভর করিয়ে ধর্মকে করা হয়েছিল খণ্ডবিখণ্ড। ধর্মের একটা ভাগ ছিল বর্ণভিত্তিক। ব্রাহ্মণের জন্য, ক্ষত্রিয়ের জন্য, শূদ্রের জন্য ছিল ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম। আর একটি বিভাজন ছিল লিঙ্গভিত্তিক—নারীদের জন্য ছিল নারীধর্ম। উচ্চবর্ণের ব্যক্তিদের জন্য ছিল তৃতীয় একটি বিভাজন এবং তা ছিল আশ্রম ভিত্তিক—গৃহস্থের জন্য গার্হস্থ্য ধর্ম, সন্ন্যাসীর জন্য সন্ন্যাস ধর্ম। ধর্মকে এইভাবে বিভাজন করার পশ্চাতে স্পষ্টতই ছিল প্রাচীন ভারতীয় সমাজ কর্তাদের সমাজ বিষয়ক সুচিন্তিত পরিকল্পনা। নিদারুণ বৈষম্য সমন্বিত স্তর বিভক্ত এক সমাজ ব্যবস্থাকে স্থিতিশীলতা প্রদান করা ছিল এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। উচ্চবর্ণের ব্যক্তিরা যেন চিরকাল নিম্নবর্ণের ব্যক্তিদের দ্বারা কৃত উৎপাদনের উত্তমাংশকে আত্মসাৎ ক'রে তাদের উপর কর্তৃত্ব করে যেতে পারে, নারীরা যাতে চিরকাল পুরুষদের পদানত থেকে যায়, তাই ছিল এই পরিকল্পনাকারদের কুণ্ঠাবিহীন সচেতন উদ্দেশ্য।

অধুনাকাল পর্যন্ত ঐতিহাসিক যুগে অধিকাংশ ভারতবর্ষীয় মানুষ জীবনের অধিকাংশ সময়ই যে নীতিবাদ অনুসরণ করেছে তা এই বর্ণভিত্তিক ধর্ম। এই ধর্ম ব্যক্তিমানুষকে নানাবিধ কর্তব্যের নির্দেশ প্রদান করে, কিন্তু গোষ্ঠিস্বার্থের উর্দ্ধে'র সমগ্র মানব সমাজের সব মানুষের কল্যাণ বা মঙ্গলের কোন ধারণাই এই ধর্মে ছিল না। শুধু সমাজ কল্যাণ নয় বিভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কেও হিতাহিতের কোন ধারণাই এই ধর্মে স্থান পায় নি। উদাহরণ, শূদ্রদের কর্তব্য ছিল উৎপাদন করা ও উচ্চতর বর্ণের ব্যক্তিদের সেবা করা ; ক্ষত্রিয়দের ধর্ম ছিল শত্রু বিনাশ করা ও ব্রাহ্মণদের দান করা ; ব্রাহ্মণদের কর্তব্য ছিল শাস্ত্র চর্চা করা, অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করা। এই কর্তব্য নির্দেশগুলির মধ্যে কোনোটিরই লক্ষ্য ছিল না পরার্থ।

এই আপেক্ষিক ধর্মের অবিরাম প্রচারের দ্বারা ভারতীয় মানুষের মনে দুইটি নৈতিক প্রবণতাকে দৃঢ় ও গভীর ভাবে প্রোথিত করা হয়েছিল। এই প্রবণতা দুইটি হোল বৈষম্যকে স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া এবং বশ্যতা স্বীকারের মনোভাব—যে কোন অবস্থাকে বিনা প্রতিবাদে বিনা প্রতিরোধে মেনে নেওয়া। এর পিছনে ছিল একটি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী—দৈবের

ধারণা। আর একটি দার্শনিক তত্ত্ব—কর্মফল। দৈবের বিপরীত পুরুষকারের ধারণাও যে ছিল না তা নয়। রামের বনগমনকালে রাম সাত তাড়াতাড়ি কৈকেয়ীর নির্দেশে বনগমনে রাজী হয়ে যান এই বলে যে, "জীব স্বভাবতই পরাধীন। সে স্বেচ্ছানুসারে কোন কার্য করিতে পারে না," কিন্তু লক্ষ্মণ তীব্রভাবে প্রতিবাদ করে বলেন "যাহারা বীর ও সংসারে পুরুষ বলিয়া সম্মানিত তাহারা কখনও দৈবের উপাসনা করেন না। যিনি নিজ পুরুষকারের দ্বারা দৈবকে বাধিত করিতে সমর্থ তিনিই দৈবের জন্য কদাচিৎ হতাশ হইলেও অবসন্ন হন না।" কিন্তু লক্ষ্মণ রামকে দিয়ে ঐ কথা মানাতে পারেন নি এবং পরবর্তীকালের ভারত-বাসীর মনকে গঠন করেছে লক্ষ্মণের আদর্শ নয়, রামের আদর্শ। দৈবকে মেনে নেওয়া এবং বশ্যতা স্বীকার করাই থেকে গিয়েছে ভারতবর্ষীয় মানুষের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। হিন্দু মনে বিদ্রোহের কোন স্থান কোনদিন ছিল না। ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যে Prometheus এর সমজাতীয় কোন দেবদ্রোহী পৌরাণিক চরিত্র নেই।

৭

এ যাবৎ যে আপেক্ষিক ধর্মের কথা বলা হল তার ঊর্ধ্বের এক সার্বজনীন ও অন্তত আপাতদর্শনে গোষ্ঠিস্বার্থ নিরপেক্ষ এক ধর্মের উন্মেষও ব্রাহ্মণ্য ধারায় ঘটেছিল। জাতি বর্ণ স্ত্রী পুরুষ গৃহস্থ সন্ন্যাসী নির্বিশেষে সব মানুষের প্রতি প্রযোজ্য এই উচ্চতর ধর্মকে প্রাচীন সাহিত্যে প্রায়শ পরম ধর্ম নামে অভিহিত করা হয়েছিল। এই ধর্মের প্রচারে মানবিক বৃত্তিদের পাপপুণ্যের নিরিখে দুই ভাগে ভাগ করে তাদের লম্বা লম্বা ফিরিস্তি দেওয়া হত। এই ফিরিস্তিগুলির বিশদ আলোচনা দ্বিতীয় অধ্যায়ে করা হয়েছে। আমাদের বর্তমান আলোচনার পক্ষে আপাতত প্রয়োজন এই দোষগুণ বিচারের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সবিশেষ ভাবে প্রণিধান করা। প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে এই পরম ধর্মেও জনকল্যাণ বা সমাজ কল্যাণ সম্পর্কিত কোন ধারণাই নেই। এই পরম ধর্মের অন্তিম লক্ষ্য মোক্ষ লাভ। কোন ব্যক্তির মোক্ষলাভের জন্য কখনই কোন অবস্থাতেই অপর কোন ব্যক্তিরই করণীয় কিছুই নেই। মোক্ষলাভেচ্ছু ব্যক্তিরও অপরের জন্য করণীয় কিছু নেই। কারণ এই পরম ধর্ম নিরঙ্কুশ রকমে আত্মকেন্দ্রিক। সমাজ দূরের কথা, স্ত্রীপুত্রের কথা চিন্তা করার দায়িত্বও সাধকের নেই—কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ বলে বেরিয়ে পড়লেই হল। মানবপ্রেমের কোন স্থান এই ধর্মে নেই। বলা হয়ে থাকে খৃষ্টধর্মের মূল বাণী Love thy neighbour। এর সঙ্গে তুলনীয় কোন একটি বাণীও সমগ্র ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে খুঁজে পাওয়া যাবে না। বস্তুত যে অর্থে love কথাটি খৃষ্টের বাণীতে ব্যবহৃত হয়েছে সেই অর্থ বহনকারী একটি শব্দও সংস্কৃত ভাষায় নেই। অর্থের দিক থেকে নিকটবর্তী শব্দ যা পাওয়া যায় সেইগুলি হল 'দয়া' 'করুণা' 'ক্ষমা' 'অনৃশংসতা' প্রভৃতি। কিন্তু এই গুণগুলির কোনোটিকেই মোক্ষলাভের প্রধান উপায় বলে কোথাও চিহ্নিত করা হয় নি। আরও একটি নৈতিক ধারণার অনুপস্থিতি পরম ধর্মকে চিহ্নিত করে। এই ধারণাটি হল ইংরাজীতে যাকে বলে justice। এই ইংরেজী শব্দেরও সমার্থক কোন শব্দ সংস্কৃতে আছে বলে আমার জানা নেই। আধুনিক-কালে আমরা বলি 'ন্যায়বিচার'। এই বাক্য ব্যবহারটিও অত্যন্ত অর্বাচীন বলে মনে হয়। শুধু মানবপ্রেমই নয় মানবতাবাদও এই ধর্মের সঙ্গে মূলগতভাবে সংঘাতের সম্পর্কে

সম্পর্কিত। জীবিত থাকাকেই সর্বপ্রকার শোকদুঃখের কারণ বলে নির্দেশ করা যে ধর্মের অন্যতম মূলসূত্র, জীবনকে শূন্যে বিলীন করে দেওয়াই যে ধর্মের অন্তিম লক্ষ্য এবং সামাজিক অস্তিত্বে বৈষম্যকে মেনে নেওয়াই যে ধর্মের অমোঘ বিধান তা মূলগতভাবেই মানবতা বিরোধী।

আত্মকেন্দ্রিকতা, অপর মানুষের হিতাহিত সম্পর্কে অনীহা, justice ও love এই দুই গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক ভাবের অনুপস্থিতি—এইগুলি সমাজকে ধারণ করে রাখার কাজে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মকে অনেকদূর পর্যন্ত অনুপযোগী করে তুললেও এই দুইটিকেই আমরা ঐতিহাসিক যুগের হিন্দুসমাজের ধর্মসংকটের প্রধান কারণ বলে মনে করি না। এইবার আমরা সেই প্রধান কারণের আলোচনায় আসব।

এই প্রধান কারণটা, আমাদের মতে, ব্রাহ্মণ্যধর্মের আভ্যন্তরীণ অসঙ্গতির দ্বারা বিদীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া। হিন্দুমনের সর্ব প্রধান বৈশিষ্ট্যই এই যে যুক্তিগত ও ভাবগত কোন অসঙ্গতিতেই ঐ মনে কোন প্রকার অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভূত হয় না। এই বিষয়ে একটি প্রামাণিক বাক্য রেখে গিয়েছেন প্রাচীন ভারত চর্চার ক্ষেত্রে পুরোধা স্থানীয় পণ্ডিত-চূড়ামণি ডি ডি কোশাম্বী মহাশয়। তিনি লিখেছেন শঙ্করাচার্যের বিরাট কীর্তি ছিল "A is either B or not B"—পাশ্চাত্ত্য যুক্তি শাস্ত্রের এই মৌলিক সূত্রটিকে নস্যাৎ করে দেওয়া। ঐ যুক্তি শাস্ত্র অনু-সারে কোন প্রস্তাবই একই কালে সত্য এবং অসত্য উভয়ই হতে পারে না। কিন্তু এই প্রাথমিক শর্তকে অস্বীকার করে হিন্দুমন একই কালে যাকে অসত্য বলে বর্জন করে তাকে সত্য বলেও মানে। একই কালে বিজ্ঞানে আস্থা রাখে ও কুসংস্কারের দ্বারা চালিত হয়। একই কালে আধুনিকতাকেও গ্রহণ করে, রক্ষণশীলতার সঙ্গেও করে আপোস। ঐতিহাসিক যুগের হিন্দুমনের এই অসঙ্গতি প্রবণতার জনক শঙ্করাচার্য ছিলেন না। সমগ্র ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের মধ্যেই এই মূল প্রবণতা একেবারে আদি থেকেই সর্ব প্রধান স্থান অধিকার করে এসেছে। শঙ্করাচার্য দার্শনিক কূটতা সহকারে ঐ প্রবণতাকেই সূত্রবদ্ধ করেছিলেন মাত্র। এই অসঙ্গতি আমাদের মতে ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের ধর্মীয় ধারণার পক্ষে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ধ্বংসকারী ভূমিকা পালন করেছে। আভ্যন্তরীণ সঙ্গতির অভাব থাকলে কোনো ধর্মই পারে না সমাজকে ধারণ করতে, যেমন পারে না কোনো বস্তুকে ধারণ করতে এমন কোনো পাত্র যা ভিতরে ফাটল ধরা। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম কিভাবে এই প্রকার আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের দ্বারা বিদীর্ণ হল আমরা এবার তার আলোচনায় রত হব।

৮

এই অন্তর্বিরোধের অন্যতম প্রধান কারণ সামাজিক অবস্থানভিত্তিক ধর্ম ও পরম ধর্মের মধ্যে সংঘাত। যে কোন ব্যক্তিকেই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম দুই প্রকার নৈতিক নির্দেশ দিয়ে থাকে। একটি নির্দেশ তার বর্ণ বা আশ্রম বা লিঙ্গের উপর নির্ভরশীল। অপর নির্দেশটি বিশেষণ ব্যতিরেকে মানুষ হিসেবে তার প্রতি প্রযোজ্য। এই নির্দেশগুলি প্রায়শই পরস্পর বিরোধী হতে বাধ্য। বস্তুত এই বিরোধের সম্ভাবনা না থাকলে সামাজিক অবস্থান ভিত্তিক ধর্মের আপেক্ষিক হওয়ার প্রশ্নই উঠত না। উদাহরণত, যখন বলা হয় "স্ত্রীগণের ভর্তাই মাতা, পিতা, বন্ধু, সখা, মিত্র ও বান্ধব ইহাতে সন্দেহ নাই, তাহারা ভর্তার প্রেমে পুলকিতগাত্রা

হইয়া যদি মহৎ পাপ করে, তাহা হইলেও পরম স্বর্গ লাভ করে, এর অন্যথায় নরকগামিনী হইবে'', তখন পরিষ্কার ভাবেই সতী ধর্মের সঙ্গে এমন এক পরম ধর্মের বিরোধ প্রকাশ পাচ্ছে, যে ধর্ম অনুযায়ী যা 'মহৎ পাপ' তাও সতীধর্ম অনুসারে মহৎ পুণ্য। শাস্ত্রকারদের আদর্শ অবশ্য ছিল এমন ধর্মের প্রচার যা অন্তর্বিরোধশূন্য। উশীনর রাজাকে শ্যেন পক্ষী বলেছে, "যে ধর্ম ধর্মান্তরবিরোধী তাহা কখনও ধর্ম নহে, পরস্পর অবিরোধী ধর্মই প্রকৃত ধর্ম .....।" কিন্তু অবিরোধী ধর্ম যে সব সময়ে সম্ভব নয় তাও ঐ শ্যেন পক্ষীই বলে গেছে, "উভয় ধর্মের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহা লাঘব ও গৌরব বিবেচনা পূর্বক যাহাতে অধিকতর লাভের সম্ভাবনা তাহারই অনুসরণ করিবে।" কিন্তু গৌরব লাঘব বিচার অনেক সময় খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। প্রকাশ্য সভায় যখন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করার চেষ্টা করা হয় তখনও মহাভারতের ধর্ম সম্পর্কিত সর্বপ্রধান প্রবক্তা ভীষ্ম দুঃশাসন ও দুর্যোধনের ঐ কার্যের নিন্দা করার যুক্তি খুঁজে না পেয়ে বলেছিলেন, "ধর্মের গতি অতি সূক্ষ্ম।"

আমরা তৃতীয় অধ্যায়ের প্রবন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করে দেখানোর চেষ্টা করব যে ক্ষত্রধর্ম ও পরম ধর্মের মধ্যে সংঘাতই মহাভারতের কাহিনীর প্রধান নৈতিক উপাদান। কৃষ্ণের প্ররোচনায় পরম ধর্মের নামে ক্ষত্র ধর্মকে পদে পদে পাণ্ডবদের দিয়ে লঙ্ঘন করানো হয়েছিল। মহাভারতের প্রথম সপ্তদশ পর্বের প্রায় একলক্ষ শ্লোকে ক্ষত্রধর্ম ও পরম ধর্মের মধ্যে এক অনিশ্চিত দোদুল্যমান অবস্থা বজায় রাখা হয়েছে। কিন্তু অষ্টাদশ পর্বে মহাভারতকার জোর করে পরম ধর্মকে উপেক্ষা করে ক্ষত্রধর্মের প্রাধান্যকে প্রতিষ্ঠা করেন। আগাগোড়া যাকে পাপী বলে নিন্দা করা হয়েছে একমাত্র তাকেই পুণ্যবানের স্বর্গে অধিষ্ঠিত করার বৈপরীত্যের দ্বারা পাপ পুণ্যের ধারণাকে জনমানসে যেভাবে কাদাঘোলা করা হয় তার চেয়ে আর কি বেশী ক্ষতির কথা ভাবা যেতে পারে?

৯

পরম ধর্ম ও অন্যান্য সামাজিক অবস্থান ভিত্তিক খণ্ড ধর্মের মধ্যে বিরোধই হিন্দুমনের ধার্মিকতার অন্তর্দ্বন্দ্বের একমাত্র কারণ নয়। অপর এক গুরুত্বপূর্ণ কারণ পরম ধর্মের বাণী ও পরম ধর্মের প্রচারকদের আচরণের মধ্যে গুরুতর অসঙ্গতি। পরমধর্মের ধারনার মধ্যে দুইটি গুণের উপর চূড়ান্ত গুরুত্ব অর্পন করা হয়েছে। এই দুইটি গুণ হোল শম ও দম। প্রজ্ঞার স্থিতিশীলতা এবং ইন্দ্রিয়দের দমন—এই দুই গুণকে আমাদের ধর্মচিন্তায় অত্যন্ত উচ্চস্থানে বসানো হয়েছে। "কামঃ ক্রোধস্তথালোভঃ" যে "ত্রিবিধঃ নরকস্যেদং দ্বারং"—এই উপদেশের কোন ব্যতিক্রম শাস্ত্রে কোথাও পাওয়া যায় না। "অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্'' থেকে মুক্ত হওয়ার বাণী যে ঘুরে ফিরে কতবার শাস্ত্রকারেরা দিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু পুরাণ প্রসিদ্ধ মুনি ঋষিদের দেবতা এবং দেবতাদের অবতারদের মধ্যে আমরা কি দেখতে পাই? কোথায় সেই "যদা দীপোনিবাতস্থো''—বায়ুশূন্যস্থানে অচঞ্চল দীপশিখার তুল্য চিত্তবৃত্তি? এই লোকোত্তর ব্যক্তিরা কথায় কথায় ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য হয়ে পড়তেন, সত্যি কোন অপরাধ করা হয়েছে কিনা না জেনে অথবা অপরাধের লঘুগুরু বিচার কিছুমাত্র না করেই শাপ দিয়ে শুধু অপরাধী ব্যক্তির নয় অনেক সময়ই সমগ্র বিশ্বচরাচরের সমূহ অকল্যাণ সাধন করে বসতেন।

বাঘা বাঘা মুনি ঋষিরা, যাঁরা ক্লান্তিহীন পুনরাবৃত্তি সহকারে ইন্দ্রিয়জয়ের মহিমা কীর্তন করতেন, উর্দ্ধরেতা হওয়াকে যাঁরা চারিত্রের চরম উৎকর্ষ বলে প্রচার করতেন, তাঁরা কিভাবে, কখনো রম্ভা, কখনো ঘৃতাচি, কখনো মেনকা, কখনো অলম্বুষা প্রভৃতি অপ্সরাদের স্নানরতা, বিবসনা বা অন্য কোন অবস্থায় দেখে এমনই চঞ্চল হয়ে উঠতেন যে কথায় কথায় তাঁদের রেতঃস্খলন ঘটে যেত, কিভাবে কামপীড়ায় পীড়িত হয়ে তাঁরা এমন সব দুর্বলতার কাছে আত্মসমর্পন করতেন যার কথা আমাদের মত ঘোর কলিকালের অতি নগণ্য ও অধম ব্যক্তিরা কল্পনাও করতে পারব না এবং সেই দুর্বলতার বশে কিভাবে ঐ মুনিঋষিরা সহস্র সহস্র বৎসরের তপস্যার ফলকে জলাঞ্জলি দিয়ে দিতেন, তৎসংক্রান্ত অসংখ্য উপাখ্যানে আমাদের পৌরাণিক সাহিত্য একেবারে ভরা। রিপুর দ্বারা পর্যুদস্ত হওয়ার ঘটনা যেখানে নেই সেখানে আছে অভ্রান্ত ভোগীর মত দ্বিধাবিহীন ও সংকোচহীন উন্মুক্ত মনে ইন্দ্রিয়দের চর্চা। বৃন্দাবনের কৃষ্ণ, লিঙ্গ পুরাণ ও শিবপুরাণের শিব, মৎস্যগন্ধাকে কামনাকারী পরাশর এবং তারাবতী কামনাকারী কপোতমুনি এই রকম অবাধ ইন্দ্রিয় সেবনের অসংখ্য উদাহরণের কয়েকটি মাত্র। এই বিষয়েও আমরা বিশদ আলোচনা করেছি অন্য প্রবন্ধে।

দর্প এবং অহং বোধকেও দমন করার কথা প্রচার করা হয়েছে। কিন্তু পান থেকে চুণ খসে গেলেই ক্রোধে আত্মহারা হয়ে যেতেন যে সব মুনিঋষিরা তাঁদের কি করে দর্প বা অহং বোধশূন্য মনে করা যেতে পারে? বস্তুত দর্প তো ছিল ঐ লোকোত্তর ব্যক্তিদের সযত্নে লালিত গুণ। ভীষ্ম যখন বলেন "ইন্দ্র যদি পরাক্রম পরিত্যাগ করেন এবং ধর্মরাজ যদি ধর্ম পরিত্যাগ করেন তথাপি আমি সত্য পরিত্যাগ করিতে পারি না;" এবং রাম যখন বলেন "আকাশ পতিত হইতে পারে, পৃথিবী বিদীর্ণ হইতে পারে, সমুদ্র শুষ্ক হইতে পারে কিন্তু আমি কোনো সময়ে পরিহাস্যালাপেও মিথ্যা বলিতে পারি না—" তখন কি এদের উক্তির মধ্যে শুধু মাত্রই সত্যানুরাগ প্রকাশ পায়, না কি আকাশচুম্বী দর্প ও অহং বোধও প্রকাশ পায়? বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের প্রসিদ্ধ ছেলেমানুষি প্রতিযোগিতার মধ্যে আমরা কি লোভ, অহংবোধ, দর্প প্রভৃতির ছড়াছড়ি দেখি না? সত্যপরায়ণতার জন্য শ্রীরামচন্দ্র ভুবন বিখ্যাত। কিন্তু আমরা দশম অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করে দেখাব যে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যা ছিল তা সত্যপরায়ণতা নয়, চূড়ান্ত আত্মকেন্দ্রিকতা ও গগনচুম্বী অহংবোধ। তাঁর বনবাসে যাওয়ার পিছনে এই গুণগুলি ছাড়া আর যা ছিল তা ছিল তাঁর লোকভীতি: তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন "আমি অধর্ম ও পরলোকের ভয়ে ভীত বলিয়া অদ্যই রাজ্যে অভিষিক্ত হইতে পারিতেছিনা।" যদিও ভয়কে অতিক্রম করার কথাও তো একই প্রকার গুরুত্বের সঙ্গে প্রচার করা হয়েছে। আমরা উক্ত প্রবন্ধে আলোচনা করে দেখিয়েছি যে রাম পিতৃসত্য রক্ষার্থে বনগমন করেছিলেন তাঁর এই দাবীটা, যা সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ রামভক্ত ভারতবর্ষীয়রা মেনে এসেছেন, বাল্মীকি রামায়ণে তার স্বপক্ষে কোন সাক্ষ্যই নেই। দশরথ রামকে বনে যেতে আজ্ঞাও দেন নি, কৈকেয়ীকেও সেরকম কোন বর দেন নি। রামের বনবাসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত একেবারেই তাঁর নিজস্ব। তাঁর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কৌশল্যা, লক্ষ্মণ ও ভরত যে সব যুক্তি দেন তার কোন সদুত্তরই তিনি দিতে পারেন নি। তাঁর গোঁয়ারতুমির জন্য দশরথ মৃত্যুবরণ করেন, কৌশল্যা

জীবন্মৃত অবস্থা প্রাপ্ত হন, সীতাকে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়। সোনার লঙ্কা পুড়ে ছারখার হয়, অযোধ্যাবাসীদের প্রতি রাজকর্তব্য চৌদ্দ বৎসর যাবৎ অবহেলিত হয়।

একজন ব্যক্তির মাত্রাহীন অহং বোধের কাছে এতজনের সুখ শান্তি বিসর্জন দেওয়ার এই যে পুরাণ প্রসিদ্ধ উদাহরণ তার প্রায় অবিকল এক প্রতিবিম্ব কি বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের ইতিহাসে আমরা দেখি নি? রঘুপতি রাঘবের ভজনাকারী গান্ধী যে একবার স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য সমগ্র ভারতবাসীকে উন্মাদনার উত্তুঙ্গে আরোহন করালেন তারপর আবার নিজের খেয়ালবশে চৌরিচৌরার ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে সেই আন্দোলনকে স্তিমিত করে দিলেন এর মধ্যে কি ঐ একই সীমাহীন অহংবোধের প্রকাশ দেখি না?

বরদানের উপাখ্যানগুলিতে বরদাতা দেবতাদের মধ্যে যে কল্যাণ অকল্যাণের চিন্তার ছিঁটেফোটাও পাওয়া যায় না, তা আগেই বলেছি। বস্তুত একমাত্র গুণ যা তাঁদের মধ্যে দেখা যায় তা তাঁদের সীমাহীন স্তাবকতাপ্রীতি। তপস্যাকারী দৈত্য দানবের স্তবে প্রীত হয়ে সম্পূর্ণ চিন্তাহীন ভাবে বরদাতা দেবতারা এমন বর দিয়ে বসতেন যার ফলে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের নাভিশ্বাস দেখা দিত। তারপর আবার দেবতাদের কাকুতি মিনতিতে গলে গিয়ে ঐ বরেরই মধ্যে নিহিত কোন ছিদ্রপথে ঐ দৈত্য দানবের বিনাশের পথ বাতলে দিতেন। এই স্তাবকতা প্রীতি এতই অধিক যে তার সঙ্গে তুলনা চলতে পারে একমাত্র আধুনিক ভারতীয় রাষ্ট্রে রাজনৈতিক নেতাদের তোষামোদ প্রীতির।

প্রচারিত বাণী ও প্রচারকদের আচরণের মধ্যে যে বিশাল প্রভেদের কথা এতক্ষণ আলোচনা করলাম তাকে নানা ভাবে দেখা যেতে পারে। একটি দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যেতে পারে এইগুলি হল আদর্শ থেকে বিচ্যুতি। আদর্শকে কোন উচ্চস্তরে স্থাপন করে তা অনুসরণ করতে অকৃতকার্য হওয়াটা কিছুই আশ্চর্যকর ঘটনা নয়। দ্বিতীয় একটি দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যেতে পারে, এ সবই ভণ্ডামি। প্রচারক মুনি ঋষিরা ছিলেন ভণ্ড, তাঁরা যা প্রচার করতেন তাতে তাঁরা বিশ্বাসই করতেন না। এই দুইটি দৃষ্টিকোণের কোনটিই আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। আমাদের মতে প্রাচীন ভারতের শাস্ত্রকারেরা মানবজাতির মধ্যে এক স্বল্প সংখ্যক অতিমানবের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন। পাশ্চাত্য দর্শনে যে Superman-এর ধারনা আছে তার সঙ্গে তুলনীয় একটা ধারণা। মুনি ঋষিরা ছিলেন Superman. তাঁরা নীতি প্রচার করতেন, কিন্তু অনুসরন করতেন না। নীতি তাঁদের জন্য নয়। তাঁরা নীতির ঊর্ধ্বে। নীতি সাধারণ লোকের জন্য। যে নীতি তাঁদের প্রতি প্রযোজ্য নয় তার থেকে বিচ্যুত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। একই কারণে তাদের ভণ্ডও বলা যায় না। আমার এই বক্তব্যের সপক্ষে সাক্ষ্য দেবো এই যে পৌরানিক সাহিত্যে ক্রোধে আত্মহারা হওয়ার জন্য, কামপীড়ায় আক্রান্ত হয়ে ন্যক্কারজনক আচরণ করার জন্য, দর্প বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করার জন্য মুনি ঋষিদের কখনও নিন্দা করা হয় নি।

১০

ধর্ম প্রচারকেরা যেহেতু ধর্মের পথ অনুসরণ করতে বাধ্য ছিলেন না সেই কারণেই বোধহয় এই ধর্মের মধ্যে একটি প্রচণ্ড ভারসাম্যের অভাব লক্ষিত হয়। অন্য কোন কোন

সভ্যতায় নৈতিক আদর্শের ক্ষেত্রে Golden mean বা মধ্য পন্থার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। আমাদের ধর্মীয় ঐতিহ্যে সম্পূর্ণ বিপরীত একটি প্রবণতা কাজ করেছে। তা হ'ল চরম প্রান্তবিন্দুতে চলে যাওয়া। মানব-প্রকৃতির স্বাভাবিক বৃত্তিসমূহের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়ে তাদের সঙ্গে মানিয়ে অহং ব্যতীত অপর ব্যক্তিদের কল্যাণের কথাও স্মরণে রেখে আচরণ করার নৈতিক সমস্যাটাকে সমস্যা হিসেবেই গ্রহণ করা হয় নি। এক প্রান্তসীমার উপর সবটুকু জোর দেওয়ার প্রতিক্রিয়া হিসাবে প্রায়শ ফল হয়েছে অপর প্রান্তসীমার প্রতি এক অসুস্থ বিকৃত ঝোঁক। নীতির ব্যাপারে ভারতবর্ষীয় মানুষ সেই কারণে হয়েছে আভ্যন্তরীণ ভাবে দ্বিধাবিভক্ত। মনস্তত্ত্বে যাকে Schizophrenia বলে, নৈতিক সত্ত্বা হিসাবে আধুনিক হিন্দু মানুষ মাত্রই সেই জাতীয় এক ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত।

কয়েকটা উদাহরণ নেওয়া যাক। কাম রিপুকে উৎপাটিত করে ফেলাটাই যেন এক চূড়ান্ত কীর্তি, উর্দ্ধরেতা বলে বর্ণনা করাই যেন প্রশংসার পরাকাষ্ঠা। অপরদিকে মন্দিরের মিথুন ভাস্কর্যে এবং রাধাকৃষ্ণ সংক্রান্ত কাব্যে ও চিত্রশিল্পের মারফত জনচিত্তে কাম্য বলে প্রচারিত করা হয়েছে এমন এক কামচর্চাকে যা মাত্রাহীন আতিশয্য দোষে বিকারগ্রস্ত। এই জাতীয় কামবর্ণনের সঙ্গে Boccaccio-র Decameron, আরব্য রজনী এবং আমাদের সংস্কৃত কাব্যে বর্ণিত কাম নিয়ে কৌতুক ও ক্রীড়ার এক মৌলিক প্রভেদ রয়েছে। নরনারীর যৌনতা নিয়ে খানিক স্থূল রসিকতা যে কোন সুস্থ সভ্যতারই অঙ্গীবিশেষ। কিন্তু বৃন্দাবন লীলা, যার অধিকাংশের মধ্যেই কৃষ্ণের আচরণ অজাতশ্মশ্রু অনভিজ্ঞ বালকের যৌনস্বপ্নের মতই পরিমিতিহীন এবং তার সঙ্গে তার মাতৃস্থানীয়া বয়স্কা নারীকুলের আচরণও একই স্তরের, যাকে জীবাত্মা পরমাত্মা পুরুষ প্রকৃতি প্রভৃতি দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বের রূপক হিসাবে প্রচার করতে যে মানসিকতা লাগে তা নিঃসন্দেহে ব্যাধিগ্রস্ত।

এই প্রকার বিকার গ্রস্ত মনোভাবে অভ্যস্ত হওয়ার ফলে কামসম্পর্কিত চিন্তা আধুনিক ভারতবাসীর মনে যে কতদূর জট পাকিয়ে গিয়েছে তার একটা উত্তম পরিচয় পাওয়া যায় মিথুন ভাস্কর্য সম্পর্কিত বিভ্রান্তির মধ্যে। অত্যন্ত বিগন্ধ আধুনিক ভারতীয় ব্যক্তিরাও অনেক সময়ই এই ভাস্কর্যের শিল্পগত উৎকর্ষের থেকে তার বিষয়গত বীভৎসতাকে আলাদা করে দেখতেই পারেন না। এই ভাস্কর্যে বর্ণিত কামক্রীড়াগুলি যে সাধারণ নরনারীর সাধারণ প্রেম ভালবাসার প্রকাশ হতেই পারে না, ঐ একাধিক নরনারীর মিলিত ক্রিয়া কাণ্ড যার মধ্যে কখনও কখনও পশুদেরও অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায় তা যে ছিল বামাচারীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত বীভৎস ক্রিয়াকলাপ, ইংরেজীতে যাকে বলা হয় orgy, তা দেখেও না দেখে অনেকেই এদের মধ্যে দেখেন সূক্ষ্ম অনুভূতির প্রকাশ—মুল্‌ক্ রাজ আনন্দের ভাষায় tender humanism। কাম সম্পর্কে এই বিকৃত মনোভাবকে যে পৌরাণিক সাহিত্যে পাওয়া যায় তা আমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচনা করে দেখাব।

১১

হিন্দু মনের দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হল নারী সম্পর্কে হিন্দু পুরুষের মনোভাব। সব দেশেই সব কালেই পুরুষেরা নারীদের অনেক ভাবে বঞ্চিত করে এসেছে। কিন্তু নারী জাতি সম্বন্ধে যে সীমাহীন ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রাচীন ভারতের পুরুষ

শাস্ত্রকাররা পোষণ করতেন এবং যে ঘৃণাকে প্রকাশ্য ভাবে ঘোষণা করে নারী সম্পর্কিত সমস্ত সামাজিক রীতি নীতির পত্তন করা হয়েছিল, তার তুলনা অন্য কোন দেশের সামাজিক ইতিহাসে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। আর ভারতবর্ষের নারীরা তাদের এই চূড়ান্ত অপমানকে যে ভাবে মেনে এসেছে তাও তুলনাবিহীন। অপরদিকে দেবতাদের মধ্যে দেবীদের স্থান নগণ্য তো নয়ই কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষ দেবতাদের চেয়ে অধিক মর্যাদাপূর্ণ। ব্রহ্মা বা মহেশ্বরের অবিমৃষ্যকারিতার দরুণ বরপ্রাপ্ত কোন রাক্ষস বা দৈত্য দানবের অত্যাচারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যখনই যাই যাই অবস্থা হয়েছে তখনই শরণ নিতে হয়েছে দেবীর। শাক্ত ধারায় দেবীর এই মাহাত্ম্য যে কীর্তিত হবে তা তো স্বাভাবিক। কিন্তু যাতে আশ্চর্য হতে হয় তা এই যে সমগ্র পৌরাণিক সাহিত্যেই কোথাও কখনও দুর্গা কালী সরস্বতী প্রভৃতি দেবীদের কোন প্রকার অসংযত আচরণ করতে দেখানো হয় নি। যে শাস্ত্রে রমনী মাত্রকেই কামচারিণী, কামের আধার স্বরূপা "জলৌকার ন্যায় সতত পুরুষের শোনিত পানকারী" প্রভৃতি বলা হয়েছে, বৃকের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, আরও যে কতো কদর্য ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই এবং যে শাস্ত্রে পুরুষ দেবতাদের অবাধ লাম্পট্যকে উৎসাহ সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে সেই একই শাস্ত্রে যে দেবীদের চিত্রিত করা হয়েছে সকল মালিন্যের উর্দ্ধে, মাধুর্য মর্যাদা ও শালীনতার অপূর্ব সমন্বয়ে তা বিস্ময়কর বৈকি।

আধুনিক ভারতীয় সমাজেও নারীদের সম্বন্ধে পুরুষদের দ্বিধাবিভক্ত মনোভাবের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, পরিবারে মেয়েদের ও বৌ-দের স্থান যে কোথায় তা নিয়ে নিশ্চয় নূতন করে বলার কিছু নেই। কিন্তু ঐ একই পরিবারে দজ্জাল শ্বাশুড়ীর দাপট, বয়স্ক পুত্রদেরও মা'র সামনে কেঁচোর মতন ব্যবহার করা—তাও আমাদের অতি পরিচিত। পারিবারিক এই অবস্থাটারই এক বৃহত্তর প্রতিরূপ দেখি রাজনীতির জগতে। বর্তমান শতাব্দীর ইতিহাসে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে নেত্রীস্থানীয়া নারীরা যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তার তুলনা পাশ্চাত্যজগতে কোথাও পাওয়া যায় না। ইংল্যাণ্ডের গত কয়েক বৎসরের প্রধানমন্ত্রীকে বাদ দিলে ইউরোপ ও আমেরিকার কোন দেশেই নারীরা রাজনীতি ও প্রশাসনে কোন প্রাধান্য কখনও অর্জন করেনি। ও দেশের পুরুষেরা নেত্রীদের দ্বারা চালিত হওয়ার কথা ভাবতেই পারে না। আমাদের দেশে ইন্দিরা গান্ধীর অনেক আগে থেকেই অনেক নারীই নেতৃত্বের ভূমিকায় থেকেছেন, এবং পুরুষদের তা মেনে নিতে কোন অসুবিধা হয়নি। আরও একটি বৈপরীত্য—ভারতবর্ষীয় পুরুষেরা মনে করে নারীরা বুদ্ধিহীন, মেধাহীন, সৃজনশীল প্রতিভাহীন। প্রাচীন শাস্ত্রকাররাও তা মনে করতেন, আজকের দিনের পুরুষরাও তাদের কন্যা ও বোন বা স্ত্রী সম্পর্কে একই ধারণা দৃঢ় ভাবে পোষণ করে। কিন্তু এই একই পুরুষেরা কি বিদ্যার জন্য বুদ্ধির জন্য মেধার জন্য সরস্বতী দেবীর ভজনা করে না? নারী সম্পর্কে এই দ্বিধাবিভক্ত মনোভাব কিভাবে পৌরাণিক সাহিত্যের দ্বারা প্রচারিত হয়েছে তা আমরা সপ্তম অধ্যায়ের প্রবন্ধে আলোচনা করে দেখাব।

১২

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আভ্যন্তরীণ সঙ্গতিহীনতা এবং তজ্জনিত হিন্দু মনের দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার আর একটি ফল হয়েছে যুক্তির মধ্যে কুযুক্তির ভেজালের ব্যাপক অনুপ্রবেশ। কুযুক্তি বলতে আমরা ইংরেজীতে যাকে rationalisation বলে তাই বোঝাচ্ছি। কোন একটা

ঘটনা ঘটেছে যা আপাত দৃষ্টিতে ধর্মবিরোধী। কিন্তু ধর্ম যে ক্ষুণ্ণ হয় নি তা প্রতিপন্ন করতে হবে। তা করার জন্য ধর্মকে এতো ভাবে দুমড়িয়ে মুচড়িয়ে বেঁকিয়ে নিতে হয় যে তার পর কোনটা ধর্ম কোনটা অধর্ম তা আর চেনাই যায় না।

এই প্রকরণটিকে সব চেয়ে বেশী দেখা যায় শাপ সংক্রান্ত কাহিনী গুলিতে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। কর্ণকে অন্যায় যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করা হয়েছে। কিন্তু ঘটনাটিকে ধর্মসঙ্গত করে দেখাতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে একাধিক শাপের কাহিনীর উদ্ভাবন করতে হয়। মেদিনী কর্ণের রথচক্রকে গ্রাস করবে এরকম একটি ব্রহ্মশাপকে তৈরী করে নিতে হয়। শুধু তাতে কুলোয় না। পরশুরাম প্রদত্ত শাপের উপাখ্যানকেও বানিয়ে নিতে হয়। দুর্যোধনের উরু ভঙ্গটা পাণ্ডব পক্ষের অপর এক কলঙ্ক। তাকে কলঙ্কমুক্ত করার প্রচেষ্টায় উদ্ভাবিত করা হয় মহামুনি মৈত্রেয় কর্তৃক শাপ প্রদানের কাহিনী। মহাভারতের আগাগোড়াই কৌরব পক্ষদের নিন্দা করতে এবং পাণ্ডব পক্ষকে যেন তেন প্রকারেণ ধার্মিক প্রতিপন্ন করতে যে যুক্তি দেওয়া হয় তা নির্জলা রকমের কুযুক্তি।

ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের এই অন্তর্বিরোধ-সম্পন্ন নৈতিকতার যে বিভিন্ন দিকের আলোচনা এ যাবৎ করলাম তাদের প্রায় সবগুলির একত্র সমাবেশ ঘটেছে যে পৌরাণিক চরিত্রে তা হ'ল কৃষ্ণ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ক্ষত্রধর্ম ও পরম ধর্মের সংঘাত ঘটানো এবং অজস্র কুযুক্তি দিয়ে যখন যেটা ইচ্ছা সেটাকে লঙ্ঘন করানর দায়িত্বটা পূর্ণভাবেই ন্যস্ত করতে হয় শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধে। মহাভারতে কৃষ্ণের যে ভূমিকা তার ভিত্তিতে বিচার করলে কৃষ্ণকে নাটকের ভিলেন্ চরিত্র বলে মনে করে নিতে হয়। বস্তুত মহাভারতের অনেক অংশেই অনেক চরিত্রের মুখ দিয়ে কৃষ্ণকে সেই ভাবেই বর্ণনা করা হয়েছে। শুধু ক্ষত্রধর্ম লঙ্ঘন করায় নয়, গীতার মধ্য দিয়ে যে যে ধর্মের বাণী তিনি প্রচার করেছেন তাদের সব ক'টিকেই তিনি নিজেই উল্লঙ্ঘন করেছেন অথবা করাকে সমর্থন জানিয়েছেন। বৃন্দাবনের কৃষ্ণ এবং কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ এই দুই জন ঐতিহাসিকভাবে বা পৌরাণিকভাবে একই ব্যক্তি কিনা সেই প্রসঙ্গটি আপাতত অবান্তর। ঐতিহাসিক যুগের হিন্দুমনের কাছে এই দুই কৃষ্ণ একই। এবং এই দুই কৃষ্ণ মিলে কামুকতা, শঠতা, ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হওয়া (পার্থ সারথির ভূমিকায়), লোভ (পাণ্ডব পক্ষের হয়ে), দর্প প্রভৃতির যে আদর্শকে রূপদান করে তা গীতা প্রচারিত ধর্ম শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত। পরবর্তীকালে কৃষ্ণকে যে দেবাদিদেবের আসনে উন্নীত করা হয়েছে আমাদের মতে তা হিন্দুমনের নৈতিক অন্তর্বিরোধিতাজনিত অনৈতিকতার অপর একটি মূল কারণ। কুরুক্ষেত্রের পার্থসারথিই হোক্ আর বৃন্দাবনের গোপীবল্লভই হোক্ কৃষ্ণকে দেবতা হিসাবে গ্রহণ করার পর যে কোনো প্রকারেই নীতিসঙ্গত হওয়া একেবারেই অসম্ভব। এই প্রসঙ্গটি আমরা বিশদভাবে নবম ও একাদশ অধ্যায়ে আলোচনা করব।

১৩

ব্রাহ্মণ্য ভাবধারার যে সংক্ষিপ্ত সমালোচনা উপরে করা হল এবং যাকে পরবর্তী অধ্যায়-গুলিতে আরও বিশদ করা হবে তার পিছনে আমাদের কি চিন্তা কাজ করছে তা এইবার খুলে বলব। আমরা বিশ্বাস করি যে সমাজকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিতে হলে চারটি দিকে উন্নতির চেষ্টা করতে হয়। ইয়োরোপের বৈপ্লবিক ইতিহাসে চতুর্বিধ বিপ্লবের

পরিচয় পাওয়া যায়। অর্থনৈতিক বিপ্লব—যা ইয়োরোপের ক্ষেত্রে শিল্প বিপ্লব নামে অভিহিত। রাজনৈতিক বিপ্লব—যা অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সের ক্ষেত্রে ও বিংশ শতাব্দীর রাশিয়ার ক্ষেত্রে সশস্ত্র গণ অভ্যুত্থানের আকার নিয়েছিল। বৈজ্ঞানিক বিপ্লব—যা পরবর্তী কালের শিল্পবিপ্লবকে সম্ভব করেছিল। এবং চতুর্থত, সাংস্কৃতিক বিপ্লব—যা রেনেসাঁসের যুগ থেকে শুরু করে আজ অবধি উত্থান পতন বন্ধুর পথে অবিরাম অব্যাহত থেকেছে। আমাদের দেশের মার্কসবাদী সমাজ চিন্তায় উপরোক্ত চারটি বিপ্লবের শুধুমাত্র দুইটির উপর অত্যধিক জোর দেওয়া হয়েছে। সেই দুইটি হল অর্থনৈতিক বিপ্লব ও রাজনৈতিক বিপ্লব। বৈজ্ঞানিক বিপ্লব ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের উপর প্রায় কোন নজরই দেওয়া হয় নি বললেই চলে। মার্কসবাদে আস্থা স্থাপনকারী রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীগুলির অধিকাংশই দীর্ঘ-মেয়াদী লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছে রাজনৈতিক ক্ষমতার দখল এবং আশু কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করেছে অর্থনৈতিক আন্দোলনের কর্মপ্রণালী। যদিও আমাদের দেশের মার্কসবাদী মহলে মাও সেতুং-এর প্রভাব অত্যন্ত বলবৎ তথাপি মাও সেতুং যে আমরণ সাংস্কৃতিক বিপ্লবের চূড়ান্ত গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে গিয়েছিলেন তা আমাদের দেশের মার্কসবাদী মহলে বিশেষ রেখাপাত ঘটায় নি। আমাদের মতে সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক আন্দোলনের সম্পর্কে এই ঔদাসীন্য আমাদের দেশের মার্কসবাদী আন্দোলনের দুর্বল হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ। বিলম্বে হলেও, আমাদের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার মধ্যে রাষ্ট্রের সঙ্গে ও শোষক-শ্রেণীর সঙ্গে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রামের পাশাপাশি ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধে চিন্তার ক্ষেত্রে সম্মুখ সংগ্রাম শুরু করে দিতেই হবে। আমাদের প্রাচীন সভ্যতা অনেক মহামূল্যবান সম্পদ দিয়ে মানবজাতিকে ঐশ্বর্যশালী করেছে, সেই ঐতিহ্য সম্পর্কে আমাদের আগ্রহ, মমতা ও গর্ব অনুভব করা উচিত। কিন্তু এই সভ্যতার প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারাগুলির সম্পর্কে এতটুকু সহিষ্ণুতার মনোভাবকেও আস্কারা দেওয়া যেতে পারে না।

১৪

আমাদের বর্তমান অনুসন্ধানের পশ্চাতে আরও একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে। ইতিহাসের গতিকে পরিবর্তন করতে হলে ইতিহাসকে বুঝতে হয়। যে কোন জিনিসকে বুঝতে গেলে তার জন্য প্রয়োজন হয় একটি তাত্ত্বিক কাঠামোর। ইয়োরোপের ইতিহাসকে বুঝবার জন্য কার্ল মার্কস যে তাত্ত্বিক আধার প্রস্তুত করেছিলেন তার মধ্যে ছিল একটি ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়ার ছক—দাস সমাজব্যবস্থা উত্তরণ লাভ করে ফিউড্যাল ব্যবস্থার মধ্যে। ফিউড্যাল ব্যবস্থার অন্তর্গত সংঘাত জন্ম দেয় ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার। কার্ল মার্কস কিন্তু ভারতবর্ষ এবং এশিয়া বা আফ্রিকার অন্যান্য দেশের ইতিহাসের ক্ষেত্রে এই তাত্ত্বিক আধারের প্রয়োগ করেন নি। তিনি একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন উৎপাদন ব্যবস্থার কথা ভেবেছিলেন যার নাম তিনি দিয়েছিলেন Asiatic mode of production। এঙ্গেল্‌স্ ও লেনিনও কখনো ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে দাস ব্যবস্থা, ফিউড্যাল ব্যবস্থার তাত্ত্বিক কাঠামোর ব্যবহার করেন নি। তাঁরাও Asiatic mode of production-এর তত্ত্বই ব্যবহার করেছেন। পরবর্তীকালে মার্কসবাদী মহলে ভারতবর্ষের ইতিহাসে সামন্ততন্ত্র, আধা সামন্ততন্ত্র প্রভৃতি তাত্ত্বিক ধারনার প্রয়োগ ঘটতে শুরু করে। এই প্রয়োগের পিছনে যে অনেক পরিমাণ গভীর

তাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়েছিল যার ভিত্তিতে কার্ল মার্কস্, এঙ্গেল্‌স্ ও লেনিনের এই বিশেষ ক্ষেত্রের ইতিহাস-চিন্তাকে নস্যাৎ করে দেওয়া যায় তা মোটেই নয়। আমরা মনে করি যে ভারতবর্ষের ইতিহাসের সম্যক বোধের পক্ষে সামন্ততন্ত্রের ধারণা একেবারেই অনুপযোগী। আমরা মনে করি যে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে ধারণ করার জন্য একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন তাত্ত্বিক কাঠামোর প্রয়োজন যে কাঠামোর অন্যতম প্রধান ভিত্তিই হবে ব্রাহ্মণ্য ভাবধারা যার আলোচনা এই পুস্তকে করা হচ্ছে। এই ভাবধারাকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করে একটি কাঠামো সৃষ্টি করার সমস্যাটিকে আমরা বইটির অন্তিম অধ্যায়ে আলোচনা করব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পাপ-পুণ্য

১

ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যে স্বর্গের একটি ধারণা আছে, পুণ্য বলে একটি ধারণা আছে, এবং পুণ্যকে স্বর্গের সোপান হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। মৎস্যপুরাণে আছে, "স্বর্গীয় নন্দনাদি মুখ্য দেবোদ্যান সকলও পুণ্যদ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়।" (১) ধর্ম ও পাপ-পুণ্যের মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ে শিবপুরাণে আছে, "অধর্ম ব্যতীত পাপ হয় না এবং ধর্ম ব্যতীতও পুণ্য হয় না।"(২) মহাভারতের শান্তিপর্বে বলা হয়েছে, "শাস্ত্রে সাধুদিগের আচারকে ধর্ম ও ধর্মানুষ্ঠানপরতন্ত্র ব্যক্তিকে সাধু বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। সুতরাং ধর্ম ও সাধু ইহারা পরস্পর সাপেক্ষ।"(৩) মহাভারতের অনুশাসনপর্বে পাচ্ছি, "মনুষ্য একাকীই জন্মমরণের বশীভূত হয় এবং স্বর্গনরক ভোগ করিয়া থাকে। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র, গুরু, জ্ঞাতি, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণ কাষ্ঠ ও লোষ্ট্রের ন্যায় মৃতদেহ পরিত্যাগপূর্বক মুহূর্তকাল রোদন করিয়া আবাসে প্রত্যাগমন করে। এই সময় একমাত্র ধর্মই তাহার অনুগমন করিয়া থাকে; অতএব সর্বদা ধর্মানুষ্ঠান করা মনুষ্যের অবশ্য কর্তব্য। ধর্মপরায়ণ হইলে স্বর্গ ও অধর্মাক্রান্ত হইলে নরক ভোগ করিতে হয়।" (৪)

সুতরাং স্বর্গে প্রবেশাধিকার পেতে হলে আমাদের ধর্ম অনুসরণ করতে হবে, পুণ্য অর্জন করতে হবে। কিভাবে পুণ্য অর্জন করা যায় তা জানতে আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক; কারণ স্বর্গ যে অতিশয় কাম্য গন্তব্যস্থল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ রাখা হয়নি। রামায়ণে মহাভারতে পুরাণে স্বর্গের বহু বহু বিবরণ পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে এমন কোন ভিন্নতা নেই যার দরুণ স্বর্গের স্বরূপ সম্পর্কে কোন সন্দেহ উঠতে পারে। মহাভারতের বনপর্বে পাই, "ত্রয়স্ত্রিংশৎযোজন বিস্তৃত হিরন্ময় অদ্রিরাজ মেরুতে নন্দন প্রভৃতি অনেক পবিত্র পরম রমণীয় দেবোদ্যান শোভা পাইতেছে; সেই স্থান পুণ্যবান লোকদিগের বিহারভূমি; তথায় ক্ষুধা, পিপাসা, গ্লানি, ভয়, বীভৎস বা অন্য কোন প্রকার অশুভ অনুভূত হয় না। সর্বদাই পরমরমণীয় সুখস্পর্শ সুগন্ধ গন্ধবহ মন্দ মন্দ বেগে সর্বত্র সঞ্চারিত হইতেছে। তথায় শোকতাপ জরা ও আয়াসের লেশ নাই।"(৫) শোকতাপ না থাক, রিরংসার যে অভাব নেই, তার তৃপ্তির উপায়ও যে বর্তমান, তারও সাক্ষ্য ভূরি পরিমাণে পাওয়া যায়। যেমন, "তথায় পৃথুনিতম্বিনী, সুচারুকেশা সুরনারীগণ হাবভাবাদিদ্বারা তাঁহাকে সতত আহ্লাদিত এবং বীণা, বল্লকী ও নূপুর প্রভৃতির মধুর নিনাদদ্বারা নিদ্রাবসানে জাগরিত করে।"(৬) নহুষের ইন্দ্রত্বলাভের পর তাঁর ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "তিনি কখনও দেবোদ্যানে, কখনও নন্দনবনে, কখনও কৈলাসে, কখনও হিমালয়ে...কখনও সাগরে কখনও বা সরোবরে অপ্সরা ও দেবকন্যা সমভিব্যাহারে ক্রীড়াকৌতুকে কালযাপন করিতে লাগিলেন।"(৭)

এহেন স্থানে কে না যেতে চাইবে? বিশেষ করে স্বর্গে না যাওয়া মানেই যখন নরক ভোগ। নরকেরও ভূরি ভূরি বিবরণ পুরাণে মহাকাব্যে পাওয়া যায়; সেখানে কি ধরণের যন্ত্রণা পাপীদের পেতে হয় তার বেশ ভাল ধারণাই কোন কোন ধরণের লোকচিত্র থেকে

পাওয়া যায়; "কেহ কেহ একবিংশতি প্রকার, কেহ বা অষ্টবিংশতি প্রকার নরকের উল্লেখ করেছেন—যেমন তমিস্র, অন্ধতমিস্র, রৌরব, মহারৌরব, কুম্ভীপাক প্রভৃতি।"(৮) এই একবিংশতি বা অষ্টাবিংশতি নরকের থেকে নিজেদের রক্ষা করে স্বর্গে যেতে ভারতবাসী মাত্রই আগ্রহী।

গোলমাল বাধে পথ নিয়ে। পথের নির্দেশ যে শাস্ত্রে দেওয়া নেই তা নয়, বরং সমস্যাই এই যে বড় বেশি দেওয়া আছে। "ধর্মের অসংখ্যদ্বার। যে কোন প্রকারে হউক, ধর্মের অনুষ্ঠান করিলে উহা কদাপি নিষ্ফল হয় না।"(৯) কিন্তু দ্বারগুলিকে অন্ততঃ চিনতে তো হবে। কয়েকটা উদাহরণ নিলেই সমস্যা বলতে কী বোঝাচ্ছি তা একটু স্পষ্ট হবে।

অষ্টক মহারাজকে যযাতি বলেন, "তপস্যা, দান, শম, দম, লজ্জা, সরলতা এবং দয়া এই সাতটি স্বর্গের দ্বারস্বরূপ।"(১০) যুধিষ্ঠিরকে কিন্তু সর্প বলেন, "আমার মতে অহিংসাপর হইয়া সত্য ও প্রিয়বাক্যের সহিত সৎপাত্রে দান করিলে স্বর্গলাভ হয়।"(১১) যযাতি-কথিত সাতটি দ্বারের ছয়টিই সর্পকর্তৃক অনুক্ত থেকে যায়। "যজ্ঞ অধ্যয়ন দান তপস্যা সত্য ক্ষমা দম এবং অলোভ।"(১২) এই অষ্টপ্রকার ধর্মের পথের নির্দেশ পাই মহাভারতের বনপর্বে, যাদের অধিকাংশই অন্য দুইটি নির্দেশের মধ্যে অনুপস্থিত। অন্য একটি আটটির তালিকা পাই উদ্যোগপর্বে: "প্রজ্ঞা, সৎকুল, দম, শাস্ত্রজ্ঞান, পরাক্রম, মিতভাষিতা, যথাশক্তি দান ও কৃতজ্ঞতা এই আটটি গুণ পুরুষকে প্রতিভাসম্পন্ন করে। এই আটটি গুণ স্বর্গপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ।"(১৩) নরকে যাওয়ার পথ, যা কিনা স্বর্গগামী পথের বিপরীতমুখী, তাদেরও অজস্র তালিকা পাওয়া যায়। যমের প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির জানান, "যে ব্যক্তি যাচমান আকিঞ্চন ব্রাহ্মণকে স্বয়ং আহ্বান করিয়া পরিশেষে নাই বলিয়া বিদায় করে, যে ব্যক্তি বেদ, ধর্মশাস্ত্র, দ্বিজাতি, দেবতা ও পৈতৃক ধর্ম মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করে এবং যে ব্যক্তি ধন বিদ্যমান থাকিতেও নাই বলিয়া দান ও ভোগে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে, তাহাদিগকেই অক্ষয় নরকে গমন করিতে হয়।"(১৪) একটি দীর্ঘতর এবং বৃহত্তর পরিধির পাপের তালিকা পাওয়া যায় কৌরবপক্ষীয় কিছু রাজাদের অর্জ্জুনবধের নিমিত্ত একত্রে গৃহীত শপথে: "যদি আমরা অর্জ্জুনকে বধ না করিয়া নিবৃত্ত হই অথবা তাহার ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া সমরে পরাঙ্মুখ হই, তাহা হইলে মিথ্যাবাদী, ব্রহ্মঘাতক, মদ্যপায়ী, গুরুদারাভিগামী, ব্রহ্মস্ব ও রাজপিণ্ডকাহারী, শরণাগতপরিত্যাগী, অর্থিঘাতী, গৃহদাহী, গোহন্তা, অপকারী, ব্রহ্মদ্বেষী, ন্যস্তধর্মাপহারী, শাস্ত্রবিহিতপথপরিত্যাগী, দীনানুসারী, নাস্তিক এবং মাতৃ-পরিত্যাগীদিগের যে লোক, যে ব্যক্তি মোহপরতন্ত্র হইয়া ঋতুকালে ভার্যাভিগমন করে, যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধদিবসে স্ত্রীসম্ভোগ করে, যে ব্যক্তি ক্লীবের সহিত যুদ্ধ করে, তাহাদের যে লোক...আমরা তাহাই প্রাপ্ত হইব।"(১৫) রাম ভরতকে রাজ্যচালনা বিষয়ে উপদেশ দেওয়ার সময় দ্বাদশ দোষের উল্লেখ করেন: নাস্তিকতা, মিথ্যা-ভাষণ, ক্রোধ, প্রমাদ, দীর্ঘসূত্রিতা, জ্ঞানবান ব্যক্তিগণের অদর্শন, আলস্য, পাপাচরণ, একাকী অর্থচিন্তা ইত্যাদি। এত দ্বার এবং এত পথের সমাবেশে একটি গোলকধাঁধার সৃষ্টি হয়েছে মনে হতে পারে কারও। নিষ্ক্রমণের পথপ্রদর্শন করা হয়নি কি? তাও হয়েছে। এক-দিকে পাই ধর্ম সম্বন্ধে তত্ত্বব্যাখ্যা। যেমন কৃষ্ণ বলেছেন, "উহা প্রাণিদিগকে ধারণ করে বলিয়াই ধর্ম নামে নির্দিষ্ট হইতেছে। অতএব যদ্দ্বারা প্রাণিগণের রক্ষা হয় তাহাই ধর্ম।"(১৬) উমার প্রশ্নের উত্তরে মহাদেব বলেন "যে ধর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গাদি লাভ

হয় তাহাকে প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম কহে। ..যে ধর্মদ্বারা মোক্ষলাভ হয় তাহাকে নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম কহে।"(১৭) বলাই বাহুল্য, এই জাতীয় তত্ত্বব্যাখ্যার মাধ্যমে ধর্মের স্বরূপ জ্ঞাত হওয়ার বাসনা থাকলে পৌরাণিক সাহিত্য না, যার চর্চার প্রয়োজন তা আমাদের উচ্চমার্গের দর্শনশাস্ত্র। কিন্তু আমরা উচ্চমার্গের দর্শনশাস্ত্রে আপাতত আগ্রহী নই। আগেই বলেছি আমাদের ধারণা যে পুরাকাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত অধিকাংশ ভারতবাসীর জীবনধারা পুরাণ ও মহাকাব্যদ্বয়ের মাধ্যমে প্রচারিত ধর্মোপদেশদ্বারা গভীর ও ব্যাপকভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছে। বেদবেদান্ত ষড়দর্শন ও অন্যান্য উচ্চাঙ্গের শাস্ত্রালোচনার প্রত্যক্ষ প্রভাব সীমাবদ্ধ থেকে গেছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এক উচ্চবর্ণভুক্ত অংশের মধ্যে। আজকের ভারতবাসীদের মধ্যে ভাল কী মন্দ কী উত্তম কী অধম কী সেই সম্পর্কে ধারণা ও ব্যবহারের উৎস সন্ধান করতে পুবাণ ও মহাকাব্যদ্বয়েই প্রবেশ করতে হবে মনে হয়। আমরা তাই করব।

কিন্তু পৌরাণিক সাহিত্যের মধ্যেই অসংখ্য ধর্মের মধ্যে কোন্ ধর্মটি শ্রেষ্ঠ, স্বর্গের অসংখ্য দ্বার ও পথের মধ্যে কোন্‌টি অধিকতর সুগম, সে বিষয়ে অনেক ঘোষণা আছে। মুশকিল হচ্ছে এই যে বিভিন্ন ধর্মকে বিভিন্ন স্থানে "শ্রেষ্ঠ" আখ্যা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু একের অধিক তো শ্রেষ্ঠ হতে পারে না। উদাহরণতঃ, আদিকাণ্ড রামায়ণে (ও অন্যান্য অসংখ্য জায়গায়) পাই "ত্রিলোকমধ্যে সত্য হইতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম নাই।"(১৮) মহাভারতের দ্রোণপর্বে বলা হয়েছে "পণ্ডিতেরা প্রাণিগণকে হিংসা না করাই প্রধান ধর্ম বলিয়া নির্দেশ করেন।"(১৯) পুরুর রাজ্যাভিষেককালে যযাতি যে উপদেশ দেন তাতে বলেন, "জীবের প্রতি দয়া, মৈত্রী, জ্ঞান ও মধুর বাক্য প্রয়োগ, ইহা অপেক্ষা ধর্ম আর লক্ষ্য হয় না।"(২০) "যদি ধর্ম পরিত্যাগ করিতেও হয় তাহাও করিবে, তথাপি কোনক্রমে ক্রোধাবিষ্ট হইবে না।"(২১) এখানে ক্রোধজয়কেই শ্রেষ্ঠধর্মের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যক্ষের প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেছেন, "অনৃশংস প্রধান ধর্ম।"(২২) "ত্যাগই মনুষ্যের প্রধান ধর্ম।"(২৩)—বলেছেন ধর্মব্যাধ দ্বিজোত্তম কৌশিককে ধর্মব্যাখ্যাকালে। ব্যাসদেব বলেছেন, "তপস্যা অপেক্ষা সার পদার্থ আর নাই। তপস্যা হইতে পরম সুখ-লাভ হয়।"(২৪) "দয়ার তুল্য সাধুদিগের পরমধর্ম আর কিছু নাই"—বলেছেন শুকপক্ষী ইন্দ্রকে। আবার সেই অনুশাসনপর্বেই অগ্নিতনয় সুদর্শন বলেছেন, "গৃহস্থদিগের পক্ষে অতিথিসেবা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম আর কিছু নাই।"(২৫) "যজ্ঞের তুল্য উৎকৃষ্ট কার্য আর নাই।"(২৬) এই উক্তি আবার পাই অশ্বমেধিক পর্বে। দেখা যাচ্ছে কোন বিশেষ অবস্থায় বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সংঘাত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী মাত্রায় আছে। সেজন্যই শাস্ত্রকারেরা বারবার বলেছেন, "ধর্মের গতি সূক্ষ্ম।"(২৭) "শ্বাশ্বত ধর্ম অতি দুর্জ্ঞেয়।"(২৮) "যথার্থ ধর্ম স্থির করা অতি দুঃসাধ্য।"(২৯) "ধর্মতত্ত্ব যে ক্ষুরধার অপেক্ষাও সূক্ষ্ম এবং পর্বত অপেক্ষাও গুরুতর তাহার আর সন্দেহ নাই।"(৩০) প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তির পক্ষে শুধু ধর্মতত্ত্ব জানাই যে যথেষ্ট নয় তা বোঝাতে একটি চমৎকার উপমার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে: "দর্বী যেমন নিয়ত সূপে নিমগ্ন থাকিয়াও তাহার রসাস্বাদনে বঞ্চিত হয়, তদ্রূপ জড়ব্যক্তি সর্বদা পণ্ডিতের উপাসনা করিয়াও ধর্মজ্ঞ হইতে পারে

না; কিন্তু জিহ্বা যেমন স্পর্শমাত্রই সূপরসের আস্বাদ গ্রহণ করে, তদ্রূপ বুদ্ধিমান ব্যক্তি অতি অল্পক্ষণ পণ্ডিতের উপাসনা করিয়াই ধর্মের মর্মগ্রহণ করিতে পারেন।"(৩১) দেখা যাচ্ছে কোন ছকবাঁধা পথে চলে ধার্মিক হওয়া যায় না, ধর্ম বিষয়ে বুদ্ধি ও জ্ঞানের প্রয়োজন, তাতেও কুলোতে না পারে এবং সেরকম ক্ষেত্রের জন্য কৃষ্ণ বলেছেন, "কোন কোন স্থলে অনুমান দ্বারাও নিতান্ত দুর্বোধ ধর্মের নির্ণয় করিতে হয়।"(৩২) প্রকৃতই ধর্মানুসারী যে তাকে সংশয়াকীর্ণ হতেই হবে, "সংশয়ারূঢ় না হইলে শুভলাভের সম্ভাবনা নাই।"(৩৩) ধর্মসংশয় থেকে স্বাভাবিক ভাবেই একটি প্রতিক্রিয়া যা হতে পারে তা হল ধর্মে অনাস্থা। কর্ণ আক্ষেপ করেন, "ধার্মিক ব্যক্তিরা সতত কহিয়া থাকেন যে ধর্ম ধার্মিককে সতত রক্ষা করেন। আমরা শাস্ত্র ও শক্তি অনুসারে ধর্মরক্ষণে যত্ন ও ধর্মে দৃঢ় ভক্তি করিয়া থাকি। ধর্ম তথাপি আমাদিগকে বিনাশ করিতেছেন। অতএব বোধ হয় ধর্ম আর নিয়ত ধার্মিককে রক্ষা করেন না।"(৩৪) অন্য একটি প্রতিক্রিয়া হতে পারে ধর্মের বিধানের উদ্ধত অস্বীকার। "বলবান ব্যক্তিদিগের পক্ষে সমুদয় দ্রব্যই পথ্য, সমুদয় বস্তুই পবিত্র, সমুদয় কার্যই ধর্ম এবং সমুদয় দ্রব্যই স্বকীয়।"(৩৫) এই ভাবে তুড়ি দিয়ে সমস্ত ধর্মমীমাংসা উড়িয়ে দেন যিনি তিনি কোন নাস্তিক নন, স্বয়ং বেদব্যাস, কুন্তীকে আপন কুমারীধর্ম লঙ্ঘন করার পাপ বিষয়ে আশ্বস্ত করার মানসে। প্রথম অধ্যায়ে আমাদের ঐতিহ্যের অন্তর্গত যে অতি মানুষের কথা বলা হয়েছে এ হচ্ছে সেই অতিমানুষদের মনোভাব।

কিন্তু ধর্মের অনেকত্ব ও বিভিন্নতার সম্মুখে দিশাহারা না হয়ে তার স্বরূপ সম্যক উপলব্ধি করার চেষ্টা করা যেতে পারে। সেই উদ্দেশ্যে তাদের কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে দেখা যেতে পারে। অবশ্য শ্রেণীবিভাগ যে কিছুই শাস্ত্রেই করা নেই তা নয়। যেমন ভীম বলেছেন, "পরহিংসা, চৌর্য ও পরদারাভিমর্ষণ এই ত্রিবিধ শারীরিক পাপ, অসৎ প্রলাপ, নিষ্ঠুর বাক্যপ্রয়োগ, পরদোষ প্রকাশ ও মিথ্যাকথন এই চতুর্বিধ বাচনিক পাপ এবং পরদ্রব্যাভিলাষ, পরের অনিষ্ট চিন্তা ও বেদবাক্যে অশ্রদ্ধা এই ত্রিবিধ মানসিক পাপ।"(৩৬) কিন্তু এজাতীয় শ্রেণীবিভাগ খুব সাহায্য করে না। পরহিংসা কী অর্থে শারীরিক পাপ? বিশ্লেষণের সুবিধার জন্য ধর্মগুলিকে আমরা চরিত্রানুযায়ী শ্রেণীবিভাগের চেষ্টা ক'রে যে ফল পেয়েছি তা এইরকম।

২

প্রথমেই ভাবতে পারি তিনটি প্রধান ধর্মের কথা—যাদের আমরা "আদিম নিষেধ" বলে অভিহিত করব এবং এই বাক্যব্যবহার দ্বারা ইংরাজীতে যাকে taboo বলে মোটামুটি তাই বোঝাব। সমাজকে ধারণ যা করে তাই ধর্ম,—অধিকাংশ ধর্মেরই মূল অনুপ্রেরণা কোন একটি বিশেষ সমাজব্যবস্থার গাঁথুনিকে দৃঢ়বদ্ধ রাখা। কিন্তু ওদেরই মধ্যে দেখা যায় তিনটি বিশেষ নিষেধ, যা সমাজসৃষ্টির একেবারে আদিম অবস্থা থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রায় সব সমাজেই বলবৎ রয়েছে। এই তিনটি হল হত্যার নিষেধ, পরস্বাপহরণ নিষেধ, এবং পরদারগমন নিষেধ। ইচ্ছানুযায়ী হত্যাকে নিবারণ না করলে

গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনই অসম্ভব। অন্য দুইটি নিষেধের ভিত্তি ব্যক্তিগত মালিকানা। পরদার-গমনের ভিত্তি—সভ্যতার আদিমকাল থেকে প্রত্যেক নারীকে কোন এক বিশেষ পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে দেখা। এই ত্রিবিধ নিষেধ খৃষ্টধর্মেও একই গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। কিন্তু Bible শুধুমাত্র "thou shalt not kill," "thou shalt not commit adultery" এবং "thou shalt not steal" বলেই ক্ষান্ত হয়েছে, কিন্তু আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের একটি বৈশিষ্ট্যই মনে হয় এই যে নিষেধ অমান্য করার পাপের গুরুত্বকে ক্ষেত্রনির্ভর করা হয়েছে। এমন কি, এমন ক্ষেত্রের কথাও উল্লেখ করা আছে যেখানে নিষেধ লঙ্ঘন করায় পাপ একেবারেই হয় না (এ জাতীয় ব্যতিক্রমের অনুমোদনের জন্য হয়তো আমাদের এই নিষেধগুলিকে taboo বলা সম্পূর্ণ ঠিক নয়)। উদাহরণতঃ হত্যা পাপ, কিন্তু সর্ব্বাধিক পাপ গোহত্যায় এবং ব্রহ্মহত্যায়। স্ত্রীহত্যার নিষেধের উপরও যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গুরুহত্যাও বিশেষ উল্লেখ পায়। তেমনি পায় ভ্রূণঘাতকতা। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শত্রুবিনাশই ধর্ম্ম। পরস্বাপহরণ পাপ নিঃসন্দেহ, কিন্তু ব্রহ্মস্বাপহরণ বিশেষরূপে পাপ। আবার কোন কোন পাপের শাস্তি হিসাবে পাপাচারী ব্রাহ্মণ ও স্ত্রীলোকের হত্যাও অনুমোদিত হয়েছে, যেমন দেবীভাগবতে। (৩৭) তেমনি, "গুরুর নিমিত্ত আপৎকালে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির ধন হরণ করাকে চৌর্যদোষমুক্ত" বলে বলা হয়েছে। পরস্ত্রীগমন (বা পরস্ত্রীগমনচিন্তা)-ঘটিত পাপকেও যতরকমের বিশেষ সম্পর্কের পরস্ত্রী হতে পারে তাদের দ্বারা বিশেষিত করা হয়েছে ঃ যেমন ভ্রাতৃবধূ গমন, পুত্রবধূগমন, মিত্রবধূগমন, বিমাতৃগমন, গুরুপত্নীগমন (এবং হরণ), রাজপত্নীহরণ (গমনোদ্দেশ্যে) ইত্যাদি। এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে গুরুপত্নীগমনের উপর। শেষোক্তকে বলা হয়েছে মহাপাতক, পরদারগমন সাধারণভাবে উপপাতক। যে নিষেধাজ্ঞা যত বেশীবার উচ্চারিত হয়েছে তার সামাজিক প্রয়োজনও সেই পরিমাণ অধিক ছিল—এই যুক্তি যদি মানা যায় তো ধরে নিতে হয়, যত প্রকার পরস্ত্রীরতির চর্চা পুরাকালে হত তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী হত শিষ্য ও গুরুপত্নীদের মধ্যে। এই ব্যাপারে শাস্ত্রকারদের তটস্থ হয়ে থাকতে হত বলে মনে হয়। যখন তাঁরা জপতপ বেদপাঠ সামগান নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন এবং পুণ্যবতী নারীদের ঋতুকাল ছাড়া অন্যসময় স্বামীসম্ভোগ করা উচিত কিনা জাতীয় গুরুতর সমস্যার বিষয়ে পুঁথিপত্র লিখতেন তখন বোধহয় তাঁদের তরুণী ভার্যারা সমবয়স্ক শিষ্যদের সঙ্গে অধিকতর মনোরঞ্জনকর উপায়ে কাল অতিবাহন করার সুযোগের সদ্ব্যবহার করতেন।

পরস্ত্রীগমন ছাড়াও সমাজমাত্রেই আরও অনেকগুলি যৌনসম্পর্কঘটিত নিষেধ থাকে, আমাদের পৌরাণিক সমাজেও ছিল। যেমন, ভগিনীগমন, পশ্বাদির সঙ্গে মিথুন, বলাৎকার, আপন কন্যার কৌমারাবস্থা দূষিত করা, কুমারীকন্যাদূষণ, দাসীসম্ভোগ ইত্যাদি। বেশ্যা-সক্তির উল্লেখও দু-চার জায়গায় পাওয়া যায়। কিন্তু পুণ্যকর্ম্মের পুরস্কার হিসেবে অপ্সরা-সংসর্গ যে ভাবে প্রতিশ্রুত হয় এবং উৎসবাদিতে সুসজ্জিতা ও সুন্দরী বারনারীদের ভূমিকা যে রকম উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বর্ণিত হয় তাতে মনে হয় না যে বেশ্যাসংসর্গকে খুব হেয় চক্ষে দেখা হত। অবশ্য "নিজকন্যাদ্বারা জীবিকা অর্জন"কে খুবই দূষণীয় মনে করা হত। এই

প্রসঙ্গে একটি বিশেষ যৌননিষেধের অনুপস্থিতি মনে প্রশ্ন জাগায়। সমকামিতার কোন উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না—এর থেকে কি ধরে নেবো যে এই বিশেষ যৌন সম্পর্কটি পৌরাণিক ভারতবর্ষে অনুপস্থিত ছিল?

আর কয়েকটি যৌনবিধি বিশেষ রকম ভাবে ভারতীয়। যেমন ঋতুকালে ভার্যাগমন। স্ত্রীর ঋতু বৃথা যেতে দেওয়াটা এতদূর অকর্তব্য মনে করা হত যে ঋতুকালে মাত্র ভার্যাগমন করাটা ব্রহ্মচর্য ধর্মের অন্তর্গত ছিল (মহাভারতের অনুশাসনপর্ব (৩৮) দ্রষ্টব্য)। মার্কণ্ডেয় পুরাণে আছে জনকবংশের রাজা স্বীয় পত্নী পীবরী ঋতুমতী হলে তাঁর ঋতুরক্ষা না করে দ্বিতীয় পত্নী কৈকেয়ীতে আসক্ত হওয়ার পাপের দরুণ ঘোর নরক ভোগ করেন।(৩৯)।

যৌনবিধিদের মধ্যেও যে বর্ণাশ্রমঘটিত ভেদচিন্তার অনুপ্রবেশ ঘটানো হবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। সুতরাং শূদ্রের ব্রাহ্মণীগমন যে ঘোর পাপ হিসেবে বর্ণিত হবে কিন্তু উচ্চকুলের পুরুষের যে নীচকুলাদপি রমণীরত্নসম্ভোগকে প্রশ্রয়ের চোখে দেখা হবে তা সহজেই বোধগম্য।

কিন্তু ব্যতিক্রমই ভারতীয় ধর্মচিন্তার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য, অন্তর্বিরোধই আমাদের শাস্ত্রের অন্যতম প্রধান লক্ষণ। সুতরাং একদিকে যেমন নির্দেশ পাই, "যে নারী আপনার পতিকে পরিত্যাগপূর্বক নিকৃষ্ট জাতির পুরুষের সহিত সংসর্গ করিবে, মহীপাল তাহাকে প্রশস্ত প্রকাশ্য স্থলে কুক্কুর দ্বারা ভক্ষণ করাইবেন।" (৪০) অপরদিকে বলা হয়েছে "অভিযাচিত হইয়া পরস্ত্রীসম্ভোগ করিলে পাপভাগী হইতে হয় না।" (৪১) অর্থাৎ কিনা বলাৎকার না করা পর্যন্ত পরদারসম্ভোগে কোন পাপ নেই।

এই তিনটি মুখ্য আদিম নিষেধের পাশাপাশি আরও কিছু নিষেধ প্রতি সমাজেই থাকে; যেমন আদিম নিষেধের অন্য এক বিষয়বস্তু ভক্ষ্য দ্রব্য। বর্তমান যুগ পর্যন্ত ঐতিহাসিক ভারতবর্ষের অধিবাসীদের দৈনিক জীবনে ধর্ম বলতে খুব বড় অংশেই ভক্ষ্যাভক্ষ্য সম্পর্কিত বিধিনিষেধ বুঝিয়েছে। কিন্তু পৌরাণিক ধর্মশিক্ষায় এই বিষয়টির উপর কত কম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে দেখে আশ্চর্য হতে হয়। কোথাও কোথাও সুরাপান ও মাংসভক্ষণ দোষ হিসেবে নিন্দিত হয়েছে, কিন্তু তাও খুবই ক্ষীণ ভাবে। বস্তুত সে যুগে উচ্চবর্ণের নারীদের মধ্যেও এদের প্রচলন ছিল। এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে জতুগৃহদাহের পরিকল্পনায় পঞ্চপাণ্ডবদের সঙ্গে দ্রৌপদীকেও মদ্যপানে জ্ঞানশূন্য করানোর কথা ভাবা হয়েছিল এবং যদুবংশ ধ্বংস হল যে লজ্জাকর ঘটনায়, তার সূত্রপাতে ছিল সম্মিলিত স্ত্রী ও পুরুষের মদ্যপানে উন্মত্ততা।

৩

এবপর একত্র করতে পারি একজাতীয় অতিশয় তুচ্ছ বিধিনিষেধকে যারা হাঁচি-কাশি-টিকটিকি জাতীয় কুসংস্কারের পর্যায়ে পড়ে। জ্যোতিষ, হস্তরেখা, পাঁজিপুঁথি, তাগা-তাবিজ, গ্রহরত্ন, তিথিলগ্ন, শান্তি স্বস্ত্যয়ন, শৌচ প্রভৃতির কথা বলছি। সর্ব্বকালের সর্ব্বদেশের মানুষের মধ্যেই এদের অল্পবিস্তর প্রভাব লক্ষিত হয়। আমাদের ধর্মীয় ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্য এই যে এই তুচ্ছ বিধিনিষেধগুলো, যা প্রায়শই সম্পূর্ণ অর্থহীন বা কৌতুককরও বটে, তারা সহাবস্থান করছে শাস্ত্রকারদের গম্ভীরতম ও গভীরতম ধর্মনির্দেশের

সঙ্গে, যার ফলে ইংরাজিতে from the sublime to the ridiculous বলে যে চিন্তা-দোষের কথা বলা হয়েছে সেই দোষ খুব বেশী পরিমাণে আমাদের পৌরাণিক ধর্মকথনকে দুষ্ট করে। দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ভরত একটি পাপের তালিকা দিয়েছেন। তাতে "পাপীয়সী দাসীসম্ভোগ"-এর ঠিক পরেই আছে "সূর্যাভিমুখে মূত্রত্যাগ"; "গুরুহত্যা" যেমন আছে তারই সঙ্গে আছে "একাকী মিষ্টদ্রব্য ভক্ষণ।" (৪২) দিবানিদ্রা পরিত্যাগ করাটা যে শুভফলপ্রদ নিশ্চয়ই হতে পারে, তা আমরাও জানি, কিন্তু গার্গ্য যখন তাকে "মহাফলপ্রদ শ্রেষ্ঠ ধর্ম" (৪৩) বলে বর্ণনা করেন তখন আশ্চর্য হতে হয়। ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করলে অভীষ্ট গতি লাভ হয় তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু "যিনি অধোমুখে বৃক্ষে লম্বমান হয়েন" (৪৪) তাঁকেও একই সঙ্গে সেই গতি প্রতিশ্রুত হয়েছে। এসবের চেয়েও অনেক তুচ্ছ কারণে যে আমরা ঘোর নরকের অধিবাসী হতে চলেছি তা কি আমরা জানতাম? দেবীভাগবতে অনুশাসন দেওয়া হয়েছে, "অপরের নিদ্রাভঙ্গ, কাহারও কথার মধ্যে বাধা দেওয়া, দম্পতির প্রণয়বিচ্ছেদ, মাতা হইতে শিশুকে পৃথক করা, এ সমস্তই ব্রহ্মহত্যাতুল্য। (৪৫)"

এই বিধিনিষেধগুলি যদি হয় যান্ত্রিক ধর্মবোধের এক অংশ তো তার অন্য এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ আছে যাকে বলা যেতে পারে 'আদিম মন্ত্র'। 'মন্ত্র' দ্বারা আমরা এখানে বোঝাচ্ছি মোটামুটিভাবে তাকেই যাকে ইংরিজিতে বলা হয় magic। এক ধরনের ক্রিয়াকাণ্ড যাদের অনুশীলনে স্বর্গ বলা যাক, পরমগতি বলা যাক, সিদ্ধি বলা যাক জীবনের চূড়ান্ত সার্থকতা অর্জন করা যায় যান্ত্রিক উপায়ে, shortcut পথে। এইসব ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে মানুষে মানুষে সম্পর্কের বালাই নেই, যা আছে তা মানুষের সঙ্গে বহিঃপ্রকৃতির বা তার নিজ প্রকৃতির সম্পর্ক। অর্থাৎ কিনা এগুলো যেন স্বর্গারোহণের যন্ত্রচালিত সোপান বিশেষ। আমাদের ধর্মীয় ঐতিহ্যে এই জাতীয় যান্ত্রিক সোপানের প্রধান উদাহরণ হল পূজা, যজ্ঞ, পশুবলি ও নরবলি, তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধন, সাধন ভজন ও মন্ত্রজপ, তীর্থভ্রমণ, বেদাধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য, প্রভৃতি।

যজ্ঞকে একদিকে উৎকৃষ্টতম কার্য বলা হয়েছে, অপরদিকে (সম্ভবত পরবর্তীকালে) আবার বলা হয়েছে "যেমন পঙ্কদ্বারা পঙ্কক্ষালন করা যায় না এবং সুরার কণামাত্রে অপবিত্র হইয়া কোন সামগ্রী প্রভূত সুরায় পবিত্র হইতে পারে না, সেইরূপ যজ্ঞাদিদ্বারা প্রাণিহত্যাপাপ হইতে মুক্তিলাভ অসম্ভব।"(৪৬) তপস্যাদ্বারা ইন্দ্রত্ব লাভ করা যেতো, যে কোন অভীষ্ট বর উদ্দিষ্ট দেবতার কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া যেতো, পরন্তু এমন কোন পাপ নাই যা এই যন্ত্রদ্বারা পরিশোধিত করা না যেতো। "মদ্যপায়ী, চৌর্যনিরত, ভ্রূণঘাতী ও গুরুতল্পগামী পামরেরাও তপঃপ্রভাবে পাপবিমুক্ত হইয়া উৎকৃষ্টগতি লাভ করিতে পারে।" (৪৭) কিন্তু "তপস্যা, ত্যাগ ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ, এই তিনের মধ্যে তপস্যা অপেক্ষা ত্যাগ ও ত্যাগ অপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞানলাভ শ্রেষ্ঠ।" (৪৮) অর্জুনকে গন্ধর্বরাজ বলেন, "ব্রহ্মচর্য পরমোৎকৃষ্ট ধর্ম। তুমি সেই ধর্মাক্রান্ত বলিয়া আমাকে পরাজয় করিয়াছ।" (৪৯) ইন্দ্রিয়দমন সম্বন্ধে বলা হয়েছে "দমগুণ দান যজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"(৫০) মহাভারতের সবচেয়ে মহিমামণ্ডিত চরিত্র যুধিষ্ঠির নন যিনি সদা সত্য কথা বলতেন। তিনি ভীষ্ম, যিনি ধর্মতত্ত্বে পারঙ্গম ছিলেন বটে কিন্তু যিনি অমরত্বের অধিকারী হয়েছিলেন ইন্দ্রিয়দমনের জন্য। কৃচ্ছ্রসাধন

সম্পর্কে সীতা বলেছেন, "বিচক্ষণ মনুষ্যগণ যত্নসহকারে বিহিত নিয়ম দ্বারা শরীর ক্ষীণ করিয়া ধর্ম লাভ করেন।"

কৃচ্ছ্রের বিষয়টি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ এবং তাকে আরও বিশদ করা হবে পরবর্তী একটি পরিচ্ছেদে। শম ও দমের প্রধান লক্ষ্য ছিল কাম ও ক্রোধ এবং এই বিষয় দুটিরও গুরুত্ব অনুসারে স্বতন্ত্র আলোচনা করা হবে।

৪

যান্ত্রিক ধর্মের গণ্ডী অতিক্রম করে এসে আমরা প্রথমেই যে ধর্মের সম্মুখীন হই তা স্পষ্টতই কোন বিশেষ সমাজ ব্যবস্থাকে দৃঢ়ভাবে রাখার জন্য এবং সেই ব্যবস্থার অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থ সাধন করার উদ্দেশ্যে কল্পিত ও প্রচারিত হয়েছিল। বর্ণ, আশ্রম, লিঙ্গ প্রভৃতি মানুষের সামাজিক অবস্থান ভিত্তিক পরস্পরবিরোধী খণ্ডবিখণ্ডিত ধর্মের কথা যা প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়েছে এ সেই ধর্ম।

ব্রাহ্মণের বেদপাঠ কর্তব্য, শূদ্রের বেদপাঠ বা শাস্ত্রচর্চা পাপ; এমনকি শূদ্রদের কোন উপদেশ দেওয়াও পাপ। স্ত্রীধর্মের সারাৎসার নিম্নলিখিত কয়েকটি বাক্যে বিধৃত করা যায়: "স্ত্রীগণের ভর্তাই মাতা, পিতা, বন্ধু, সখা, মিত্র ও বান্ধব ইহাতে সন্দেহ নাই, তারা ভর্তার প্রেমে পুলকিতগাত্রা হইয়া যদি মহৎ পাপ করে, তাহলেও পরম স্বর্গ লাভ করে, এর অন্যথায় নরকগামিনী হইবে।" (৫১) ব্রাহ্মণের ধর্ম, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, রাজধর্ম, সন্ন্যাস-ধর্ম—এসব ধর্মেরই স্বতন্ত্র ও বিশদ আলোচনা আমাদের শাস্ত্রে পাওয়া যায়; শুধু তাই না, তাৎক্ষণিক অবস্থাভেদেও ধর্মের ভেদ হয়; ফলতঃ বিপন্ন ব্যক্তির ধর্ম একপ্রকার, অবিপন্ন-ব্যক্তির ধর্ম অন্যপ্রকার, আপদ্ধর্মও ভিন্নতর। (এই প্রসঙ্গে মহাভারতের শান্তিপর্ব, পূর্বার্ধ [৫২] দ্রষ্টব্য)। আপদ্ধর্মের একটি লক্ষণ, "বর্ণচতুষ্টয়ের পৃথক পৃথক ধর্ম নির্দিষ্ট থাকিলেও আপৎকালে তাহারা পরস্পর পরস্পরের ধর্ম পরিগ্রহ করিতে পারে।" (৫৩) অবশ্য নীচবর্ণের ব্যক্তিরা কখনও এই ব্যতিক্রমের অধিকারী হয়েছে বলে মনে হয় না। নীচদের চিরতরে নীচে চেপে রাখার জন্য নীচজাতির সেবাকেও পাপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। দানকে পুণ্যকর্ম হিসেবে খুবই মর্যাদা দেওয়া হয়েছে আমাদের শাস্ত্রে, কিন্তু তাও বর্ণধর্মের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। প্রতিগ্রহকে ব্রাহ্মণের ধর্ম মনে করা হয়েছে কিন্তু ক্ষত্রিয়ের পক্ষে তা পাপ। অর্থাৎ ক্ষত্রিয় দান করবে, ব্রাহ্মণেরা দান গ্রহণ করে পুষ্টিলাভ করবে।

এই ধর্মের অঙ্গস্বরূপ অনেক গুণের প্রচার করা হয়েছিল। এই গুণগুলিকে আমরা 'শিষ্টাচার' বলব। অতিথিসেবা, গুরুসেবা, বৃদ্ধের সেবা, স্বজনতোষণ, ব্রাহ্মণের সেবা, বিবাহ করা, পুত্রোৎপাদন, উপযুক্ত সময়ে কন্যাসম্প্রদান করা—এসবেরই পৃথক উল্লেখ ও আলোচনা পাওয়া যায়। এদের অধিকাংশই গার্হস্থ্য ধর্মের পর্যায়ভুক্ত।

ধর্মাদির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে শাস্ত্রের মধ্যে অমিলের প্রসঙ্গ আগেই উত্থাপন করেছি। অতএব আশ্চর্য হতে হয় না যখন দেখি বলা হচ্ছে, "সমুদয় শাস্ত্র অপেক্ষা আচার শ্রেষ্ঠ। আচার হইতে ধর্মের উৎপত্তি হয়।" (৫৪) শিষ্টাচারের অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ ধর্ম সম্বন্ধেও যে এইরূপ শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত হবে তাতেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। দান বা অতিথিসেবা তো পরমধর্মের স্থান শাস্ত্রের কোথাও না কোথাও পাবেই, কিন্তু সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা এমনও বলে বসেন, "সন্তানই পরমধর্ম। কি তপস্যা কি যজ্ঞ কি অন্যান্য পুণ্যকর্ম, সন্তানের সদৃশ কিছুই দেখিতে পাই না।"(৫৫)

কিন্তু আচারের চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে আমাদের শাস্ত্রেই এমন অনেক-গুলি চারিত্রিক গুণ বা অনুশীলনের উপর যাকে আমরা বলব 'শীল'। সব ধর্মেরই মূল প্রেরণা বিশেষ সমাজব্যবস্থাকে ধারণ করা, কোন কোন বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থসাধন। কিন্তু ধর্মের ক্রমবিকাশের একটি মূল লক্ষণই মনে হয় এই যে তাদের উপর প্রত্যক্ষ গোষ্ঠীস্বার্থের প্রভাব ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে যায়, তারা উত্তরোত্তর আপাত দৃষ্টিতে স্বার্থগন্ধহীন হয়ে ওঠে। শীল বলতে যেসব চারিত্রিক গুণের কথা বা অনুশীলনের কথা বোঝাচ্ছি শিষ্টাচারের সংগে তাদের এইখানেই বিরাট প্রভেদ যে শীলগুলি আপাত দৃষ্টিতে স্বার্থগন্ধবিহীন। কিন্তু আপাতদৃষ্টি ভেদ করে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে যে সব গুণ প্রজাদের চরিত্রে অনুপ্রবিষ্ট হলে শাসকদের পক্ষে শোষণ ভিত্তিক সমাজ পরিচালনা সহজ হয় সেই সব গুণের উপরই দেওয়া হয়েছে জোর। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করে দেখাব যে এই গুণগুলি মোটেই সমাজের কর্তাস্থানীয় ব্যক্তিদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করা হত না।

আমরা পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতের যে সব শীলের উল্লেখ পাই তাদের একত্র করলে মোটের উপর এরকম দাঁড়ায়:

সত্যপরায়ণতা, শম, দম, ইন্দ্রিয়জয়, অহিংসা, অনৃশংসতা, নির্বৈরতা, দয়া, শরণাগতকে আশ্রয়, অনুগ্রহ, শরণাগত শত্রুকে রক্ষা, সর্বভূতে দয়া, সর্বলোকহিতৈষণা, সর্বভূতে সমদৃষ্টি, অপরাধী ব্যক্তিদের প্রতিও স্নেহদৃষ্টি, ন্যায়ানুগত্য, ত্যাগ, বৈরাগ্য, নির্লোভ, নিরাসক্তি, ক্রোধজয়, ক্ষমা, ধৈর্য, অদ্রোহ, অকৃপণতা, অনসূয়া, অহংকারশূন্যতা, মৎসরহীনতা, শ্রী, মৈত্রী, লজ্জা, সন্তোষ. সরলতা, সমদৃষ্টি, তিতিক্ষা, আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান, সংযম, পরাক্রম, সেবা, পরোপকার, উপকারের প্রত্যুপকার, কৃতজ্ঞতা, শান্তি, মৃদুভাব, বিনয়, নিস্পৃহতা, সহিষ্ণুতা, বিদ্যা, অধ্যয়ন, সাধুসঙ্গ, ধার্মিকের শুশ্রূষা, ভৃত্যদের কষ্ট না দেওয়া, বৃদ্ধ গর্ভবতী নারী প্রভৃতিদের প্রতি কৃপাশীল ব্যবহার ইত্যাদি।

অপরদিকে দোষের তালিকায় উপরিউক্ত গুণগুলির বিপরীতগুলিকে বাদ দিলে পাই অভিমান, কৃতঘ্নতা, শাঠ্য, নিন্দা, অদূরদর্শিতা, অনিষ্টচিন্তা, নাস্তিকতা, পরকৃতকার্যকে আত্মকৃত বলে বলা, আলস্য, মোহ, মায়া, গর্ব, বিষয়তৃষ্ণা, অবজ্ঞা, ঔদরিকতা, পরনিন্দাশ্রবণ, বিশ্বাসঘাতকতা, গ্রামঘাতকতা, প্রমাদ, দীর্ঘসূত্রিতা, পরশ্রীকাতরতা, দম্ভ, দ্বেষ, আত্মশ্লাঘা, প্রবঞ্চনা, বাক্‌পারুষ্য ইত্যাদি।

শীলগুলিকে তালিকাবদ্ধ করার সময় আমরা গুরুলঘুভেদ উপেক্ষা করেছি, কিন্তু বলাই বাহুল্য এদের প্রত্যেকের উপর সমপরিমাণ মূল্য আরোপ করা হয়নি। বস্তুতঃ, একটু দেখলেই দেখা যায় যে কয়েকটি বিশেষ চারিত্রিক গুণের উপর অত্যন্ত বেশি গুরুত্ব আরোপ করে তাদের সনাতন ধর্ম বা পরম ধর্ম আখ্যা দেওয়া হয়েছে; যদিও এও আমরা দেখেছি আগেই যে যতকটি ধর্মকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা হয়েছে ততকটি নিশ্চয়ই একইকালে শ্রেষ্ঠ হতে পারে না। চূড়ান্ত মূল্য বা মর্যাদা দেওয়া হয়েছে যে ধর্মগুলিকে তারা হল সত্যধর্ম, শম ও দম। তারপরের সারিতে রাখা যায় দয়াধর্ম, অনৃশংসতা, ত্যাগ তথা বৈরাগ্য, ক্ষমাধর্মকে। এদের মধ্যে সত্যধর্মের স্থান অবিসংবাদিতভাবেই আর সকলের ঊর্ধ্বে এবং সত্যধর্ম বলতে আমাদের শাস্ত্রে যা বোঝানো হয়েছে সেজাতীয় কোন ধর্মকে তুলনীয় কোন গুরুত্ব অন্য কোন ধর্ম-সভ্যতায় দেওয়া হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। এই কারণে, সত্যধর্ম সম্পর্কে স্বতন্ত্র পূর্ণাঙ্গ আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে করা হয়েছে। কিন্তু আধুনিক ভারতবর্ষে যে একটি ধারণার

প্রচলন করানো হয়েছে যে সত্য ও অহিংসা (যাদের বর্বর অনুবাদ করা হয়েছে truth এবং non-violence এই দুই ইংরিজি শব্দে)—এই দুই হল ভারতবর্ষের সনাতন ধর্ম, তার কোন সমর্থন অন্ততঃ আমাদের পৌরাণিক সাহিত্যে পাওয়া যায় না। সত্যকে যে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে অহিংসাকে তা দেওয়া হয়নি। অহিংসাকে যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তা দয়া ত্যাগ ক্ষমা ও বৈরাগ্য প্রভৃতিকেও দেওয়া হয়েছে। শব্দব্যবহারের বিষয়েও এইটি লক্ষণীয় যে "অহিংসা" কথাটি বর্তমান শতাব্দীতে যেরকম একটি মন্ত্রপূত কবচের স্থান পেয়ে গেছে তার কোন ভিত্তি পৌরাণিক সাহিত্যে নেই। সেখানে অহিংসা শব্দটি যতটা ব্যবহার হয়েছে তার চেয়ে বেশীই হয়তো হয়েছে অন্য অনেক শব্দ ও বাক্য—যেমন অনৃশংস্য (৫৬), হিংসাবৃত্তি হইতে প্রতিনিবৃত্তি (৫৭) ইত্যাদি।

বৈরাগ্য প্রসঙ্গে সেই প্রসিদ্ধ শ্লোকটি স্মরণীয় যা থেকে ধারণা হয় অধিক ভোগে বদ-হজমের মধ্যেই ত্যাগের ধারণার জন্ম : "কাম্যবস্তুর উপভোগে কামের উপশম হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত ঘৃতসংযুক্ত বহ্নির ন্যায় উহা ক্রমশঃ পরিবর্ধিত হইতে থাকে। যদি একজন এই রত্নগর্ভ পৃথিবীর সমুদয় হিরণ্য, সকল পশু এবং সমস্ত মহিলা উপভোগ করে, তথাপি তাহার তৃপ্তিলাভ হওয়া দুর্ঘট।"(৫৮) কিন্তু ত্যাগ সম্বন্ধে গভীরতর চিন্তার উদাহরণও দু-এক জায়গায় পেয়ে যাই। যেমন ভীমের "মানুষ ত্যাগ দ্বারা ভোগশীল।"(৫৯) বা যে উক্তিতে "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ" এই দার্শনিক তত্ত্বের আভাষ পাওয়া যায়। ত্যাগ ও নির্লোভ স্বভাবতই সম্পর্কিত। লোভ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "স্বর্গদ্বার অতি দুর্গম স্থান। লোভ ঐ দ্বারের অর্গলস্বরূপ।" (৬০) দয়া সম্বন্ধে বাসুদেব বলেছেন, "সর্বভূতে দয়ারূপ প্রধান ধর্ম আমার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রিয় মানস পুত্র।"(৬১) দয়ার প্রয়োগক্ষেত্র হিসাবে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে শরণার্থীর উপর, "শরণাগত ব্যক্তিকে বিনাশ করিলে গুরুতল্পগমন, ব্রহ্মহত্যা ও সুরাপানজনিত পাপে দূষিত হইতে হয়।"(৬২) মার্কণ্ডেয় পুরাণে বলা হয়েছে, "আর্তের পরিত্রাণে যাহার প্রবৃত্তি হয় না যজ্ঞ দান ও তপস্যায়ও তাহাকে কোন লোকই সুখদান করে না।"(৬৩) এই প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন না উঠেই পারে না। এই ধরণের বিশেষভাবে চিহ্নিত ক্ষেত্র ও অবস্থা বিশেষে প্রযোজ্য দয়াধর্মের সঙ্গে খ্রীষ্টীয় ধর্মতত্ত্বে শ্রেষ্ঠস্থান দেওয়া হয়েছে যে ধর্মকে, যাকে ইংরিজিতে বলা হয়েছে love, তার সঙ্গে মিল বা অমিল কতটা আছে? অবশ্য ক্ষেত্রনির্বিশেষে দয়ার কথাও শাস্ত্রে আছে : সর্ব্বভূতে দয়া (৬৪), অপরাধী ব্যক্তির প্রতিও স্নেহদৃষ্টি (৬৫) শরণাগত শত্রুকেও রক্ষা (৬৬), সকল প্রাণীকে আত্মস্বরূপ বিবেচনা করা।(৬৭) খ্রীষ্টীয় বিধানে ক্ষমাগুণের যে স্থান আছে তার সঙ্গেও আমাদের শাস্ত্রের সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যায়, "ক্ষমা ও অনৃশংসতা মহাত্মা-দিগের চরিত্রস্বরূপ ও সনাতন ধর্ম" (৬৮) বলেছেন কৃষ্ণ। "ক্ষমাপ্রদর্শন মহৎকর্তব্য। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের পক্ষেই ক্ষমা অলঙ্কারস্বরূপ। ক্ষমাই দান, ক্ষমাই সত্য, ক্ষমাই যজ্ঞ, ক্ষমাই যশ, ক্ষমাই ধর্ম, ক্ষমাতেই এই সংসার প্রতিষ্ঠিত আছে।"(৬৯) এসব সত্ত্বেও, বাক্যব্যবহারে সাযুজ্য খুঁজে পেলেও পুরাণপ্রসিদ্ধ এমন কোন ধর্মবীরের কথা কি আমরা মনে আনতে পারি যিনি love thy neighbour জাতীয় কোন ধর্ম পালনের দরুনই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন? বস্তুতঃ বুদ্ধের করুণা বা পরবর্তী কালের বৈষ্ণবদের প্রেমের ধারণার সঙ্গে খ্রীষ্টীয় love-এর কতটা মিল অমিল আছে তা স্বতন্ত্রভাবে বিবেচ্য। কিন্তু পুরাণে ও মহাকাব্যদ্বয়ে খ্রীষ্টীয় love-এর কাছাকাছি কোন ধর্মই গুরুত্ব পেয়েছে বলে মনে হয় না। কিন্তু সার্বিকভাবে মিল না থাকলেও কোথাও কোথাও আকস্মিকভাবে এমন এক-একটা মিল

খুঁজে পাওয়া যায় যা মনে হয় যেন একে অন্যের প্রতিধ্বনি। উদাহরণতঃ ভীষ্ম যখন বলেন, "ফলতঃ যাহা আপনার প্রতিকূল তাহা কদাচ অন্যের নিমিত্ত অনুষ্ঠান করিবে না ;"(৭০) তখন কি যিশুর "As ye would that men should do to you do ye also to them likewise" এই বাণী মনে পড়ে না ?

৫

ধর্ম বলতে যে জাতীয় ধারণার কথা আলোচনা করেছি তা মার্কসবাদী সমাজবিশ্লেষণে যাকে উপরিস্থিত কাঠামো বলা হয় (Super Structure) তার অংশ বিশেষ। উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক এই দুইয়ের সমন্বয়কে বলা হয় ভিত্তি-কাঠামো (infra-structure)। মার্কসবাদী সমাজদর্শন অনুসারে উপরিস্থিত কাঠামোর সামাজিক প্রয়োজনীয়তা হল ভিত্তি কাঠামোকে স্থিতিশীলতা দান করা। এই অর্থে উপরিস্থিত কাঠামোর আকার ও গঠনকে নির্ধারণ (determine) করে দেয় ভিত্তি কাঠামো। কিন্তু এই নির্ধারণ সত্ত্বেও উপরিকাঠামো অনেক অংশে স্বয়ংচালিত (autonomous)ও হয় বটে। উপরিস্থিত কাঠামোর অন্তর্গত রাষ্ট্র ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে এ কথাটা সত্য কিন্তু অনেক বেশী সত্য ঐ কাঠামোর অন্তর্গত চিন্তার জগৎ সম্পর্কে। ধর্মের প্রধান কাজ অবশ্যই একটি বিশেষ সমাজ ব্যবস্থাকে জনমানসে গ্রহণযোগ্য করে দেখানো। কিন্তু যে কোন ধর্মের মধ্যেই অনুসন্ধান করলে এমন অনেক কিছু পাওয়া যায় যা প্রত্যক্ষ ভাবে এই কর্তব্যে রত নয়। আমরা এইবার ব্রাহ্মণ্য ধর্মের এই দিকটার আলোচনা করব।

ধর্মচেতনার উন্মেষের কোন একটা স্তর থেকে ধর্ম পুরস্কারনির্ভরতা থেকে ক্রমে ক্রমে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে শুরু করে। স্বর্গ ছাড়াও অন্য অনেক পুরস্কারের লোভ পুণ্যবানদের দেখানো হয়েছে। মাৎস্য পুরাণে বলা হয়েছে, "ক্রিয়া কৌশল সৌভাগ্য লাবণ্য—সমস্তই ধর্ম হইতে লাভ হয়।...বিচিত্র বিমান, সুন্দরী অপ্সরা, তেজঃশীল শরীর এসকল পুণ্যবান জনগণই লাভ করিয়া থাকে ..উত্তম অন্নপানীয়, নৃত্য, গীত, মাল্য, অনুলেপন, রত্ন, বস্ত্র এসকল পুণ্যেরই ফল। পুণ্যবান মানুষেরই রূপ ও ঔদার্য-গুণোপেত অতি মনোহর রমনীবৃন্দসম্ভোগ ও প্রাসাদপৃষ্ঠে বাস লাভ হয়...।"(৭১) কিন্তু এই পুরস্কার তো অতি স্থূল রুচি ও কল্পনার পরিচায়ক। সূক্ষ্মতর রুচি ও বিচারক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্যও তাঁদের উপযুক্ত পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। যেমন, 'যাঁহারা ধার্মিক তাঁহারা ভেলার ন্যায় অনায়াসেই দুঃখ-সাগর পার হইতে পারেন, কিন্তু যাহারা পাপভারে আক্রান্ত হইয়াছে তাহারা সলিলনিক্ষিপ্ত লোষ্ট্রের ন্যায় দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়া যায়।" [ব্যাধ অর্জ্জুনকে উদ্দিষ্ট গৌতমীর বাণী(৭২)] পুরাণপ্রসিদ্ধ অনেক ধর্মবীরই ধর্মানুসরণের প্রেরণা হিসেবে স্বর্গসুখের সঙ্গে সঙ্গে মর্ত্যে যশের ও কীর্তির কথা উল্লেখ করেছেন। শ্রীরামচন্দ্রকে কৌশল্যা ও লক্ষ্মণ বনগমনে নিবৃত্ত করতে প্রয়াসী হলে তাঁদের যুক্তিকে খণ্ডন করতে তিনি যত যুক্তি দেন তাদের একটি হল এই যে পিতৃসত্য রক্ষা করে তিনি যশের ভাগী হতে চান। কর্ণ বলেন, "আমি প্রাণদান করিয়াও কীর্তিলাভ করিতে বাসনা করি। কীর্তিমান লোকই স্বর্গলাভ করে এবং কীর্তিভ্রষ্ট ব্যক্তি বিনষ্ট হয়। কীর্তি মাতার ন্যায় পুরুষের জীবন রক্ষা করেন, কিন্তু কুকীর্তি জীবিত মনুষ্যকেও গতজীবিত করিয়া ফেলে।"(৭৩)

কিন্তু স্বর্গসুখও না, কীর্তিও না—কোন একটা স্তর থেকে ধর্মই ধর্মের পুরস্কাররূপে ধর্মপিপাসুর কাছে প্রতীয়মান হতে থাকে। অনুশাসনপর্বে ভীষ্ম একটি কথা বলেছেন যার মধ্যে এই ভাবটি সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত: "যাহারা ফল উপভোগের বাসনায় ধর্মানুষ্ঠান করে তাহাদিগকে ধর্মের বণিক কীর্তন করা যায়।"(৭৪) একইকালে তিনি বলেছেন, "একাকী ধর্মানুষ্ঠান করা কর্তব্য, ধর্মধ্বজী হওয়া কদাপি বিধেয় নহে।"(৭৫) (এই ভীষ্মের বাণীর মধ্যে কি যিশুখ্রীষ্টের "let not thy left hand know what thy right hand doeth" এই বাণীর প্রতিধ্বনি শুনতে পাই না?) অর্থাৎ কিনা ধর্মের জন্য যশাকাঙ্ক্ষা যা কর্ণ চেয়েছিলেন, শ্রীরামচন্দ্রও চেয়েচিলেন, তা উচ্চতর স্তরের ধর্মের ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিচ্যুত।

কিন্তু ধর্মের জন্যই ধর্মানুষ্ঠান করার মধ্যেও কি জীবনব্যাপী ব্যর্থতার বীজ থেকে যায় না? এই সূক্ষ্ম প্রশ্নটি তুলে যুধিষ্ঠিরকে ভর্ৎসনা করেছেন আর কেউ নন, স্বয়ং বৃকোদর ভীম। "যে ব্যক্তি কেবল ধর্মের নিমিত্তই ধর্মোপার্জন করে সে অশেষ ক্লেশভোগী হয়; যেমন অন্ধব্যক্তি সূর্যের প্রভা জানিতে পারে না তদ্রূপ সেই অপণ্ডিত ব্যক্তি ধর্মোপার্জনের প্রয়োজন বুঝিতে অসমর্থ হয়।"(৭৬) এখানেও কি যিশুর একটি প্রসিদ্ধ বাণীর প্রতিধ্বনি শুনি না?—"Whosoever shall seek to save his life shall lose it and whosoever shall lose his life shall preserve it."

ধর্ম যখন স্বনির্ভর হয়ে ওঠে, ধর্মের জন্যই যখন ধর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তখন তা কিয়ৎ-পরিমাণে ব্যক্তিনির্ভরও হয়ে উঠতে পারে। অর্থাৎ কোন একজন বিশেষ ব্যক্তি সংশয়কালে ধর্মনিরূপণ করতে নিজের উপরই নির্ভর করতে বাধ্য হতে পারে। যেহেতু সর্বজনসম্মত কোন কষ্টিপাথর সারা শাস্ত্র ঘেঁটেও পাওয়া গেল না। এবং এইভাবে একজন ব্যক্তির নিরূপিত ধর্ম অন্য ব্যক্তিদের কাছে সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য ঠেকতে পারে।

৬

এ প্রসঙ্গে আমাদের পৌরাণিক সাহিত্যের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ চমকপ্রদ কাহিনীর কথা আলোচনা করা যাক্। পুরাকালে সশরীরে স্বর্গে গমন করেছিলেন যে কয়জন ক্ষণজন্মা পুরুষ যুধিষ্ঠির তাঁদের অন্যতম এবং বোধ করি সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান। প্রশ্নটা হোল, কোন্ সোপান পথে তিনি মর্ত্য হতে স্বর্গে আরোহণ করতে সমর্থ হলেন? তিনি কোন বস্তুময় সোপান পথে স্বর্গে আরোহণ করেন নি। সুররাজ ইন্দ্র এসে তাঁকে তাঁর দিব্যরথে আরোহণ করিয়ে স্বর্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। একথা অবশ্য আমাদের জানা। কিন্তু আমাদের প্রশ্নটা বস্তুগত সোপান সম্পর্কিত নয়। ঘটনাটা ঘটেছিল এই রকম: "এইরূপে কিয়দ্দূর গমন করিলে দেবরাজ ইন্দ্র রথশব্দে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল নিনাদিত করিয়া, ধর্মরাজের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, "মহারাজ, তুমি অবিলম্বে এই রথে সমারূঢ় হইয়া স্বর্গারোহণ কর।" যুধিষ্ঠির প্রথমে "সুখসংবর্ধিতা পাঞ্চালী ও আমার পরম প্রিয় ভ্রাতৃ-গণ"কে ছেড়ে স্বর্গে যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। ইন্দ্র ওই কারণ গ্রাহ্য না করলে তিনি ওজর তুললেন, যে কুকুরটি তাঁকে অনুসরণ করে আসছিল তাকেও তাঁর সঙ্গে স্বর্গে প্রবেশ করতে দিতে হবে। ইন্দ্র অনেকক্ষণ অনেক তর্ক করেও তাঁকে রাজি করতে পারলেন না—যুধিষ্ঠিরের এক কথা: কুকুরকে সঙ্গে না নিতে দিলে তিনি স্বর্গে প্রবেশ করবেন না। "অতঃপর সেই কুকুর সাক্ষাৎ ধর্মরূপী হইয়া প্রীতমনে মধুরবাক্যে কহিলেন, বৎস! আমি

তোমাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত কুকুরবেশে তোমার সহিত আগমন করিয়াছিলাম। এক্ষণে বুঝিলাম, তুমি নিতান্ত ধর্মপরায়ণ ..।"(৭৭)

আমাদের প্রশ্নটা হল, যুধিষ্ঠিরকে ঠিক কী পরীক্ষায় ফেলা হল? যুধিষ্ঠির কুকুরটির খাতিরে স্বর্গে প্রবেশেও অস্বীকৃত হলেন কোন্ ধর্মের অনুশাসন মেনে? তিনি কারণ হিসেবে যা যা দেখিয়েছিলেন কোনটিই যুক্তিসিদ্ধ নয়। যেমন তিনি বলেছেন, "ভক্তজনকে পরিত্যাগ করলে ব্রহ্মহত্যাসদৃশ মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়।" কিন্তু কুকুরটি তো ভক্তজন ছিল না, তার সঙ্গ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করাটাকে পরিত্যাগ করা বলাও ঠিক নয়। "ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলে আমার নিতান্ত নৃশংস ব্যবহার করা হইবে" এই কথাটির সমর্থন করা যায় না। যুধিষ্ঠির যে কুকুরটির কোন সেবাযত্ন করেছিলেন তা তো নয়, যুধিষ্ঠিরের অনুপস্থিতেতে তার কোন ক্লেশ হওয়ারও সম্ভাবনা ছিল না। যুধিষ্ঠির অনৃশংসতা ধর্ম পালন করছিলেন বললে ঐ বিশেষ ধর্মটিকেই বড় লঘু করে দেখা হয়।

যুধিষ্ঠিরের এই অন্তিম মুহূর্তে অবলীলাক্রমে স্বর্গ হাতে পেয়েও ছেড়ে দিতে উদ্যত হওয়ার মধ্যে একটা মহত্ত্ব আছে যা আমাদের অভিভূত করে। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই দেখা যাবে, এতে যুধিষ্ঠিরের চূড়ান্ত ধর্মপরায়ণতার কোন প্রমাণ হয় না। যা প্রমাণ হয় তা এই যে তিনি ছিলেন একজন মানুষ। প্রতিপদে ধর্মের কথা স্মরণ করে তিনি পারেননি নিজের মনুষ্যত্বকে সম্পূর্ণ দমন করে রাখতে, যে মনুষ্যত্বের একটি লক্ষণই হল অন্ততঃ কিয়-দংশে unpredictable হওয়া। মানুষ যদি পুরোপুরিভাবে predictable হত, মানুষে যন্ত্রে তফাত থাকত না! সারাজীবন অক্ষরে অক্ষরে ধর্ম মেনে চলার চেষ্টা করে অন্তিম মুহূর্তে যুধিষ্ঠির এমন একটি কাণ্ড করে বসলেন যা তাঁর সারাজীবনে শেখা কোন ধর্মের ছকেই পড়ে না। আরও একটা জিনিস প্রমাণ হয়। মহাভারত খুব বৃহদংশেই একটি ধর্মগ্রন্থ বটে, কিন্তু তা কাব্যও। মহাভারতকার (তিনি কোন একজন ব্যক্তি বিশেষ তা বলা হচ্ছে না) কী অসীম ধৈর্যসহকারে হাজার হাজার শ্লোক ব্যবহার করে ধর্ম কী অধর্ম কী পাপ কী পুণ্য কী বুঝিয়েছেন: বিশেষ করে শান্তিপর্বে অনুশাসনপর্বে তো পাণ্ডব বা কৌরবদের সংক্রান্ত কিছু নেই বললেই চলে, আছে শুধু ধর্মোপদেশ, কিন্তু তবু মহাভারতকার শেষবিচারে কবিই। ধর্মোপদেশের উপর উপদেষ্টার যে সম্পূর্ণ দখল থাকে কবিতার উপর কবির তা থাকে না। কবি যা বলতে চান তাঁর কবিতা সবসময়ে সেই কথা বলে না। মহাভারতকার হয়তো চেয়েছিলেন যুধিষ্ঠিরকে সম্পূর্ণ ধর্মপরায়ণ দেখাতে: কিন্তু মাঝেমাঝেই যুধিষ্ঠির ধর্মের ক্ষুরস্য ধারা থেকে বিচ্যুত হয়েছেন এবং মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা শুরু করিয়ে দেওয়ার পর কবির সৃষ্ট যুধিষ্ঠির চরিত্র কবির হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল বলে মনে হয়। সেই কবির সৃষ্ট মনুষ্যচরিত্র এমন একটি মানবিক কাজ করে বসলেন যা না শিষ্টাচার না শীল, না সংস্কার না সনাতন ধর্ম। যদ্যপি তাকে সাধুবাদ না দিয়ে মহাভারতকারও পারেননি, স্বয়ং ধর্মও পারেননি, আমরাও পারি না।

উদ্ধৃতি-নির্দেশক

১। মৎস্যপুরাণ, অধ্যায় ২১২
২। শিবপুরাণ, অধ্যায় ৫৬
৩। শান্তিপর্ব, উত্তরার্ধ, অধ্যায় ৬০
৪। অনুশাসনপর্ব, অধ্যায় ১১১
৫। বনপর্ব, অধ্যায় ২৬০
৬। অনুশাসনপর্ব, অধ্যায় ৭৬
৭। উদ্যোগপর্ব, অধ্যায় ১৩
৮। দেবীভাগবত, ৯ম স্কন্ধ, অধ্যায় ১৮
৯। শান্তিপর্ব, পূর্বার্ধ, অধ্যায় ১৭৪
১০। আদিপর্ব, অধ্যায় ৯০
১১। বনপর্ব, অধ্যায় ১৮১
১২। বনপর্ব, অধ্যায় ২
১৩। উদ্যোগপর্ব, অধ্যায় ৩৪
১৪। বনপর্ব, অধ্যায় ৩১২
১৫। দ্রোণপর্ব, অধ্যায় ১৭
১৬। কর্ণপর্ব, অধ্যায় ৭০
১৭। অনুশাসনপর্ব, অধ্যায় ১৪১
১৮। অযোধ্যাকাণ্ড, সর্গ ৬১
১৯। দ্রোণপর্ব, অধ্যায় ১৯১
২০। আদিপর্ব, অধ্যায় ৮৭
২১। বনপর্ব, অধ্যায় ২৯ (কৃষ্ণের উক্তি)
২২। বনপর্ব, অধ্যায় ৩১১
২৩। বনপর্ব, অধ্যায় ২০৬
২৪। বনপর্ব, অধ্যায় ২৫৮
২৫। অনুশাসনপর্ব, ২য় ও ৫ম অধ্যায়
২৬। অশ্বমেধিকপর্ব, অধ্যায় ৩
২৭। সভাপর্ব, অধ্যায় ৬৯
২৮। বনপর্ব, অধ্যায় ২০৫
২৯। শান্তিপর্ব, পূর্বার্ধ, অধ্যায় ১০৯
৩০। শান্তিপর্ব, পূর্বার্ধ, অধ্যায় ৬২
৩১। সৌপ্তিকপর্ব, অধ্যায় ৫
৩২। কর্ণপর্ব, অধ্যায় ৭০
৩৩। আদিপর্ব, অধ্যায় ১৫৫
৩৪। কর্ণপর্ব, অধ্যায় ৯১
৩৫। আশ্রমবাসিকপর্ব, অধ্যায় ৩০
৩৬। অনুশাসনপর্ব, অধ্যায় ১৩
৩৭। দেবীভাগবত, ৭ম স্কন্ধ, অধ্যায় ২৫
৩৮। অনুশাসনপর্ব, অধ্যায় ৯৩
৩৯। মার্কণ্ডেয় পুরাণ, অধ্যায় ১২-১৩
৪০। শান্তিপর্ব, পূর্বার্ধ, অধ্যায় ১৬৫
৪১। শান্তিপর্ব, পূর্বার্ধ, অধ্যায় ৩৪
৪২। অযোধ্যাকাণ্ড, সর্গ ৭৯
৪৩। অনুশাসনপর্ব, অধ্যায় ১২৭
৪৪। অনুশাসনপর্ব, অধ্যায় ৭
৪৫। দেবীভাগবত, প্রথম স্কন্ধ, অধ্যায় ৫০
৪৬। শ্রীমদ্‌ভাগবত, ১ম স্কন্ধ, অধ্যায় ৮
৪৭। অনুশাসনপর্ব, অধ্যায় ১২২
৪৮। শান্তিপর্ব, পূর্বার্ধ, অধ্যায় ১৯
৪৯। আদিপর্ব, অধ্যায় ১৭০
৫০। শান্তিপর্ব, পূর্বার্ধ, অধ্যায় ১৬২
৫১। লিঙ্গপুরাণ, অধ্যায় ৭১
৫২। শান্তিপর্ব, উত্তরার্ধ, অধ্যায় ৬০-৬২
৫৩। উদ্যোগপর্ব, অধ্যায় ২৭
৫৪। অনুশাসনপর্ব, অধ্যায় ১৪৯
৫৫। আদিপর্ব, অধ্যায় ৪৫
৫৬। বনপর্ব, অধ্যায় ৩১২
৫৭। মৎস্যপুরাণ, অধ্যায় ১৮৬
৫৮। আদিপর্ব, অধ্যায় ৭৫
৫৯। অনুশাসনপর্ব, অধ্যায় ১৬৩
৬০। অশ্বমেধিকপর্ব, অধ্যায় ৯০
৬১। অশ্বমেধিকপর্ব, অধ্যায় ৫৪
৬২। অনুশাসনপর্ব, অধ্যায় ৯৬
৬৩। মার্কণ্ডেয় পুরাণ, অধ্যায় ১৫
৬৪। বনপর্ব, অধ্যায় ৯০
৬৫। অনুশাসনপর্ব, অধ্যায় ২৩
৬৬। যুদ্ধকাণ্ড, অধ্যায় ১৮
৬৭। অনুশাসনপর্ব, অধ্যায় ১৪২
৬৮। বনপর্ব, অধ্যায় ২৯
৬৯। আদিকাণ্ড, অধ্যায় ৩৩
৭০। অনুশাসনপর্ব, অধ্যায় ১১৩
৭১। মৎস্যপুরাণ, অধ্যায় ২১২
৭২। অনুশাসনপর্ব, অধ্যায় ১
৭৩। বনপর্ব, অধ্যায় ২৯১
৭৪। অনুশাসনপর্ব, অধ্যায় ১৬২
৭৫। অনুশাসনপর্ব, অধ্যায় ১৬০
৭৬। [illegible]
৭৭। মহাপ্রস্থানিকপর্ব অধ্যায় ৩

এই প্রবন্ধটি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে 'স্বর্গের সোপান' নামে চতুরঙ্গ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৮২ সালে।

তৃতীয় অধ্যায়
ক্ষত্রধর্ম ও পরম ধর্মের সংঘাত

পরমধর্ম ও বিভিন্ন বর্ণ লিঙ্গ বৃত্তি প্রভৃতির জন্য পৃথক পৃথক ধর্মের মধ্যে যে বিরোধের কথা ১ম অধ্যায়ে বলা হয়েছে সেই বিষয়টিকে এই অধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা হবে। আলোচনার জন্য আমরা কেবলমাত্র ক্ষত্রধর্ম ও পরমধর্মের মধ্যে বিরোধের উপর লক্ষ্যকে কেন্দ্রীভূত করব। ক্ষত্রধর্ম ও পরম ধর্মের মধ্যে সংঘাতই মহাভারতের কাহিনীর মূল সূত্রস্বরূপ। পরম ধর্মের নামে ক্ষত্রধর্মকে পদে পদে পাণ্ডবদের দিয়ে লঙ্ঘন করানো হয়েছে। এর থেকে যে শিক্ষা গ্রহণ করা যেতে পারে তা এই যে, ধর্মকে যেভাবে ক্ষত্রধর্ম, নারীধর্ম, গার্হস্থ্যধর্ম ইত্যাদি প্রকারে বিভিন্ন মানুষের সামাজিক অবস্থানের উপর নির্ভর করিয়ে খণ্ডবিখণ্ড করার প্রচেষ্টা প্রাচীন নীতিবাগীশেরা করেছিলেন তা সেই রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণের যুগেও সফল হয়নি। ধর্মের কাজ যদি হয় ব্যক্তি জীবনকে তথা কোন সমাজ-ব্যবস্থাকে ধারণ করে রাখা তো এই খণ্ডবিখণ্ডিত ধর্ম সামাজিক সংহতিকে ধারণ করে রাখতে পারে নি। এই বিফলতা সেই পুরাকালে নৈতিক চিন্তা ও আচরণে যেমন অন্তর্বিরোধের সৃষ্টি করেছিল, পরবর্তী কালের ভারতবাসীর মনে যে নৈতিক অন্তর্বিরোধ উত্তরোত্তর প্রকট হয়ে উঠেছিল তারও অন্যতম মূল ঐ একই কারণে নিহিত মনে করা যেতে পারে।

প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে প্রাচীন ভারতবর্ষীয় নৈতিক চিন্তার একটি বৈশিষ্ট্যই এই যে, ধর্ম বা আধুনিক ভাষায় যাকে নৈতিকতা বলা যেতে পারে তাকে কর্তাব্যক্তির সামাজিক অবস্থানের উপর নির্ভরশীল করা হয়েছিল। শুধু যে ক্ষত্রিয়দের জন্য ক্ষত্রধর্ম বা নারীর জন্য নারীধর্ম ছিল তাই নয়, প্রত্যেক বৃত্তির উপর নির্ভরশীল স্বতন্ত্র ধর্মের কথা চিন্তা করা হয়েছিল। রাজার জন্য যেমন ছিল রাজধর্ম, গণিকাদের জন্য ছিল গণিকাধর্ম এবং চোরের জন্যও ছিল তার নিজস্ব বৃত্তির উপযোগী ধর্ম। বেতালপঞ্চবিংশতির নবম উপাখ্যানের অন্তিমে বেতালের প্রশ্নের উত্তরে বিক্রমাদিত্য মলিম্লুচ নামক চোরকে কাহিনীর সব নায়ক-নায়িকাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভদ্র বলে রায় দেন। চোরের যে চুরি করাই ধর্ম সেই কারণে কোন কালিমাই ঐ চরিত্রের উপর লেপন করা হয় নি। তেমনি স্বর্গের গণিকা অপ্সরাদের দিয়ে তপস্যায় নিরত মুনিঋষিদের প্রলুব্ধ করায় জন্য কত কাজই করানো হয়েছিল। কিন্তু তার জন্য তাদের কোন অধর্ম হয় নি। সতীর ধর্ম এবং বারাঙ্গনার ধর্ম এক ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতায় কোন বারাঙ্গনা যখন বলে (প্রসঙ্গত, পুরাণে এই কাহিনীর কোন সমর্থন নেই), "নাহিক করম, লজ্জা শরম, জানিনে জনমে সতীর প্রথা, তা বলে নারীর নারীত্বটুকু ভুলে যাওয়া, সে কি কথার কথা।" তখন বারাঙ্গনার ধর্ম ও নারীদের মধ্যে একটা সংঘাতের কথা বলা হয়েছে। বারাঙ্গনার ধর্ম ও সতীর ধর্ম এই উভয়েরই উপরে স্থাপিত করা হয়েছে এক নারীধর্মের ধারণাকে। ঠিক তেমনি রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলিতে প্রতি পদেই দেখা যায় যে, এক দিকে যেমন বিভিন্ন মানুষের জন্য বিভিন্ন সামাজিক অবস্থান ও বৃত্তির উপর নির্ভরশীল বিভিন্ন ধর্মের কথা বলা হয়েছে, অপরদিকে একই কালে জাতি, বর্ণ, স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ নির্বিশেষে সব মানুষের

প্রতি প্রযোজ্য কোন এক পরম ধর্ম আছে এমন একটা চিন্তাও কিছুতেই তার অস্তিত্বকে ভুলে যেতে দেয়নি।

ঐ খণ্ডবিখণ্ডকৃত জাতি, বর্ণ, বৃত্তি, স্ত্রী, পুরুষ ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল বিভিন্ন-জনের প্রতি প্রযোজ্য বিভিন্ন ধর্মের ধারণা। এই ধারণাকে যুধিষ্ঠির ব্যাখ্যা করেছেন নিম্নলিখিতভাবে, "এইরূপ জগতে বিভিন্ন বর্ণসমূহের যে সকল নিজ নিজ লক্ষণ (চিহ্ন) [যেরূপ ব্রাহ্মণের পক্ষে অধ্যয়ন-অধ্যাপনাদি, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শৌর্যাদি এবং বৈশ্যের পক্ষে কৃষি-আদি] আছে, এইসকল লক্ষণ যেমন সেই সেই বর্ণের পক্ষে ধর্মস্বরূপ সেইরূপ আবার এই সকল লক্ষণ অন্য বর্ণের পক্ষে অধর্মস্বরূপ হয়।"(১) এক ব্যক্তির পক্ষে যা অধর্ম অপর ব্যক্তির পক্ষে তাই ধর্ম। এই তত্ত্বটি যে কি পরিমাণ গোলযোগের সৃষ্টি মহাভারতেই করেছিল তাই আমরা এই প্রবন্ধে দেখব। আপাতত এই ধর্মের ব্যাখ্যা হিসাবে কৃষ্ণের এই উক্তিটা নেওয়া যাক, "ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন, যজ্ঞ ও দান করিবেন এবং প্রধান প্রধান তীর্থসমূহে গমন করিবেন। তাঁহারা শিষ্যগণকে অধ্যয়ন করাইবেন, যজমানগণকে যজ্ঞ করাইবেন ও শাস্ত্রবিহিত প্রতিগ্রহ গ্রহণ করিবেন।…ক্ষত্রিয়গণ নিজ ধর্মানুসারে সাবধান থাকিয়া প্রজাগণকে রক্ষা করিবেন, যজ্ঞ করিবেন, সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিয়া বিবাহ করিবেন এবং পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে গৃহস্থাশ্রমে বাস করিবেন।"(২) এইজাতীয় ভূমিকা করে শ্রীকৃষ্ণ সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করেন, "যদি তুমি শান্তিভাব স্থাপিত রাখাকেই উত্তম বলিয়া মনে কর, তবে তুমিই বল—রাজারা যদি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে ধর্ম রক্ষিত হইবে, না তাঁহারা যুদ্ধ ত্যাগ করিলে ধর্ম রক্ষিত হইবে?"(৩)

অনুমান করা যেতে পারে যে, বর্ণ, বৃত্তি ও স্ত্রীপুরুষনির্ভর ধর্মের ধারণা প্রচারের পশ্চাতে মূল উদ্দেশ্য ছিল সমাজে এক বিশেষ বিন্যাস ও গঠনকে চিরস্থায়ী করে ধারণ করে রাখা। উন্নততর সার্বজনীন যে ধর্মের কথা বলছি, যাকে 'পরম ধর্ম' বা 'সনাতন ধর্ম' বলা যেতে পারে, তার ভিত্তিতে আছে এমন এক নৈতিক অন্বেষা যা অন্তত আপাতদৃষ্টিতে সমাজের কোন অংশের স্বল্পকালীন স্বার্থের পরিপোষক নয়। কিন্তু ঐ ধর্ম এমনই মানবিক গুণ ও বৃত্তির পরিপোষণ করত যা মানুষকে করে তোলে বশংবদ, নতি স্বীকারে অভ্যস্ত ও বিদ্রোহবিমুখ।

এই দুই ধরণের ধর্মচিন্তা অবশ্যই পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্দ্বের সম্পর্কে সম্পর্কিত। উদাহরণত যখন বলা হয় "স্ত্রীগণের ভর্তাই মাতা, পিতা, বন্ধু, সখা, মিত্র ও বান্ধব ইহাতে সন্দেহ নাই, তাহারা ভর্তার প্রেমে পুলকিতগাত্রা হইয়া যদি মহৎ পাপ করে, তাহা হইলেও পরম স্বর্গ লাভ করে, এর অন্যথায় নরকগামিনী হইবে।"(৪) তখন পরিষ্কারভাবেই সতী-ধর্মের সঙ্গে অন্য কোন পরম ধর্মের বিরোধ প্রকাশ পাচ্ছে, যে পরম ধর্ম অনুযায়ী 'মহৎ পাপের' কথা বলা হয়েছে।

এই দুই স্তরের এবং দুই ধরণের উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত ধর্মচিন্তাই মহাকাব্য ও পুরাণগুলির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। শাস্ত্রকারদের আদর্শ অবশ্য ছিল এমন ধর্মের প্রচার যা অন্তর্বিরোধশূন্য। উশীনর রাজাকে শ্যেনপক্ষী বলেছে, "যে ধর্ম ধর্মান্তরবিরোধী তাহা কখনও ধর্ম নহে, পরস্পর-অবিরোধী ধর্মই প্রকৃত ধর্ম…।"(৫) যুধিষ্ঠির যখন বলেন, "কুন্তীপত্রগণ সুখের কামনা করিয়াই সেই কর্ম করে, যে কর্ম ধর্মের বিপরীত হইবে না

এবং যাহা সকল লোকেরই হিতকর। আমরা ধর্মবৃদ্ধিকর সুখেরই আশা করি।"(৬) তখন তিনিও পরস্পর অবিরোধী ধর্মের কথাই বলেন। কিন্তু অবিরোধী ধর্ম যে সব সময়ে সম্ভব নয় তাও ঐ শ্যেনপক্ষীই বলে গেছে, "উভয় ধর্মের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহা লাঘব ও গৌরব বিবেচনাপূর্বক যাহাতে অধিকতর লাভের সম্ভাবনা তাহারই অনুসরণ করিবে।"(৭) কিন্তু গৌরবলাঘব বিচার অনেক সময়ে খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। প্রকাশ্য সভায় যখন দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করার চেষ্টা করা হয় তখনও মহাভারতের ধর্ম সম্পর্কিত সর্বপ্রধান প্রবক্তা ভীষ্ম দুঃশাসন ও দুর্যোধনের ঐ কার্যের নিন্দা করার যুক্তি খুঁজে না পেয়ে বলেছিলেন, "ধর্মের গতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম।" শুধু যে পরম ধর্ম অনুসারে ঐ কার্যটিকে নিন্দনীয় বলে নিরূপণ করতে ভীষ্ম অসমর্থ হয়েছিলেন তাই নয়, ক্ষত্রধর্ম অনুসারেও ঐ কার্যের বিচারে তিনি অপারগ হয়েছিলেন। কারণ, দ্রৌপদী খুব স্পষ্টভাবেই ক্ষত্রধর্মের দোহাই দিয়ে বলেছিলেন, "ভারতীয় ক্ষত্রিয়গণের ধর্ম ও ক্ষাত্রবৃত্তি উভয়ই নষ্ট হইয়াছে বুঝিতে হইবে।"(৮)

ভীষ্ম যে এই অবস্থাতেও ক্ষত্রধর্ম নিরূপণ করতে অক্ষম হয়েছিলেন তাইতেই প্রমাণ হয় যে, আপাতদৃষ্টিতে ক্ষত্রধর্ম যতটা সরল বলে মনে হয়, বাস্তবিকপক্ষে তা ততটা সরল ছিল না। ক্ষত্রধর্ম সম্বন্ধেও নানাপ্রকার পরস্পর বিরোধী বক্তব্য পাওয়া যায়। যেমন দুর্যোধন বলেছেন, "লোকনীতি হইতে রাজনীতি পৃথক—ইহা বৃহস্পতি বলিয়াছেন। সুতরাং রাজা অপ্রমত্ত হইয়া সর্বদা নিজ স্বার্থ চিন্তা করিবেন। হে মহারাজ! শত্রুকে জয় করাই হইল ক্ষত্রিয়ের সম্যক আদরণীয় বৃত্তি। তাহা ধর্মই হউক অথবা অধর্মই হউক—পরীক্ষা করিবার প্রয়োজন কি? গোপনেই হউক অথবা প্রকাশ্যেই হউক, যে উপায় শত্রুকে পীড়িত করে, তাহাই শাস্ত্রবিদ্‌গণের শস্ত্র; যাহার দ্বারা ছেদন করা হয়, তাহাই শস্ত্র নহে। রাজার পক্ষে ঐশ্বর্য (প্রভুত্ব) ও ধনে মমতা রাখা উচিত নয়; কারণ, পূর্বপ্রাপ্ত ঐ ধনকে ও প্রভুত্বকে হরণ করাই রাজধর্ম।"(৯) তেমনি ভীম বলেছেন, "ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ভিক্ষাচর্যা যেমন নিষিদ্ধ, তেমনই বৈশ্যের কার্য বাণিজ্য ও শূদ্রের কার্য সেবাও তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ; সুতরাং ক্ষত্রিয়ের বিশেষ ধর্ম হইতেছে বল ও উৎসাহ। ...রাজন্, আজ পর্যন্ত কোন রাজা কেবল ধর্মনিরত হইয়া রাজ্যলাভ করেন নাই বা পৃথিবীতে বিজয়লাভ করিতে পারেন নাই এবং অভ্যুদয় বা ঐশ্বর্যও লাভ করিতে পারেন নাই। যেমন শল্যক লোভী ক্ষুদ্র মৃগগণকে জিহ্বার লোভ দেখাইয়া আকর্ষণকরত কপটের দ্বারা তাহাকে গ্রহণ করে, তেমনই নীতিজ্ঞ রাজা শত্রুর উপর কূটনীতির প্রয়োগ করিয়া তাহার রাজ্য হরণ করেন।"(১০) কিন্তু ভীম ও দুর্যোধনের ধারণা অনুযায়ী ক্ষত্রধর্ম যদি এতই সরল হত তো যুদ্ধের ন্যায়-অন্যায় নিয়ে কৃষ্ণ, ব্যাসদেব ও ভীষ্মকে অত বাগ্‌বিস্তার করতে হত না। কিন্তু দেখা যায় যে, যুদ্ধ করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম—এই মৌলিক সূত্রটিও সর্বজনগৃহীত ছিল না। যখন সঞ্জয় বলেন, "যদি আপনাদিগকে রাজ্যের জন্য চিরস্থায়ী বিদ্বেষের কারণ যুদ্ধরূপ পাপকর্মই করিতে হয়, তবে এই অবস্থায় আমি বলিব যে, আপনারা বহু বর্ষ পর্যন্ত দুঃখময় বনবাসের কষ্টই ভোগ করুন। কারণ, সেই বনবাস আপনাদের পক্ষে ধর্মস্বরূপই হইবে।"(১১) তার জবাবে শ্রীকৃষ্ণ অবশ্য প্রশ্ন করেছিলেন, "রাজারা যদি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে ধর্ম রক্ষিত হইবে, না তাঁহারা যুদ্ধ ত্যাগ করিলে ধর্ম রক্ষিত হইবে?"(১২) অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধ করাটা-

কেই ধর্মসংগত বলে রায় দিয়েছিলেন, যেমন তিনি দিয়েছেন মহাভারতের আগাগোড়াই যে কারণে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সব দায়িত্বটুকুই গান্ধারী সঙ্গতভাবেই তাঁর উপর দিয়েছিলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির সঞ্জয়কে জবাব দিতে গিয়ে প্রথমেই বলেছিলেন, "যুদ্ধ করা অপেক্ষা যুদ্ধ না করা তো অধিক কল্যাণকর...যুদ্ধ না করিবার সুযোগ পাইয়া কোন্ ব্যক্তি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে চাহে ?...দেবতার অভিশাপরূপ এই যুদ্ধের পরিণাম জানিয়া কোন্ মানুষ ইহাকে বরণ করিতে ইচ্ছা করে ?"(১৩)

ক্ষত্রধর্ম অনুসারে কোনটা ন্যায় কোনটা অন্যায় তা সব সময়ে পরিষ্কার করে বলাও হয়নি এবং যখন হয়েছে তখন প্রায়শই তার যুক্তি অন্যবিধ ধর্মাশ্রয়ী মানুষের সাধারণ বুদ্ধির গম্য নয়। অভিমন্যুবধকে পাণ্ডবপক্ষ বহুবারই নিন্দা করেছেন কিন্তু ব্যূহ ভেদ করে যে রথী ব্যূহের অন্তবর্তী হয়েছে তাকে একাধিক রথী দ্বারা আক্রমণ করাটা ক্ষত্রধর্ম বিরোধী ছিল বলে কোথাও বলা হয়নি। অভিমন্যু যে বালক ছিল সে কথাটার উপরেই খুব জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অনেক রথী দ্বারা এক রথীকে আক্রমন করার ঘটনা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বহু বারই ঘটেছে, তাকে কোথাও অধর্ম বলে নিন্দা করা হয়নি। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে অভিমন্যুবধের পর বা পরবর্তী কোন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ কৌরবপক্ষের বিভিন্ন কুকীর্তির মধ্যে এই ঘটনাটির উল্লেখ করেন নি। মেঘনাদকে যে উপায়ে লক্ষ্মণ বিভীষণের সাহায্যে বধ করেছিলেন সেটা পরবর্তী কালে নিন্দিত হয়েছে কিন্তু রামায়ণের ভিতরে ঐ কারণে লক্ষ্মণের কোন নিন্দা করা হয় নি। মেঘনাদ যে মায়া অবলম্বন করে আকাশে অদৃশ্য থেকে যুদ্ধ করতেন তাকেও ধর্ম বিরুদ্ধ বলে কোথাও বর্ণনা করা হয়নি। কিন্তু বালীকে রাম যেভাবে বধ করেছিলেন তার চূড়ান্ত নিন্দা করা হয়েছে মৃত্যুমুখী বালীর মুখ দিয়ে। আত্মপক্ষ সমর্থন কবে রাম যা বলেছিলেন তা আর যাই হোক কোন ক্ষত্রধর্ম বা কোন পরম ধর্মেরই অনুগামী নয়। (রামচন্দ্র বলেছিলেন, সুগ্রীবের পত্নী রুমাতে উপগত হয়ে বালী যে পাপ করেছিলেন তার জন্য শাস্তি দিতে তিনি বাধ্য ছিলেন। কিন্তু বানরজাতির ধর্ম অনুসরণ করে বালীপত্নী তারা যখন সুগ্রীবকে পতিত্বে বরণ করেন তখন রামের ঐ সম্পূর্ণ অশাস্ত্রীয় ধর্মবোধকে তিনি শিকেয় তুলে রেখেছিলেন।) অর্জুন কর্তৃক কর্ণবধ, ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক দ্রোণবধ এবং শিখণ্ডীকে সামনে রেখে যেভাবে ভীষ্মকে পরাজিত করা হয় এদের প্রত্যেকটিতেই পাণ্ডবপক্ষে ক্ষত্রধর্ম লঙ্ঘন করা হয়েছিল এ বিষয়ে মহাভারতে কোন সন্দেহ রাখা হয়নি। দুর্যোধনকে যেভাবে ভগ্নজানু করা হয় তার দ্বারা যে ক্ষত্রধর্ম লঙ্ঘন করা হয়েছিল সে বিষয়ে তো সংশয়ের কোন স্থানই রাখা হয়নি। ঐ ঘটনার অব্যবহিত পরেই কৃষ্ণের চেয়ে অনেক বেশী সরল ও সত্যপরায়ণ বলরামকে দিয়ে এইভাবে ধিক্কার দেওয়া হয়েছে, "ভীমসেন! তোমায় ধিক্! ধিক্! অহো! এই ধর্মযুদ্ধে নাভির নিম্নে এই যে প্রহার হইয়াছে এবং যাহা ভীমসেন স্বয়ং করিয়াছে, ইহা গদাযুদ্ধে কখনও দেখা যায় নাই। নাভির নিম্নে আঘাত করা উচিত নয়। ইহাই গদাযুদ্ধ বিষয়ে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। কিন্তু এই শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য মূর্খ ভীমসেন এ স্থলে স্বেচ্ছাচার করিয়াছে।"(১৪) এইখানে একটি ব্যাপার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তা এই যে, শ্রীকৃষ্ণ, যিনি আগাগোড়াই সাদাকে কালো এবং কালোকে সাদা রূপে দেখানোর ব্যাপারে সুমহান দার্শনিক পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন, তিনিও ক্ষত্রধর্ম অনুযায়ী কোন জবাব দিতে পারেননি। তিনি বলেছিলেন, "এই দুর্যোধন অতিশয় দ্রুত অস্ত্র চালাইতে সমর্থ ছিল, অতএব ইহাকে কেহই পরাজিত করিতে পারিত না।(১৫)

এমন কি, স্বয়ং ভীমও গান্ধারীর সামনে একেবারে কেঁচো বনে গিয়ে "ভীতের ন্যায় তাঁহার বাক্যের উত্তর দান করিতে করিতে বলিলেন, মাতঃ! ইহা অধর্ম বা ধর্ম হউক, আমি দুর্যোধনের ভয়ে ভীত হইয়া প্রাণ রক্ষার জন্য সে স্থানে এরূপ কার্য করিয়াছি; অতএব আপনি আমার এই অপরাধ ক্ষমা করুন। আপনার সেই মহাবল পুত্র দুর্যোধনকে কেহ ধর্মানাকূল যুদ্ধের দ্বারা বধ করিবার সাহস করিতে পারে না; সেই জন্য আমি এই বিপরীত আচরণ করিয়াছি।"(১৬) ভীম কর্তৃক দুর্যোধনের উরুভঙ্গ যেমন হয়েছিল অবিসংবাদিতরূপে ক্ষত্রধর্মবিরোধী, ঠিক তেমনি অশ্বত্থামা যেভাবে রাত্রিকালে ঘুমন্ত পাণ্ডবদের শিবিরে প্রবেশ করে গণহত্যার অনুষ্ঠান করেছিল তাও যে ক্ষত্রধর্মবিরোধী হয়েছিল তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে বলা হয়েছে তার দুই সঙ্গী কৃপাচার্য ও কৃতবর্মার মুখ দিয়ে। অবশ্য অশ্বত্থামাও শাস্ত্রের সমর্থন খোঁজার চেষ্টায় বিরত থাকেননি। এই প্রসঙ্গে অশ্বত্থামার নিম্নলিখিত আত্মকথনটি প্রণিধানযোগ্য: "ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, যদি আমি ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করি, তবে আমাকে অবশ্যই প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হইবে...এ জগতে যে কার্য নিন্দনীয় বলিয়া মনে হইবে, যাহাকে সকল লোকে সর্বতোভাবে নিন্দা করিয়া থাকে, উহাও ক্ষত্রিয়ধর্ম অনুসারে আচরণকারী মানুষের পক্ষে কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।...শত্রুদের সৈন্যরা যদি অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে, বিদীর্ণ হইয়া যায়, ভোজন করিতে থাকে, কোথাও গমন করিয়া থাকে, অথবা কোন বিশেষ স্থানে প্রবেশ করিয়াও থাকে তথাপি তাহাদের উপর প্রহার করা উচিত।"(১৭) এবং এই সব যুক্তিকেই অশ্বত্থামা "ন্যায়দৃষ্টিসম্পন্ন, ধর্মচিন্তক ও তত্ত্বদর্শী পুরুষগণ"কর্তৃক প্রতিপালিত তত্ত্ব বলে গ্রহণ করেন। কিন্তু অশ্বত্থামার এই কার্য ও এই যুক্তি ক্ষত্রধর্মের যে বিভিন্ন ব্যাখ্যা মহাভারতে দেওয়া হয়েছে তাদের কোনটির সঙ্গেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

ক্ষত্রধর্মের মধ্যেই যে অস্পষ্টতা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল তাদের কথা ভুলে না গিয়েও এ কথা বলা যায় যে ঐ ধর্মের ধারণা অনুযায়ী পাণ্ডব ও কৌরব এই দুই পক্ষের মধ্যে প্রথম পক্ষই অধিকতর পরিমাণে অধর্ম করেছিলেন। এই বিষয়ে মতান্তরের সম্ভাবনা থাকতে পারে না। মহাভারতের ভিতরেই এই প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা করে দেওয়া হয়েছে। ভগ্ন-উরু দুর্যোধন কৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করে পুচ্ছছিন্ন সর্পের ন্যায় অর্ধদেহ উত্থিত করে "প্রাণান্তকর বেদনার কথা চিন্তা না করিয়া দুর্যোধন বাসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে এই প্রকার বাক্যদ্বারা পীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন, 'অরে কংস-দাসের পুত্র! আমি যে গদাযুদ্ধে অধর্মপূর্বক নিহতপ্রায় হইয়া ভূপাতিত হইয়াছি, এই কুকৃত্যের জন্য কি তোমার লজ্জা হইতেছে না? ভীমসেনকে আমার জঙ্ঘা বিদীর্ণ করিয়া দিবার জন্য যে মিথ্যা স্মরণ করাইতে করাইতে তুমি অর্জুনকে যাহা কিছু বলিয়াছিলে তাহা কি আমি জানিতে পারি নাই?...যিনি প্রতি দিন বীরবর যোদ্ধাগণের প্রচণ্ড ধ্বংসসাধন করিতেছিলেন, সেই পিতামহ ভীষ্মকে তুমি শিখণ্ডীকে অগ্রে রাখিয়া বিনাশ করাইয়াছিলে। ...অশ্বত্থামার নামের সদৃশ এক হস্তীকে নিহত করাইয়া তোমরা দ্রোণাচার্যকে অস্ত্রত্যাগ করাইয়াছিলে, ইহা কি আমি জানিতে পারি নাই?...বলবান ভূরিশ্রবার হস্ত ছিন্ন হইয়াছিল এবং সে আমরণ অনশনব্রত গ্রহণ করত উপবিষ্ট ছিল। এই অবস্থায় তোমারই দ্বারা প্রেরিত হইয়া মহাত্মা সাত্যকি তাঁহাকে বধ করিলেন। ...মনুষ্যগণের মধ্যে অগ্রগণ্য কর্ণ অর্জুনকে জয় করিবার ইচ্ছায় উত্তম পরাক্রম করিয়া যাইতেছিল, সেই সময়ে নাগরাজ অশ্বসেন যে কর্ণের বাণের সহিত অর্জুনকে বধ করিবার জন্য গমন করিতেছিল, তুমি স্বীয়

প্রযত্নে উহাকে বধ করিয়াছ। তারপর যখন কর্ণের রথের চক্র ভূবিবরে পতিত হইল এবং উহাকে তুলিবার জন্য ব্যগ্রতার সহিত কর্ণ চেষ্টা করিতেছিল, সেই সময়ে তাহাকে সঙ্কটাপন্ন ও পরাজিত জানিয়া তোমরা ভূপাতিত করিয়াছ।"(১৮) পাণ্ডব পক্ষের এই সব কুকীর্তির ফিরিস্তি দেওয়ার পর দুর্যোধন বলেন, "যদি আমার সহিত এবং কর্ণ, ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্যের সহিত সরলভাবে তোমরা যুদ্ধ করিতে তবে নিশ্চয় তোমাদের পক্ষে জয়লাভ হইত না।"(১৯) দুর্যোধনের এই অভিযোগগুলিকে সম্পূর্ণভাবেই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই মেনে নিয়েছিলেন। তিনি বলেন, "এই ভীষ্ম, দ্রোণাদি মহারথী বীরগণও অতিশয় পরাক্রমশালী ছিলেন। ইহাদিগকে ধর্মানুকূল সরলতাপূর্বক যুদ্ধের দ্বারা তোমরা পরাজিত করিতে পারিতে না। ...তোমাদের হিতকামী আমি বারংবার মায়া প্রয়োগ করত নানাবিধ উপায়ে যুদ্ধস্থলে ইঁহাদের সকলকে বিনাশ করিয়াছি।"(২০)

শ্রীকৃষ্ণ দুর্যোধনকে বলেছিলেন, "তুমি পাপপথে বিচরণ করিতেছিলে, সেই জন্য তুমি ভ্রাতা, পুত্র, বান্ধব, সেবক ও সুহৃদগণের সহিত নিহত হইয়াছ।"(২১) এবং তার পাপের নিদর্শন হিসাবে জতুগৃহদাহ, অভিমন্যুবধ, দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করে পাণ্ডবদের বনবাসে প্রেরণ, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ প্রভৃতির উল্লেখ করেন এবং বলেন, "তুমি যেসব কার্যকে আমার পক্ষ অনুচিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছ সে সমস্ত তোমার গুরুতর অপরাধের জন্যই করিতে হইয়াছে।"(২২) কিন্তু দুর্যোধন দাবি করেন, "তোমার ন্যায় একজন অনার্য ব্যক্তি কুটিল পথের আশ্রয় গ্রহণকরত স্বধর্ম পালনে আসক্ত আমাদের এবং অন্যান্য রাজাদের বিনাশ করাইয়াছে।"(২৩) এবং দর্পভরে বলেন, "আমি বিধিপূর্বক বেদাধ্যয়ন করিয়াছি, দান করিয়াছি, সমুদ্র সহ পৃথিবীকে শাসন করিয়াছি এবং শত্রুদের মস্তকের উপর অবস্থান করিয়াছি। আমার ন্যায় উত্তম অন্ত কাহার হইয়াছে?"(২৪)

দুর্যোধনের দাবি যে সাধারণভাবে মেনে নেওয়া হয়েছিল সে বিষয়েও প্রশ্ন থাকতে পারে না। কারণ, শ্রীকৃষ্ণের পাণ্ডবপক্ষ সমর্থনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে "গন্ধর্বগণ অত্যন্ত মনোহর বাদ্য বাজাইতে আরম্ভ করিলেন এবং অপ্সরাদল রাজা দুর্যোধনের সুযশ সম্বন্ধী গীত গান করিতে লাগিলেন...সিদ্ধগণ বলিয়া উঠিলেন—উত্তম, উত্তম। তারপর পবিত্র গন্ধযুক্ত, মনোহর, মৃদুল এবং সুখদায়ক বায়ু বহিতে লাগিল।"(২৫) শুধু গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ নয়, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও ভূরিশ্রবা অধর্মপূর্বক নিহত হইয়াছেন শুনিয়া সকলেই শোকে ব্যাকুল হইয়া খেদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।"(২৬)

যত দূর বোঝা যায় কৌরবপক্ষের কুকীর্তি বলে পাণ্ডবপক্ষ ও শ্রীকৃষ্ণ যাদের বারংবার নিন্দা করেছিলেন তাদের কোনটিই ক্ষত্রধর্মবিরোধী ছিল না। দুর্যোধনের যে উক্তি একটু আগেই উদ্ধৃত করেছি তার মধ্যে স্বধর্মপালনে আসক্ত কথাটি লক্ষ্যণীয়। জতুগৃহদাহের ক্ষত্রধর্মের সঙ্গে সংগতি বা অসংগতির কোন আলোচনা কোথাও পাওয়া যায় না। কিন্তু দ্রৌপদীকে প্রকাশ্য সভায় বিবস্ত্র করার চেষ্টা করে ক্ষত্রধর্মের বিরোধিতা করা হয়েছিল, এমন বিচার করতে ভীষ্ম এবং অন্যান্য কুরুবৃদ্ধরা অসমর্থ হয়েছিলেন। শকুনি দ্যূতক্রীড়ায় কপটতা গ্রহণ করে পাণ্ডবদের বনবাসে পাঠিয়েছিলেন এ কথা পাণ্ডবপক্ষে অনেকবার বলা হয়েছে। কিন্তু দ্যূতক্রীড়ায় কপটতা অবলম্বন করাটা ক্ষত্রধর্মবিরোধী ছিল কি না তা কোথাও বলা হয়নি। কপটতা করা হয়েছিল কিনা সে ব্যাপারেও সন্দেহ থেকে যায়। এই ব্যাপারে বলরামের বিচার পাণ্ডবদের বিপক্ষে যায়। তিনি বলেন, "আজমীঢ় বংশজাত কুরুবংশ-শ্রেষ্ঠ

যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় অভিজ্ঞ নন, সেই জন্য সুহৃদগণ ইহাকে নিষেধ করিয়াছিলেন, অপর-পক্ষে গান্ধার রাজপুত্র শকুনি পাশা খেলায় অত্যন্ত নিপুণ। ইহা জানিয়াও যুধিষ্ঠির তাহার সহিত পাশা খেলা আরম্ভ করে। সে কর্ণ ও দুর্যোধনকে বাদ দিয়া শকুনিকেই পাশা খেলিতে আহ্বান করিয়াছিল। সেই সভায় সহস্র সহস্র পাশা খেলায় অভিজ্ঞ পুরুষ ছিল, যুধিষ্ঠির যাহাদিগকে জয় করিতে সমর্থ হইত। কিন্তু ইনি তাহাদের সকলকে ছাড়িয়া সুবলপুত্র শকুনিকেই পাশা খেলায় আহ্বান করিলেন। ইহাতে শকুনি ইহাকে জয় করিয়াছেন। যখন ইনি পাশা খেলিতেছিলেন এবং প্রতিপক্ষের অক্ষচালনা যখন ইহার পক্ষে বার বার প্রতিকূল হইতে লাগিল, তখন ইনি ক্রোধবশে খেলিতে লাগিলেন। তখন ইনি হঠকারিতা-পূর্বক খেলিতে থাকিলে শকুনি ইহাকে জয় করিয়াছে। ইহাতে শকুনির কোন দোষ নাই।"(২৭) ক্ষত্রধর্মের ভিত্তিতে পাণ্ডবপক্ষকে সমর্থন করার বিশেষ কোন উপায় নেই। শ্রীকৃষ্ণ যখন দুর্যোধনকে তাঁর গুরুতর অপরাধের জন্য 'অনুচিত' কাজ করতে বাধ্য হয়েছিলেন বলে বলেন (উদ্ধৃতি ২২ পুনর্বার বিচার্য) তখন অনুচিত বলতে তিনি ক্ষত্রধর্মের কথা মনে করেছিলেন এবং দুর্যোধনের অপরাধ বলতে অন্য কোন পরম ধর্মের কথা মনে করেছিলেন। পাণ্ডবপক্ষ এবং কৌরব পক্ষের মধ্যে এই জাতীয় নৈতিক বিচারের সংঘাত এই এক জায়গায় মাত্র প্রকাশিত হয়নি। বস্তুতে আগাগোড়া সর্বত্রই এই সংঘাত লক্ষণীয়। এবং কে যে কোন সময়ে কোন ধর্মের কথা বলছেন তাও সব সময়ে স্পষ্ট নয় এবং এই কারণে বিভ্রান্তির সৃষ্টিও কিছু কম হয়নি। যেমন—গান্ধারী যখন বলতেন 'যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ' তখন তিনি কোন্ ধর্মের কথা মনে রেখে এই কথা বলতেন ? তিনি যদি ক্ষত্রধর্মের কথা না মনে করে অন্য কোন পরম ধর্মের কথা মনে করে এই কথা বলে থাকতেন তো কৌরবপক্ষ বিনাশের জন্য কৃষ্ণকে দায়ী করে তিনি কেন তাঁকে অভিশাপ দিলেন ? তিনি কেন কৃষ্ণের কথা মেনে নিলেন না যে, (পরম) ধর্মের জন্যই পাণ্ডবপক্ষ ক্ষত্রধর্মকে লঙ্ঘন করতে বাধ্য হয়েছিল ? মহাভারতের মধ্যে যে কয়টি চরিত্রকে নিষ্কলঙ্ক এবং গরিমামণ্ডিত করে চিত্রিত করা হয়েছে গান্ধারী তাঁদের মধ্যে একজন। ধর্মের জয় হয়েছে (পরম ধর্ম অর্থে) এই কথা জেনে তিনি কেন সান্ত্বনা পেলেন না ? তিনি কেন ভীমকে দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গ করার জন্য এবং দুঃশাসনের রক্ত পান করার জন্য তিরস্কার করেছিলেন ?

সঞ্জয় যে যুক্তি দিয়েছিলেন তা অবশ্যই পরম ধর্মভিত্তিক। কিন্তু তার জবাবে কৃষ্ণ যা বলেছিলেন তা ক্ষত্রধর্মভিত্তিক (উদ্ধৃতি ১২ পুনর্বার বিচার্য)। এবং সঞ্জয়কে যুধিষ্ঠির যে উত্তর দিয়েছিলেন তাতে বক্তব্য ছিল এইটুকুই যে, ক্ষত্রধর্ম অনুসারে যুদ্ধ করতে তিনি বাধ্য হচ্ছিলেন। অর্থাৎ কৌরবপক্ষ যখন ক্ষত্রধর্মের ভিত্তিতে পাণ্ডবদের নিন্দা করেন তখন পাণ্ডবপক্ষ পরম ধর্মের দোহাই দিচ্ছিলেন, কিন্তু পরম ধর্মের দোহাই দিয়ে যখন কেউ তাঁদের যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেন, যেমন সঞ্জয় দিয়েছিলেন, অথবা নিরপেক্ষ থাকার সিদ্ধান্ত নেন, যেমন বলরাম নিয়েছিলেন তখন পাণ্ডবপক্ষ ক্ষত্রধর্মের দোহাই তোলেন। এটা বোধ হয় ততটা অসততার পরিচায়ক নয় যতটা বিভ্রান্তির।

২

ক্ষত্রধর্মের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং ক্ষত্রধর্ম ও পরমধর্মের মধ্যে দ্বন্দ্বকেই মহাভারতের আখ্যানের মূল সূত্র বলে প্রবন্ধের গোড়াতেই আমি বলেছি। কিন্তু মহাভারতের চরিত্রেরা

এই দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন বলে মনে হয় না। মহাভারতের যিনি রচয়িতা (তিনি কোন একজন বিশেষ ব্যক্তি বলে মনে করছি না) তিনিও এই দ্বন্দ্বের ব্যাপারে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন বলে মনে করা যায় না। তার ফলে ক্ষত্রধর্ম ও পরমধর্মের মধ্যে সংগতির সম্ভাবনার উপর পরস্পরবিরোধী নানান উক্তি পাওয়া যায়। এর আগেই উল্লেখ করেছি (উদ্ধৃতি ৬ পুনরায় দ্রষ্টব্য) যে, যুধিষ্ঠির অন্তর্দ্বন্দ্ববিহীন ধর্মে আস্থাশীল ছিলেন। উশীনরকে উক্ত শ্যেনপক্ষীর বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করে তিনি বলেন, "কোন স্থলে অধর্মই ধর্মের রূপ ধারণ করে, আবার কোন স্থলে পরিপূর্ণ ধর্মকেই অধর্মরূপে দেখা যায়। আবার কোন স্থলে ধর্ম নিজ প্রকৃত স্বরূপেই অবস্থান করেন। বিদ্বান পুরুষ নিজ বুদ্ধি দ্বারা তাহা বিচার করিয়া ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ দর্শন করেন এবং বুঝিয়া থাকেন।"(২৮) ধর্ম অনুসরণকারী ব্যক্তি যে পুরস্কৃত হন এই কথা প্রতিপন্ন করতে শ্রীকৃষ্ণ বলেন, "ইন্দ্র সুখ ও মনের প্রিয় বস্তুসমূহ ত্যাগ করিয়া সৎকর্মের প্রভাবেই দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছেন। তিনি সাবধানে থাকিয়া সত্য, ধর্ম, ইন্দ্রিয়সংযম, সহিষ্ণুতা, সমদর্শিতা এবং সকলেরই প্রিয় ব্যবহার পালন করেন। এই সমস্ত সদ্‌গুণাবলীর সেবনের কারণেই ইন্দ্র মুখ্য দেবরাজ্য লাভ করিয়াছেন।"(২৯) ধর্ম পরায়ণ ব্যক্তি পুরস্কৃত হন (ইন্দ্রত্ব যে-জাতীয় পুরস্কার তার কথাই বলছি), এই তত্ত্বটি কোন দেশের কোন ধর্মীয় চিন্তাতেই খুব উচ্চস্তরের আলোচনায় স্বীকৃতি লাভ করেনি। বিশেষ করে শচীপতি ইন্দ্রকে পৌরাণিক সাহিত্যে কোথাও "সত্য, ধর্ম, ইন্দ্রিয়সংযম, সহিষ্ণুতা, সমদর্শিতা" প্রভৃতি গুণের ছোঁয়াটুকু দিয়েও বর্ণনা করা হয়নি। সেই কারণে কৃষ্ণের এই উক্তিটিকে সম্পূর্ণভাবেই অন্তঃসারশূন্য বলে মনে হতে বাধ্য। অপর দিকে ধর্ম অনুসরণ করে যে প্রায় সময়ে ঠকতে হয় সেই সংশয়ও অনেক জায়গাতেই প্রকাশ করা হয়েছে। সঞ্জয় যখন বলেন, "অজ্ঞান কিংবা পাপী মনুষ্যও যুদ্ধ করিয়া সম্পত্তি লাভ করে, আবার বুদ্ধিমান বা ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিও দৈব বাধার ফলে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ঐশ্বর্য হইতে বঞ্চিত হন" (৩০) তখন তিনি এই কারণে ধর্ম থেকে বিচ্যুত হওয়ার সমর্থন করছিলেন না—তিনি অতিশয় উচ্চ স্তরের মানসিকতা থেকে ধর্মই ধর্মের পুরস্কার, অন্য কোন পুরস্কারের লোভে ধর্ম অনুসরণ করার বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখছিলেন। ভীষ্মের নিম্নলিখিত উক্তিটি সঞ্জয়ের এই দৃষ্টিভঙ্গীর সমরূপ: "যাহারা ফল উপভোগের বাসনায় ধর্মানুষ্ঠান করে তাহাদিগকে ধর্মের বণিক কীর্তন করা যায়।"(৩১)

ধর্ম নিয়ে এই যে বিভিন্নরকমের ধারণা, এই যে ক্ষত্রধর্মের মধ্যেই অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং ক্ষত্রধর্ম ও পরম ধর্মের মধ্যে দ্বন্দ্ব তা আধুনিক সাহিত্যের পক্ষে উপযোগী অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক উপাদান বলে মনে করা যেতে পারত। বিংশ শতাব্দীর existentialist কোন সাহিত্যিক এরকম উপাদান পেলে জমজমাট উপন্যাস ফাঁদতে পারতেন। একজনের কাছে যা ধর্ম আরেকজনের কাছে তাই অধর্ম, ধর্ম কী তাই নিয়ে নানা মুনি নানা মত দিয়েই যাচ্ছেন, স্বয়ং ভগবান ভূমিতে অবতীর্ণ হয়ে একের পর এক অধর্ম করেই যাচ্ছেন, কোন শেষ কথা বলাই যাবে না। "শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে"—এমন একটা বিষয় পেয়ে আধুনিক ইউরোপীয় কোন উপন্যাসকারের জিভ দিয়ে জল গড়াচ্ছে কল্পনা করতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু মহাভারত তো বিংশ শতাব্দীর কোন উপন্যাস নয়। সুতরাং ধর্মের বিরোধের নিরসন না করে কাহিনী শেষ করা মহাভারত রচয়িতার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই নিরসন করা হয়েছে মহাভারতের একেবারে অন্তিমে, স্বর্গারোহণপর্বে। ক্ষত্রধর্ম ও পরম ধর্মের মধ্যে আগাগোড়া দোদুল্যমান

অবস্থায় কাটিয়ে দেওয়ার পর মহাভারত-কারকে একটি সিদ্ধান্ত নিতেই হয়। এবং সেই সিদ্ধান্ত যায় ক্ষত্রধর্মের পক্ষে। এই অন্তিম বিচারকে স্বার্থহীনভাবে প্রকাশ করা হয়েছে নিম্নলিখিতভাবে: "স্বর্গলোকে উপস্থিত হইয়া ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির দেখিলেন—দুর্যোধন এক অনির্বচনীয় স্বর্গীয় শোভায় বিরাজমান এবং সূর্যের ন্যায় তাঁহার উজ্জ্বল মূর্তি। মহাতেজা দেবতাগণ ও পুণ্যকর্মা সাধ্যগণের সহিত এক দিব্য সিংহাসনে দুর্যোধন বীরশোভা সমন্বিত অবস্থায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন।"(৩২) মহাভারতের ভিতর ধর্ম বিষয়ক অন্তর্দ্বন্দ্ব যে কতটা প্রবল তার এক পরিমাপ পাওয়া যায় এই ঘটনায় যে, যুধিষ্ঠির, যাঁকে কিনা আগাগোড়াই ধর্মপুত্র বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং যাঁর ধর্মজ্ঞানকে পরাকাষ্ঠা বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, তিনিও এই দৃশ্য দেখে একেবারেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। এবং বলে ওঠেন, "যাহার ধর্ম সম্বন্ধে কোন ধারণাই নাই, যে আজীবন ভূমণ্ডলে সমস্ত লোকের উপর অপকার করিয়াছে, সেই পাপাত্মা দুর্যোধন যদি সনাতন বীরলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে যাঁহারা বীর, মহাত্মা, মহাব্রত, সত্যপ্রতিজ্ঞ এবং পৃথিবীখ্যাত বীর, সেই সত্যবাদী আমার ভ্রাতৃগণ এই সময়ে কোন্ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন?"(৩৩) কিন্তু মহাভারত-কার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন. সপ্তদশ পর্বের প্রায় এক লক্ষ শ্লোকে দোদুল্যমান অবস্থা বজায় রাখা গিয়েছিল, কিন্তু এখন অন্তিম পর্বে ক্ষত্রধর্মকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতেই হয়। তা নয় তো যে বর্ণ-ভিত্তিক ধর্মকে সমাজ-ব্যবস্থার ভিত্তিতে প্রোথিত করা হয়েছে তাকেই উৎপাটন করে ফেলা হয়। সুতরাং ক্ষুব্ধ যুধিষ্ঠিরকে নারদ প্রবোধ দিয়ে বলেন, "যে রাজা মহাভয় উপস্থিত হইলেও ভীত হয় নাই, এই সেই পৃথিবীপতি দুর্যোধন ক্ষত্রিয়ধর্মের গুণে এই স্থান লাভ করিয়াছে। যাঁহারা চিরকাল স্বর্গে বাস করিতেছেন, সেই সাধুপ্রকৃতি রাজারা দেবতা-গণের সহিত মিলিত হইয়া এই রাজা দুর্যোধনকে সম্মানিত করিতেছেন।"(৩৪)

ক্ষত্রধর্মকে এইভাবে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হল বটে; কিন্তু দ্বন্দ্বের সত্যিই কোন নিরসন করা হল না, জোর করে ক্ষত্রধর্মকে পরম ধর্মের উপর চাপিয়ে রাখা হল। ক্ষত্রধর্মকে নিকৃষ্ট প্রতিপন্ন করে পরম ধর্মকে যদি উৎকৃষ্ট বলে মহাভারতের অন্তিম পর্বে স্বীকার করে নেওয়া হত তা হলে ধর্মপুস্তক হিসাবে মহাভারত সংগতিপূর্ণ হত। কিন্তু যেভাবে এই অন্তিম পর্ব লেখা হল তাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আগাগোড়া যে যুক্তি দিয়ে এসেছিলেন তাকে নস্যাৎ করে দেওয়া হল। এর ফল হিসাবে ধর্মের ধারণার মধ্যেই এক ধ্বংসকারী দ্বন্দ্বের বীজ চিরকালের জন্য প্রোথিত করা হল, যে কারণে আধুনিক কাল পর্যন্ত ভারতবাসীর মনে ধর্মচিন্তা সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। ক্ষতি হয়েছে দুই ধরণের। এক হয়েছে প্রচণ্ড বিভ্রান্তির সৃষ্টি। রামায়ণে মহাভারতে, পুরাণে এবং অন্য সর্বত্রই বলা হয়েছে যে, পাপ করলে নরকে যেতে হয় আর পুণ্যবান স্বর্গলাভ করে। যে দুর্যোধনকে স্বর্গে পরম গৌরবে সিংহাসনে সমারূঢ় অবস্থায় দেখানো হল তার সম্বন্ধে যুধিষ্ঠির কোন জায়গায় বলেছেন, "অপরের মান নষ্ট করিয়া নিজের মানলিপ্সু, ঈর্ষাপরায়ণ, ক্রোধী, অর্থনীতি ও ধর্ম উল্লঙ্ঘনকারী, কটুভাষী, ক্রোধ ও দীনতার বশবর্তী, কামাত্মা, পাপিগণ প্রশংসিত, শিক্ষা প্রদান করিতে অযোগ্য, ভাগ্যহীন, অতিশয় ক্রোধী, মিত্রদ্রোহী এবং পাপবুদ্ধি··· ।"(৩৫) এবং অন্যত্র দুর্যোধনকে এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, "দুরাত্মা, ঈর্ষাপরায়ণ, অতিশয় অভিমানী, দুষ্কর্মকারী, নিষ্ঠুর, শত্রুতার প্রতিমূর্তি এবং বৃদ্ধ জ্ঞানীপুরুষগণের আদেশ অমান্যকারী...।"(৩৬) মহাভারতের সব পাঠকই

জানেন যে, শুধু এই দুই জায়গায় নয়, আগাগোড়াই, সর্বত্রই পাণ্ডবপক্ষ থেকে দুর্যোধনকে এইভাবেই বর্ণনা করা হয়েছে। এইভাবে যাকে পাপী বলে নিন্দা করা হচ্ছে তাকেই আবার পুণ্যবানের স্বর্গে অধিষ্ঠিত করে পাপপুণ্যের ধারণাকে যে পরিমাণে কাদাঘোলা করা হল তার চেয়ে অধিক বিভ্রান্তি সৃষ্টির কথা ভাবাই যায় না। দ্বিতীয় যে ক্ষতি হয়েছে তা এই। বিভ্রান্তি ভেদ করে যেটুকু একটি স্পষ্ট নীতি হিসাবে বেরিয়ে আসে, যে নীতিকে কৃষ্ণের মুখ দিয়ে প্রচার করা হয়েছে, তা হল "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" এবং ইংরেজিতে যাকে বলে হয়েছে "end justifying means"। পাণ্ডবদের পক্ষে ধর্ম (পরম ধর্ম অর্থে), অতএব পাণ্ডবদের জয়ী হতে হবে এবং তা যখন ক্ষত্রধর্ম অনুসারে সম্ভব নয়, সেই ধর্মকে লঙ্ঘন করেই ঐ জয় করাতে হবে—শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম সম্পর্কিত সমগ্র বাণীর সারাৎসার বলতে শুধু এইটুকু। সমকালীন ইতিহাস সব সময়েই জয়ী পক্ষের দৃষ্টিকোণ দিয়ে লেখা হয়ে থাকে। রামায়ণে রাম জয়ী এবং মহাভারতে পাণ্ডবপক্ষ জয়ী; সুতরাং রামায়ণ ও মহাভারতে যে রঘুবংশ ও পাণ্ডুবংশের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শিত হবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এই দুইটি গ্রন্থ যদি শুধুমাত্র উপন্যাস হত তো, তাতে এই পক্ষপাতের কারণে রসভঙ্গ কিছুই ঘটতো না। আগাগোড়া যে দুর্যোধনকে পাপাশয় বলে বর্ণনা করা হল তাকে অন্তিম অধ্যায়ে স্বর্গের সিংহাসনে বসিয়ে দেখানোটা বেশ একটা 'absurd drama' জাতীয় জিনিস হত। কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারত যে ধর্মগ্রন্থ। এই ধর্মগ্রন্থে, বিশেষ করে মহাভারতে, যে ধর্মের দ্বন্দ্বকে জোড়াতালি দিয়ে রেখে দেওয়া হল তার দরুন কুফল কি প্রকারের হয়েছে তা ব্যাখ্যা করে না বলে আমি একটি উদাহরণ দিয়ে আমার বক্তব্যটি রাখব।

৩

আধুনিক কালের ভারতবাসীর চোখে ঐতিহাসিক যুগে হিন্দু যোদ্ধাদের মধ্যে যাঁরা বীরত্বের আদর্শে পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গেছেন তাঁদের মধ্যে রাজপুতরা অন্যতম। রাজপুতদের বীরত্বের অজস্র কাহিনী স্থানীয় লোকসাহিত্যে অমর হয়ে আছে। সেই সাহিত্যকে ভিত্তি করে কর্ণেল টড লিখে গিয়েছিলেন তাঁর প্রসিদ্ধ ইতিবৃত্ত। এবং টডের ঐ প্রসিদ্ধ গ্রন্থকে আশ্রয় করে বাঙালী পাঠকের জন্য সরল ঝরঝরে বাংলায় গল্প লিখে গিয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। টড কর্তৃক সংগৃহীত এবং অবনীন্দ্রনাথ কর্তৃক পুনর্লিখিত রাজপুত বীরত্বের কাহিনীগুলি পড়ে যে চূড়ান্ত বিস্ময় হওয়া অনিবার্য বলে মনে হয় সেই বিস্ময়কে কিন্তু কোন আলোচনায় প্রকাশ পেতে দেখিনি। বিস্ময় এই কারণে যে, রাজপুত বীরগণও ক্ষত্রিয় বলে নিজেদের মনে করতেন, তাঁরাও ক্ষত্রধর্মে বিশ্বাস করতেন এবং রামায়ণ-মহাভারতের বীরদের উদাহরণ থেকেই নাকি তাঁরা অনুপ্রেরণা গ্রহণ করতেন। কিন্তু রামায়ণ-মহাভারতের বীরদের এবং এই রাজপুত বীরদের মধ্যে কি আকাশ-পাতাল তফাত! রামায়ণ ও মহাভারতের নায়কেরা ধর্ম কি, অধর্ম কি, ন্যায় যুদ্ধ হল, না অন্যায় যুদ্ধ হল—এই সংশয় ও প্রশ্নের দ্বারা কণ্টকিত পথে হোঁচট খেতে খেতে, বারবার থমকে দাঁড়িয়ে, বারবার পিছে তাকিয়ে পথ চলেছেন। তাঁদের কাছে ধর্মের পথ ছিল ক্ষুরস্য ধারার মতই দুর্গম। কিন্তু রাজপুত বীরদের কি এইরকম কোন দ্বন্দ্ব, প্রশ্ন, সংশয়ের দ্বারা বিধ্বস্ত হতে দেখা গেছে? তাঁদের পথে কোন সংকীর্ণতাই ছিল না, বন্ধুরতাও ছিল না। আরব বেদু-

ইনের মত তাঁরা যে দিকে ইচ্ছে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছেন, কোন দিকেই তাঁদের কোন বাধা ছিল না, কোন প্রকার ধর্মবোধই তাঁদের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করেনি। বিশ্বাসঘাতকতার জন্য বিভীষণ চিরদিন নিন্দিত হয়ে এলেন। বিষ্ণু-অবতার রাম এবং মহাকবি বাল্মীকি কেউই পারলেন না তাঁকে জাতে তুলতে। কর্ণকে অর্জুন যেভাবে বধ করেছিলেন, ভীম যেভাবে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করেছিলেন, সেই কলঙ্ক মহাভারতে কলঙ্কই থেকে গেল, ব্যাস-দেবও পারলেন না, শ্রীকৃষ্ণও পারলেন না শতধৌত দ্বারাও সেই অঙ্গারের কালিমা দূর করতে। কিন্তু রাজপুতদের যুগে বিশ্বাসঘাতকতা তো প্রায় নিয়মেই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কর্ণবধ-দুর্যোধনবধের চেয়ে অনেক অনেক সাংঘাতিক রকমের গর্হিত (মহাভারতের যুগের ক্ষত্রধর্ম অনুসারে) কাজ করে যেতে রাজপুতদের এতটুকুও অসুবিধা হত না। বিস্ময় শুধু এই কারণেই নয় যে, সেই বীররা এত দূর পর্যন্ত ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন হতে পেরেছিলেন। এও অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ যে, এই বিশ্বাসঘাতকতা, নৃশংসতা, ক্রূরতা এবং ধর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীনতা যাঁদের চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য তাঁদের ইতিবৃত্ত সরস বাংলায় বর্ণনা করার সময়ে অবনীন্দ্রনাথের যে কিছুমাত্র অস্বস্তিবোধ হয়েছিল তারও এতটুকু আভাস পাওয়া যায় না। উদাহরণ হিসাবে একটিমাত্র আখ্যান নেওয়া যাক। রায়মলের তিন পুত্র সঙ্গ, পৃথ্বীরাজ, জয়মল এবং রায়মলের ছোট ভাই সুরজমল—এই চারজনকে নিয়ে যে আখ্যানটি অবনীন্দ্র-নাথ রমণীয় ভাষায় বর্ণনা করেন তার মধ্যে এই ক্ষত্রিয় বীরদের আচরণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি পাই।

সিংহাসন কে পাবে এই নিয়ে ঝগড়া। যেভাবে কুরু পাণ্ডবেরা সভাপর্ব, বনপর্ব, উদ্যোগপর্বের মধ্য দিয়ে ধর্মাধর্মের প্রশ্নের একের পর এক সম্মুখীন হয়ে ও তাদের মীমাংসার চেষ্টা করে ঝগড়া করেছিলেন সেভাবে এই ঝগড়া হয় না। হয় এইভাবে—"তাহলে সিংহাসন কার এখানেই স্থির হয়ে যাক আজই!" বলেই পৃথ্বীরাজ তলোয়ার খুলে সঙ্গকে আক্রমণ করলেন। সঙ্গ ছুটে গুহার বাইরে যাবেন, তলোয়ারের চোট পড়ল তাঁর একটি চোখের উপরে। চারণীদেবের সামনে ভায়ের হাতে ভায়ের রক্তপাত ঘটল! সঙ্গ প্রাণভয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এক দিকে গেলেন সুরজমল, পৃথ্বীরাজ, জয়মল গেলেন আর এক দিকে—এঁর পেছনে উনি, তাঁর পিছনে তিনি; অন্ধকার ঢেকে নিলে চারজনকেই।"(৩৭)

এই চারজনের একজন জয়মলের কীর্তি নিম্নলিখিত প্রকার: জয়মল টোডা রাজ্য উদ্ধার করে দেবেন বলে প্রতিজ্ঞাপত্র লিখে শূরতানের কাছে ঘটক পাঠালেন। শূরতান সিং জয়মলকে খুব খাতির করে নিজের বাড়িতে স্থান দিলেন। কিন্তু দিনের পর দিন যায়, মাসের পর মাস, জয়মল পাঠানদের সঙ্গে লড়তে যাবার নামও করে না; উলটে বরং হঠাৎ রাতারাতি শূরতানকে মেরে তারাবাইকে বন্দী করে নিয়ে পালাবার মতলবে রইলেন। শেষে অন্ধকার রাতে একদিন জয়মল হাতিয়ার হাতে চুপিচুপি শূরতানের অন্দর-মহলের দিকে অগ্রসর হলেন—ভূতের মতো মুখে কালিঝুলি মেখে। বেশী দূর যেতে হল না, অন্দরের দরজাতেই ধরা পড়ে গেলেন।"

তারপর পৃথ্বীরাজ কিভাবে সুলতানের হাত থেকে টোডা রাজ্য উদ্ধার করে দিলেন? "স্বয়ং সুলতান জুম্মা মসজিদের ছাদে উঠে তামাশা দেখছেন, এমন সময়ে মস্ত একটা তাজিয়ার সঙ্গে হাসান-হোসেন করতে করতে একদল লোক ঠিক সুলতান যেখানে রয়েছেন সেখানে

গিয়ে থামল। সুলতান ঝরকা থেকে মুখ ঝুঁকিয়ে দেখলেন ছ'জন ফকির সেই তাজিয়ার সঙ্গে! আর বেশি কিছু সুলতানকে দেখতে হল না; ভিড়ের মধ্যে থেকে একটা তীর এসে সুলতানের বুকের মাঝ থেকে প্রাণটি শুষে নিয়ে সোঁ করে বেরিয়ে গেল—আকাশের দিকে! টোডার সুলতান উলটে পড়লেন, সঙ্গে সঙ্গে রাজপুত ফৌজ এসে শহরে হানা দিলে।" এইরকম বীরত্বকে ধর্মসঙ্গত বলে দেখাতে শ্রীকৃষ্ণও পারতেন না। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথকে এতটুকুও থমকে দাঁড়াতে হল না। তাঁর ভাষায়—"এইবার বাপের প্রাণ গলল। পৃথ্বীরাজ ছেলের মতো ছেলে।" এই ছেলের মতো ছেলের আরেক বীরত্বের কাহিনী এই প্রকার: "মাঠের মাঝে দুই দলের তাঁবু পড়েছে। যুদ্ধের আগের রাতে মালোয়ারাজ নিজের শিবিরে মখমলের গদিতে তাকিয়া ঠেস দিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে মহাধুমধামে নাচ দেখছেন, এমন সময়ে ঝড়ের মতো পৃথ্বীরাজ এসে রাজাকে একেবারে ধরাধরি করে তুলে নিয়ে নিজের কোটে এনে বন্ধ করলেন।"

এই তো গেল জয়মল ও পৃথ্বীরাজের বীরত্ব। এবার দেখা যাক সুরজমল কি ধরনের ক্ষত্রিয় ছিলেন। "রানার আত্মীয় সারংদেব আর সুরজমল দুজনে মিলে হঠাৎ বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন।" পৃথ্বীরাজ যুদ্ধে বিদ্রোহীদের পরাজিত করলেন এবং "একদিন সুরজমল নিশ্চিন্ত মনে বসে গল্পগুজব করছেন—দুপুর বেলা বাইরে বনের মধ্যেটা শুনশান্, কোনখানে ঘন পাতার আড়ালে বসে দুটো নীল পায়রা কেবলই বকম-বকম করছে (পাঠক লক্ষ্য করে দেখুন অবনীন্দ্রনাথ কিরকম খোশ মেজাজে কল্পনা আশ্রয় করে গল্প বলে যাচ্ছেন, মনে কোন নৈতিক প্রশ্নেরই বালাই নেই)—এমন সময় বাঘ যেমন চুপিসাড়ে এসে হঠাৎ শিকারের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তেমনি পৃথ্বীরাজ ঘরের বেড়া ডিঙিয়ে একেবারে সুরজমলকে চেপে ধরলেন।"

এরপর যা ঘটল তা তো আরো সরেস! পৃথ্বীরাজ ও সুরজমলের মধ্যে খানিক ধস্তাধস্তির পর তাদের মধ্যে এইরকম কথাবার্তা হল: পৃথ্বীরাজ খানিক ভেবে বললেন, "তা যেন হল, কিন্তু মহারানাকে একটা মাথা না হাজির করে দিতে পারলে আমার যে মাথা হেঁট হবে, কাটাও যাবে—তার কী বল!" সুরজমল পৃথ্বীরাজের কানে কানে বললেন, সারংদেবের মাথাটা যদি কাজে লাগে তো নিয়ে যাও; ওর মাথার সঙ্গে ওর রাজ্যটাও হাতে আসবে, আমার মাথার সঙ্গে এই ছেঁড়া পাগড়িটা ছাড়া আর তো কিছুই পাচ্ছ না'!" পৃথ্বীরাজ তার খুড়োর কথামতই কাজ করে। ভীষ্ম, দ্রোণ ইত্যাদি পাণ্ডব পক্ষকে সমর্থন করেও ক্ষত্রধর্মের অনুরোধে অন্নদাতা কৌরবদের হয়ে যুদ্ধ করেন। কিন্তু সারংদেব যে সুরজমলের সঙ্গী ছিলেন এবং এইভাবে নিজের মাথা বাঁচাতে সারংদেবের মাথাকে শত্রুপক্ষের হাতে তুলে দেওয়াটা কি-জাতীয় কাজ হয়েছিল তা নিয়ে কোন মন্তব্যই অবনীন্দ্রনাথের মনে জাগে না।

ঐ আখ্যানটি, যার থেকে এত ক'টি উদাহরণ দিলাম, তার এখানেই শেষ নয়। কাহিনীর নায়কেরা ঐ একই ধরণের কাজ আরও অনেক করেই চলে এবং একই খোশ মেজাজের গল্পের ঢঙে অবনীন্দ্রনাথ তা বলেই চলেন।

বাঙালী পাঠক রামায়ণ-মহাভারতও পড়েন—মূলে না হলেও সংক্ষিপ্ত ভাষণ সকলেরই জানা ও পড়া—অবনীন্দ্রনাথের রাজকাহিনীও উপভোগ করেন। আধুনিক ভারতবাসীর মনে ধর্মচিন্তা কতটা গোলমাল পাকানো সেই বিষয়ে আমার বক্তব্য এর মধ্যেই বলা হয়ে গেল।

আধুনিক বাঙালীর প্রসঙ্গে যদি অবনীন্দ্রনাথের রাজকাহিনীর উদাহরণটা আমার বক্তব্যের পক্ষে উপযোগী হয়ে থাকে তো ভারতবর্ষের অন্য এক অঞ্চলের পক্ষে প্রযোজ্য উদাহরণ হিসাবে শিবাজীকে নিয়ে যে গৌরব করা হয় তার উল্লেখ করতে পারি। শিবাজী যে উপায়ে বাঘনখ দিয়ে আফজল খাঁ-কে হত্যা করেছিলেন তার জন্য তাঁর ভক্ত সম্প্রদায়ে কি এতটুকুও নিন্দা হয়েছে? আফজল খাঁ-ই প্রথম বিশ্বাস ভঙ্গ করে শিবাজীকে আঘাত হেনেছিলেন সেই ভাষণ মেনে নিলেও শিবাজীর আচরণকে রামায়ণ-মহাভারতের ক্ষত্রধর্ম অনুসারে অতিশয় গর্হিত বলেই মনে করতে হয়। কিন্তু আধুনিক ভারতবাসী তা করে না।

আধুনিক ভারতবাসী রামায়ণ-মহাভারতকেও ধর্মপুস্তক হিসাবে মেনে নেয় আবার একই কালে পৃথ্বীরাজ, সুরজমল, জয়মল এবং শিবাজীদের বীরত্বের পূজাও করে—এই ঘটনার মধ্যেই কি আধুনিক ভারতবাসীর চরিত্রের একটি চাবিকাঠি নিহিত নেই?

উদ্ধৃতি-নির্দেশক

১। উদ্যোগপর্ব, অধ্যায় ২৮
২। উদ্যোগপর্ব, অধ্যায় ২৯
৩। ঐ
৪। লিঙ্গপুরাণ, অধ্যায় ৭১
৫। মহাভারত, বনপর্ব, অধ্যায় ১৩
৬। উদ্যোগপর্ব, অধ্যায় ২৬
৭। বনপর্ব, অধ্যায় ১৩
৮। সভাপর্ব, অধ্যায় ৬৭
৯। সভাপর্ব, অধ্যায় ৫৫
১০। বনপর্ব, অধ্যায় ৩৩
১১। উদ্যোগপর্ব, অধ্যায় ২৭
১২। উদ্যোগপর্ব, অধ্যায় ২৯
১৩। উদ্যোগপর্ব, অধ্যায় ২৬
১৪। শল্যপর্ব, অধ্যায় ৬০
১৫। শল্যপর্ব, অধ্যায় ৬১
১৬। স্ত্রীপর্ব, অধ্যায় ১৫
১৭। সৌপ্তিকপর্ব, অধ্যায় ১
১৮। শল্যপর্ব, অধ্যায় ৬১
১৯। ঐ
২০। ঐ
২১। ঐ
২২। ঐ
২৩। ঐ
২৪। ঐ
২৫। ঐ
২৬। ঐ
২৭। উদ্যোগপর্ব, অধ্যায় ২
২৮। উদ্যোগপর্ব, অধ্যায় ২৮
২৯। উদ্যোগপর্ব, অধ্যায় ২৯
৩০। উদ্যোগপর্ব, অধ্যায় ২৭
৩১। অনুশাসনপর্ব, অধ্যায় ১৬২
৩২। স্বর্গারোহণপর্ব, অধ্যায় ১
৩৩। ঐ
৩৪। ঐ
৩৫। উদ্যোগপর্ব, অধ্যায় ২৬
৩৬। স্ত্রীপর্ব, অধ্যায় ২৬
৩৭। অবনীন্দ্রনাথ, রাজকাহিনী, সংগ্রামসিংহ

এই প্রবন্ধটি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে 'ক্ষত্রধর্ম' নামে প্রকাশিত হয়েছিল 'দেশ' পত্রিকায় ১৩৮৭ সালে।

চতুর্থ অধ্যায়
সত্য ধর্ম

বিভিন্ন ধর্ম বা মূল্যবোধের মধ্যে তুলনা বা তাদের আপেক্ষিক মূল্যায়ন কিভাবে করা যেতে পারে? সমস্যাটি জটিল নিঃসন্দেহে; এই জটিল সমস্যার একটি সহজ সমাধান করা হয়েছিল আমাদের পৌরাণিক যুগে 'তুলাদণ্ডে'র সাহায্য নিয়ে। এই তুলাদণ্ডে ওজন নেওয়ার ঘটনার উল্লেখ রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে একাধিক স্থানে পাওয়া যায়। রামকে বনবাসে পাঠানোর কথা ওঠার পরে দশরথের রাজপুরীতে যে সংকট দেখা দেয় তার পরিপ্রেক্ষিতে দশরথের উদ্দেশ্যে কৌশল্যার মুখে আমরা উল্লেখ পাই, 'স্বয়ং স্বয়ম্ভূকীর্তিত পুরাণপ্রসিদ্ধ' শ্লোকের "সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং সত্য আমি তুলাদণ্ডে ধারণ করিয়াছিলাম; তুলনা করিয়া দেখিলাম সত্যই অধিক ভারবিশিষ্ট হইল। ভূমণ্ডলে সাধুগণ এই কারণে জীবন বিসর্জন করিয়াও সত্য রক্ষা করিয়া থাকেন।"(১) যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন ক'রে শরশয্যাশায়ী ভীষ্ম বলেন: "সমুদয় তীর্থে অবগাহন করিলেও সত্যবাদীর সদৃশ ফল লাভ হয় কি না সন্দেহ। তুলাদণ্ডের একদিকে সহস্র অশ্বমেধ ও অপর দিকে সত্য আরোপিত করিলে সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞ অপেক্ষা সত্যই গুরুতর হইয়া উঠে।"(২) একই অবস্থায় ভীষ্মের অপর এক উক্তি, "সহস্র সহস্র বৎসরের তপস্যাও সত্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে। সত্য এবং ধর্মকে তুলাদণ্ডে আরোপিত করিলে সত্যেরই গৌরব লক্ষিত হয়।"(৩)

দেবীভাগবতে পাই হরিশ্চন্দ্রকে উদ্দেশ্য ক'রে বিশ্বামিত্র বলছেন: "একদা ভগবান ব্রহ্মা সত্যের গুরুত্ব জানিবার জন্য তুলাদণ্ডের একদিকে সত্য ও অপরদিকে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ স্থাপন করেন, তাহাতে সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষা সত্যেরই গুরুত্ব দেখিয়াছিলেন।"(৪) দুষ্মন্তকে উদ্দেশ্য করে শকুন্তলা বলেন, 'আত্মকৃত সত্যধর্ম প্রতিপালন কর। দেখ, শত শত কূপ খনন করা অপেক্ষা এক পুষ্করিণী প্রস্তুত করা শ্রেষ্ঠ; শত শত পুষ্করিণী খনন করা অপেক্ষা এক যজ্ঞানুষ্ঠান করা শ্রেষ্ঠ; শত শত যজ্ঞানুষ্ঠান করা অপেক্ষা এক পুত্রোৎপাদন করা শ্রেষ্ঠ, এবং শত শত পুত্র উৎপাদন অপেক্ষা সত্য প্রতিপালন করা শ্রেষ্ঠ। একদিকে সহস্র অশ্বমেধ ও অন্যদিকে এক সত্য রাখিয়া তুলনা করিলে সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষাও সত্যের গুরুত্ব অধিক হয়। হে মহারাজ, সমুদয় বেদ অধ্যয়ন ও সর্বতীর্থে অবগাহন করিলে সত্যের সমান হয় কি না সন্দেহ।"(৫)

আমাদের শাস্ত্রে পরস্পরবিরোধী ধারণা ও মূল্যবোধের নমুনার কোনো অভাব নেই। কিন্তু সত্যের গুরুত্বের ব্যাপারে কোনো দ্বিমত দেখা যায় না; "ত্রিলোকমধ্যে সত্য হইতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম নাই।"(৬) এর বিপরীত কোনো বিচার কোথাও পাওয়া যায় না। আদর্শ পুরুষের কী কী গুণ থাকা উচিত তদ্বিষয়ক আলোচনায়, কী কী গুণ থাকলে মানুষ স্বর্গে যাওয়ার অধিকার অর্জন করে তৎসংক্রান্ত আলোচনায় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে সত্য। রামায়ণে রামকে যতবিধ বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে তার মধ্যে অধিকাংশই সত্যসংশ্লিষ্ট: যথা, সত্যনিষ্ঠ, সত্যপ্রতিজ্ঞ, সত্যে আবদ্ধ, সত্যে অবহিত, সত্যবাদী, সত্যপাশে বদ্ধ, সত্যবাক্, সত্যজ্ঞ, সত্যসন্ধ।

সত্যের গুণকীর্তনে মহাকবিরা ও পুরাণকারেরা ক্লান্তিহীন। ধৃতরাষ্ট্রকে উদ্দেশ্য ক'রে বিদুর সত্যকে 'স্বর্গে'র সোপান' এবং 'সংসার-সাগরের তরী' বলে বর্ণনা করেছেন; বলেছেন, "যে ধর্মে সত্য নাই তাহা ধর্ম'ই নয়।"(৭) একই ধৃতরাষ্ট্রকে উদ্দেশ্য করে মহর্ষি সনৎসুতজাত বলেন, "সত্যই মুক্তির আধার—বিধাতা এইরূপ বিধান করিয়াছেন যে সত্যই সাধুলোকের একমাত্র ব্রত।"(৮) বৃহৎ-ধর্মে বলা হয়েছে, "ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, স্ত্রীহত্যা প্রভৃতি পাপসকলও একমাত্র সত্যপালনরূপ পুণ্যে বিনষ্ট হয়।"(৯) একই জায়গায় বলা হয়েছে, "মানুষ সত্যবহিষ্কৃত হইলে শ্মশানের ন্যায় বর্জনীয় হইয়া থাকে,...স্বসত্য পরিপালন পুরুষের যাদৃশ পরমধর্ম এমন আর কিছুই নাই।"(১০) রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে বলা হয়েছে: "সত্য-পরায়ণ মানবগণ এক সত্যের দ্বারা যে সমস্ত লোকে গমন করিয়া থাকেন মিথ্যাপরায়ণ ব্যক্তিগণ শত শত যজ্ঞ করিয়াও সেই সমস্ত লোকে গমন করিতে পারে না।"(১১) সত্যের প্রভাব সম্পর্কে ভীষ্ম বলেছেন, "মৃত্যু ও অমৃত এই দুইটি দেহমধ্যে সঞ্চরণ করিতেছে। তন্মধ্যে মনুষ্য মোহপ্রভাবে মৃত্যু এবং সত্যপ্রভাবে অমৃত লাভ করিয়া থাকে।"(১২) সত্যের প্রভাবে মৃত্যু কিভাবে পরাহত হয় তার একাধিক উদাহরণ প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায়। মহাভারতের বনপর্বে হৈহেয়কুলচূড়ামণি একজন কুমার নৃপতির কথা বলা হয়েছে যিনি মৃগয়াভিলাষে ভ্রমণকালে কৃষ্ণাজিনাচ্ছাদিতকলেবর এক মুনিবরকে কৃষ্ণসারভ্রমে সংহার করেন। হৈহেয়রাজগণ কার পুত্র জানবার নিমিত্ত ভ্রমণ করতে করতে কাশ্যপনন্দন ঋষিবর অরিষ্টনেমার আশ্রমে উপনীত হন। অরিষ্টনেমা অনায়াসে মৃত পুত্রকে পুনর্জীবিত করলেন। কী উপায়ে এইরূপ ক্ষমতার অধিকারী তিনি হলেন এই প্রশ্নের উত্তরে কাশ্যপ-বংশীয়দের অন্যতম ঋষি তার্ক্ষ্য বলেন, "মৃত্যুপ্রভাব আমাদিগের নিকট যে নিমিত্ত প্রতিহত হয় এক্ষণে তাহা সংক্ষেপে কহিতেছি, শ্রবণ করুন। আমরা কেবল সত্যই জানি, আমাদিগের মন মিথ্যাতে কখনও অনুরক্ত হয় না। আমরা সর্বদা স্বধর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি, এই নিমিত্ত আমাদিগের মৃত্যুভয় নাই।"(১৩) এইরকম আর একটা কাহিনী পাই দেবীভাগবতে। দেব-দৈত্যদের যুদ্ধে দৈত্যগণ ভৃগুর পত্নী শুক্র-জননীর আশ্রয় লাভ করলে এবং দেবগণ নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লে স্বয়ং বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দ্বারা সেই স্ত্রীর শিরশ্ছেদ করেন। ভৃগু বলেন, "যদি ধর্ম আচরণ করিয়া থাকি, যদি সত্যবাদী হই তো সেই ধর্মবলে তুমি জীবিত হও"(১৪) এবং প্রকৃতই ভৃগুপত্নী পুনর্জীবন লাভ করেন। মহাভারতের উদ্যোগপর্বে পাওয়া যায় যযাতির উপাখ্যান। পুণ্যক্ষীণতা-প্রাপ্তিহেতু তিনি স্বর্গ থেকে চ্যুত হন, কিন্তু তাঁর চারটি দৌহিত্র তাদের পুণ্যের অংশ দান করে তাঁকে পুনরায় স্বর্গে প্রেরণ করেন। উশীনরনন্দন শিবি বলেন, "আমি বরং রাজ্য, প্রাণ, অর্থ ও সুখসম্ভোগ পরিত্যাগ করিতে পারি, তথাপি সত্য পরিত্যাগ করিতে পারি না। আমার সেই সত্যপ্রভাবে আপনি স্বর্গে গমন করুন"(১৫) এবং এই সত্যের প্রভাবের সমক্ষে স্বর্গে'র দ্বার খুলে যেতে বাধ্য হয়। মিথ্যা সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "মিথ্যা অন্ধকারের স্বরূপ। এই অন্ধকারের প্রভাবে লোকের অধঃপাত হইয়া থাকে।"(১৬) এই অধঃপাতের হাত থেকে স্বয়ং শ্রীহরিরও নিস্তার নেই। "বিষ্ণু ছলাবলম্বী হইয়া বামনত্ব অর্থাৎ ক্ষুদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সত্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম আর নাই, সেই সত্য নষ্ট করিয়াছিলেন বলিয়া হরি বলির দ্বারপালত্ব লাভ করিয়াছিলেন।"(১৭)

সনাতন ধর্মে সত্যের স্থান যে সর্বোর্ধ্বে সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ রাখা হয়নি; কিন্তু সত্য জিনিসটা কী, যার এবংবিধ মহিমা তার উত্তর সহজলভ্য নয় এবং

বিভিন্ন জায়গায় সত্যের স্বরূপ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তাও সবসময় পরস্পরবিরোধিতাশূন্য নয়। সত্যের স্তুতি করার সময়ে এমন অনেক কথাই বলা হয়েছে যা এই ঘোর কলিকালের মিথ্যার প্রভাবে আচ্ছন্ন, বর্তমান লেখকের মতো স্বল্পজ্ঞান, ক্ষুদ্রবুদ্ধি ব্যক্তির বোধের অগম্য। যেমন ধরুন শিবপুরাণে এইভাবে বাক্যের স্রোত বইয়ে দেওয়া হয়েছে, "সত্যই ব্রহ্ম, সত্যই শ্রেষ্ঠ তপস্যা, সত্যই অসাধারণ যজ্ঞ, সত্যই অদ্বিতীয় বিদ্যা, সত্যই দান, সত্যই মন্ত্র, সত্যই দেবী সরস্বতী, সত্যই ব্রতচারণ, সত্যই ওংকার।"(১৭) ভীষ্মও খুব সাহায্য করেন না যখন তিনি বলেন, 'সত্য অক্ষয় ব্রহ্ম, অক্ষয় তপস্যা, অক্ষয় যজ্ঞ ও অক্ষয় বেদস্বরূপ—তপস্যা, ধর্ম, দমগুণ, যজ্ঞ, তন্ত্র, সরস্বতী, স্বর্গ বেদ, বেদাঙ্গ, বিদ্যা, বিধি, ব্রতচর্যা, ওংকার এবং জীবগণের জন্ম ও সন্তানসন্ততি সমুদয়ই সত্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।"(১৮) এও বলেন "সত্যপ্রভাবেই সূর্য উত্তাপ প্রদান করিতেছে এবং সত্যপ্রভাবেই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত ও বায়ু প্রবাহিত হইতেছে।"(১৯) রামায়ণের "অযোধ্যাকাণ্ডে"ও এই জাতীয় স্তুতি পাই যার থেকে সত্য যে মানুষের দোষগুণ সম্পর্কিত কোনো ধারণা তাতেই আস্থা রাখা যায় না। সত্য হইতে সোম, সোম হইতে ব্রহ্ম, ব্রহ্ম হইতে অমৃত, অমৃত হইতে সলিল, সলিল হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে প্রাণিসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে।"(২০) তেমনি যে "সত্যই দ্যুলোক, অন্তরীক্ষলোক এবং ভূলোক ধারণ করিতেছে"(২১) তা নিশ্চয়ই কোনো মানবিক গুণ নয়।

তবে আমাদের সৌভাগ্য, অন্যবিধ সংজ্ঞাও পাই। খুবই সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য এই সংজ্ঞাটি পাই লিঙ্গপুরাণে, "লোকে যেটি যথার্থ দেখিয়া ও শুনিয়া থাকে এবং যেটি সদনুমিত ও যেটি যথার্থ নিজে অনুভব করিয়া থাকে তদ্বিষয় পরপীড়াশূন্য কথনকেও সত্য বলিয়াই সাধুগণ কীর্তন করেন। অশ্লীল বাক্য কীর্তন করিবে না, ব্রাহ্মণের এই প্রকার শ্রুতি আছে, এটিও সত্য।"(২২) বেদব্যাস সংজ্ঞা দিয়েছেন, "মিথ্যাকথা না বলা, অঙ্গীকার প্রতিপালন করা, প্রিয়বাক্যকথন, গুরুসেবা, দৃঢ়ব্রত, আস্তিক্য, সাধুসঙ্গ, মাতাপিতার প্রীতি উৎপাদন, বাহ্য শৌচ, আন্তর শৌচ, লজ্জা ও অকার্পণ্য—এই দ্বাদশ প্রকার সত্য।"(২৩) সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি তালিকা পাই ভীষ্মের কাছ থেকে,"সত্য ত্রয়োদশ প্রকার : অপক্ষপাতিতা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, অমৎসরতা, ক্ষমা, লজ্জা, তিতিক্ষা, অনসূয়া, ধ্যান, সরলতা, ধৈর্য্য, দয়া ও অহিংসা।"(২৪) এখন আমাদের মুশকিল অন্য ধরণের। তালিকার প্রত্যেকটি গুণকেই মানবিক গুণ হিসেবে চিনে ও বুঝে নিতে কোনো অসুবিধা হয় না, কিন্তু প্রশ্ন জাগে : এই দ্বাদশ এবং এই ত্রয়োদশ, এই সবই যদি 'সত্য' তো বিভিন্ন গুণের মধ্যে বাকী রইল কী কী? এতগুলো সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবকে একত্র ক'রে তাদের সত্য আখ্যা দিয়ে অর্থ পরিষ্কার করা হল, না, ঘোলা করা হল? আবার সম্পূর্ণ অন্য কথা বলা হয়েছে মহাভারতের বনপর্বে। দ্বিজোত্তম কৌশিককে কোনো নারী বলেন, 'যদি যথার্থ প্রকৃত ধর্মের মর্ম অবগত না থাকেন তবে মিথিলায় গমনপূর্বক ধর্মব্যাধকে জিজ্ঞাসা করুন।' কৌশিক সেই সেই বাক্যানুসরণ ক'রে ধর্মব্যাধের সমীপে উপস্থিত হয়ে সত্য কী এই তত্ত্ব-প্রশ্ন রাখেন। ধর্মব্যাধ উত্তর দেন, "যাহা সাধারণের হিতজনক তাহাই সত্য।"(২৫) এতে অবশ্য একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে অন্য একটা প্রশ্ন তোলা হল, কারণ এখানে কৌশিকের প্রশ্ন করা স্বাভাবিক ছিল, 'হিত' কী? এবং তার উত্তর দিতে হলে আরও অনেক প্রসঙ্গের উত্থাপন করতে হত। অন্যত্র নারদও বলেছেন,

"যে বাক্যদ্বারা জীবের সর্বাধিক মঙ্গল হয় তাহাই সত্য বাক্য।"(২৬) কিন্তু মঙ্গল কী, সেই প্রশ্নের চোরাবালি এড়িয়ে গেছেন।

'সত্য কী'? এই প্রশ্নের উত্তর যেখানে যেখানে সোজাসুজি ভাবে দেওয়া হয়েছে তার থেকে দেখা যাচ্ছে আমাদের বিশেষ জ্ঞানলাভ হয় না। কিন্তু সত্যনিষ্ঠার উদাহরণ হিসেবে যত অসংখ্য কাহিনী রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে পাওয়া যায় তার থেকে দেখা যায় 'সত্য' বলতে বেশীরভাগ সময়েই ব্যাসদেবের উপরিউদ্ধৃত উক্তির প্রথম দুইটি সংজ্ঞার কোন একটিকে বা উভয়কেই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ 'মিথ্যাকথা না বলা' এবং 'অঙ্গীকার রক্ষা করা'। আপাতদৃষ্টিতে 'মিথ্যা কথা না বলা' এবং 'অঙ্গীকার রক্ষা করা' এই দুইটি ভাব সম্পূর্ণ সম্পর্কবিহীন মনে হয়। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই তাদের মধ্যে একটি মৌলিক একতা আবিষ্কার করা যায়। সত্য হল কোনো ঘটনা এবং তৎসম্পর্কিত কোনো কথনের মধ্যে একটি সম্পর্ক। কথন যদি সত্যের যথার্থ প্রতিফলন হয় তো সত্য অনুসৃত হল। তা যদি না হয় তো হল সত্যভঙ্গ। ঘটনা যদি কথনের পূর্ববর্তীকালীন হয়ে থাকে তো তা হলে মিথ্যাকথা না বলার অর্থে সত্যরক্ষা ঘটবে। ঘটনা যদি হয় কথনের পরবর্তীকালীন তো সত্য-রক্ষার অর্থ অঙ্গীকার রক্ষা করা, প্রতিজ্ঞা পালন করা অথবা শাপ বা বরের অমোঘ ফল প্রদান করা হয়। প্রথমক্ষেত্রে সত্যবাদী ব্যক্তি কথনকে ঘটনার অনুযায়ী করাবেন। দ্বিতীয়-ক্ষেত্রে সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি ঘটনাকে করাবেন কথনের অনুগামী। এই দুই সত্যের ধারণার মধ্যে ভেদ তাহলে মাত্র কালের গতির দিক (arrow of time) এর উপর নির্ভর করছে। কালের গতির দিককে যদি অস্বীকার করা হয় তাহলে মিথ্যা কথা না বলা ও অঙ্গীকার রক্ষা করা—এই দ্বিবিধ ভাবকে একীকরণ করে দেখা যায়। উদাহরণতঃ নেওয়া যাক রামের দশরথ সম্বন্ধে এই উক্তিকে: "পুণ্যচরিত্র ধর্মাত্মা সত্যধর্মপরায়ণ লোকোপদেষ্টা নৃপতিকে মিথ্যা কহান আমার কর্তব্য নহে।"(২৭)

মিথ্যাকথা না বলার অর্থে সত্যকে আমাদের শাস্ত্রে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই সত্যের সর্বপ্রসিদ্ধ ধারক বোধহয় যুধিষ্ঠির যিনি সারা জীবনে মাত্র একটি অর্ধমিথ্যা উচ্চারণ করেছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের সত্যপ্রতিজ্ঞ হিসেবে খ্যাতি তাঁর পিতৃদত্ত অঙ্গীকার রক্ষা করার দৃঢ় ব্রতে অটুট থাকার জন্য, কিন্তু তিনি মিথ্যাকথা না বলার অর্থেও সত্যবাদী ছিলেন। সীতা তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন, "তিনি সত্যই বলিয়া থাকেন, জীবনরক্ষার প্রয়োজনেও তিনি কখনও মিথ্যা বলেন না।"(২৮) অযোধ্যাকাণ্ডে রাম নিজে বলেছেন, "আকাশ পতিত হইতে পারে, পৃথিবী বিদীর্ণ হইতে পারে, সমুদ্র শুষ্ক হইতে পারে কিন্তু আমি কোনো সময়ে পরিহাসালাপেও মিথ্যা বলিতে পারি না।"(২৯) এইরকম সত্যবাদী আরেকজন ছিলেন উশীনরনন্দন শিবি, যাঁর উক্তি, 'আমি স্ত্রী, বালক ও শ্যালকাদির সমক্ষে, যুদ্ধে, লোকের মৃত্যুসময়ে, আপৎকালে এবং ব্যসনসময়েও মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করি নাই।"(৩০) কিন্তু এই রকম আক্ষরিক সত্যকথা বলাকে খুব বেশী অনুমোদন আমাদের শাস্ত্রে করা হয়নি। মিথ্যাকথা না বলাকে নানান শর্তের উপর নির্ভরশীল করা হয়েছে। প্রথমতঃ, অনেক ক্ষেত্রেই এরকম শর্ত করা হয়েছে, কথনকে ঘটনার সুষ্ঠু প্রতিফলন হলেই চলবে না তাকে, পরপীড়াশূন্য হতে হবে। লিঙ্গপুরাণ থেকে যে উদ্ধৃতিটি দিয়েছি তাতে এই শর্ত লক্ষণীয়।

দ্বিতীয়তঃ, অনেক ক্ষেত্রবিশেষে ঘটনা অনুযায়ী কথনকে বারণই ক'রে দেওয়া হয়েছে। যেমন নারদ বলেছেন, "কিন্তু যে স্থলে সত্যবাক্য প্রয়োগ করিলে লোকের অনিষ্ট হয় সে স্থলে সত্যবাক্য পরিত্যাগপূর্বক মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করা কর্তব্য"। (৩১) ভীষ্ম বলেছেন, "যে স্থানে সত্য মিথ্যারূপে এবং মিথ্যা সত্যরূপে পরিণত হয়, সেই স্থানে সত্যবাক্য না কহিয়া মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করা কর্তব্য;"(৩২) বৃহৎ-ধর্মে আছে, "স্থলবিশেষে মিথ্যাও ধর্ম ও সত্যও অধর্ম হইয়া থাকে—স্ত্রীলোকের নিকট, পরিহাসস্থলে, বিবাহবিষয়ে, জীবিকার্থে, প্রাণসংশয়ে, গোব্রাহ্মণার্থ ও প্রাণিবধবিষয়ে মিথ্যা দূষণীয় নহে।' (৩৩) অর্জুনকে কৃষ্ণ বলেন, "বিবাহ, রতিক্রীড়া, প্রাণবিয়োগ, সর্বস্বাপহরণ এবং ব্রাহ্মণের নিমিত্ত মিথ্যা প্রয়োগ করিলেও পাতক হয় না। যে সত্য ও অসত্যের বিশেষ মর্ম অবগত না হইয়া সত্যানুষ্ঠানে সমুদ্যত হয় সে নিতান্ত বালক।"(৩৪) এই বিশেষ মর্ম বোঝাবার জন্য কৃষ্ণ সত্যবাদী কৌকিওর কাহিনী বর্ণনা করেন। একদা তস্করভয়ে ভীত কিছু লোক এক বনমধ্যে আশ্রয় নেয়, তস্করেরা সেই সত্যবাদী ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলে সে সত্যকথা বলে দেয় ফলে সেই লোকেরা তস্করের হাতে নিহত হয়। এই সত্যবাক্যজনিত পাপের দরুণ সেই ব্রাহ্মণকে ঘোর নরকে নিপতিত হতে হয়। তা না হয় ভালই হয়েছিল, কিন্তু শাস্ত্রকারেরা স্থানবিশেষে সত্যকথা বলায় যে সব ব্যতিক্রম অনুমোদন করেছেন (যেমন বিবাহবিষয়ে, জীবিকার্থে, প্রাণসংশয়ে ইত্যাদি) তা থেকে এই প্রশ্ন না জেগেই পারে না: এসব অবস্থাতেই যদি মিথ্যা বলা ধর্মসঙ্গত হয় তো কোন্ ক্ষেত্র বাকী রইল যেখানে তা নয়? তবে সত্যবাদী হিসেবে পুরাণপ্রসিদ্ধ কোনো ব্যক্তি এইসব সুযোগ নিয়েছেন তার উদাহরণ বেশী পাওয়া যায় না। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের উপদেশে দ্রোণকে যে অর্ধমিথ্যা বলেন তাকেও মহাভারতকার পাপ হিসেবে গণ্য করেন এবং যুধিষ্ঠিরকে নরক দর্শন করিয়ে শাস্তি পাওয়ান। প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা অর্থে সত্যরক্ষা বিষয়ে কিন্তু কোনো ব্যতিক্রমেরই পথ খোলা রাখা হয়নি। ক্ষেত্রবিশেষে মিথ্যা-কথা বলার অনুমোদন করেছেন যে ভীষ্ম সেই ভীষ্মই নিজ প্রতিজ্ঞা সম্পর্কে বলেছেন, "আমি ত্রৈলোক্য পরিত্যাগ করিতে পারি এবং ইহা অপেক্ষাও যদি অভীষ্টতম বস্তু থাকে তাহাও পরিত্যাগ করিতে সম্মত আছি কিন্তু কদাচ সত্য পরিত্যাগ করিতে পারি না···ইন্দ্র যদি পরাক্রম পরিত্যাগ করেন (এবং ধর্মরাজ যদি ধর্ম পরিত্যাগ করেন) তথাপি আমি সত্য পরিত্যাগ করিতে পারি না।"(৩৫) একই অনমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করেন রাম বনগমনের ব্যাপারে—নিজ সত্য রক্ষার জন্যও নয়, তৎকথিত পিতৃসত্য রক্ষার জন্য। একই মনোভাব থেকে হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রের হাত থেকে মেনে নেন কল্পনাতীত ও সম্পূর্ণ অকারণ নির্যাতন। সত্যরক্ষার খাতিরে কর্ণ ব্রাহ্মণরূপী ছলনাকারী ইন্দ্রকে বিনাদ্বিধায় নিজের কবচকুণ্ডল কেটে দিয়ে নিজের মৃত্যুর পথ পরিষ্কার করে দেন বলেই না জনচিত্তে আজও কর্ণ এত সম্মানিত। এই ব্যতিক্রমহীন সত্যধর্ম সম্বন্ধে দশরথকে উদ্দেশ ক'রে কৈকেয়ী বলেন, "শৈব্যনামক ভূপতি প্রতিশ্রুতিদান করিয়া নিজ শরীর শ্যেনপক্ষীকে প্রদান করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য পরমগতি লাভ করিয়াছিলেন। অতি তেজস্বী রাজা অলর্ক বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ প্রার্থীকে নিজ নয়নযুগল উৎপাটিত করিয়া প্রসন্ন চিত্তে প্রদান করিয়াছিলেন।" "সীমালঙ্ঘন করিব না বলিয়া প্রতিশ্রুত সমুদ্র সত্যরক্ষার অনুরোধেই পূর্ণিমা প্রভৃতি পর্ব-সময়েও অতিশয় সামান্য তীরভূমিও অতিক্রম করেন না।"(৩৬) রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণে প্রতিশ্রুতি রক্ষার অর্থে সত্যরক্ষার উপাখ্যান বহু পাওয়া যায়। বিভিন্ন উপাখ্যানের

রস বিভিন্ন কিন্তু মূল প্রতিপাদ্য একই—"সত্যই পরম ধর্ম।" মিথ্যা কথা সম্পর্কে বলা হয়েছে, প্রাণসংশয়ে মিথ্যাকথা বলা দূষণীয় নয়। কিন্তু প্রাণসংশয়েও প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করার সমর্থন কোথাও নেই। সত্যরক্ষার জন্য প্রাণদানের একটি মনোরম উপাখ্যান রুরুদ্রুহ ও মৃগমৃগীদের সম্পর্কিত। রুরুদ্রুহ চৌর্যবৃত্তি ও মৃগহত্যা করে জীবিকা অর্জন করত। একদা সে মৃগয়ার্থে পুকুরধারে একটি বিল্ববৃক্ষে বসে থাকে। একটি মৃগী জল পান করতে এলে ব্যাধ তাকে মারতে উদ্যত হয়। মৃগী বলে, "এই বৃথা দেহের মাংসে কাহারো যদি সুখ হয় তো আমি ধন্য হইব...কিন্তু আমার গৃহে কতকগুলি বালক সন্তান রহিয়াছে, তাহাদিগকে ভগিনী এবং স্বামীর নিকটে যথাবিধ সমর্পণ করিয়া পুনর্বার আগমন করিব, আমার মাংস দ্বারা তোমার সর্বপ্রকার উত্তম তৃপ্তি হইবে।" এরপর ঐ মৃগীর ভগিনী ও তারপরে উভয়ের স্বামী মৃগ একইভাবে আসে এবং একইভাবে পুনরায় আগমন করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে ফিরে যায়। গৃহে মিলিত হয়ে তারা 'যেহেতু আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়াছি অতএব আমাদিগকে নিশ্চয়ই গমন করিতে হইবে' এই বলে বালকগণ সমেত তিনজনেই তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলে, "হে ব্যাধ, শীঘ্র মাংস ভক্ষণ করিয়া আমাদিগের দেহকে সার্থক কর।"(৩৭) বলাবাহুল্য ব্যাধের তখন জ্ঞানোদয় হল। সে মৃগমৃগীদের ছেড়ে দিল, নিজেও শিবদ্বারা এই সৎকর্মের জন্য পুরস্কৃত হল।

এই গল্পটি মোটামুটি স্নিগ্ধ রসেরই। কিন্তু সত্যরক্ষার অনেক গল্প ভয়ংকররসাশ্রয়ী হয়ে পড়ে। ভয়ংকর রসের একটি গল্প: একদা ইন্দ্র পক্ষিরূপ গ্রহণ ক'রে সুকৃষনামক মুনিসত্তমের কাছে গমন করেন এবং প্রাণধারণের জন্য খাদ্য প্রার্থনা করেন। সুকৃষ খাদ্যবস্তু দিতে স্বীকৃত হলে পক্ষী বলেন, একমাত্র মনুষ্যমাংসেই তার ক্ষুধানিবৃত্তি হয়। সুকৃষ রাম বা বিশ্বামিত্রের মত বিনা প্রতিবাদে নির্যাতন মেনে নেন নি। তিনি পক্ষীকে তিরস্কার ক'রে বলেন, 'অয়ি অণ্ডজ! তুমি নিশ্চয়ই এখন বার্ধক্যদশায় পদার্পণ করিয়াছ, দেখ এই বৃদ্ধ-দশায় লোক মাত্রেরই কামনাজাল বিগলিত হইয়া থাকে, তবে তুমি ঈদৃশ অবস্থাতেও কি জন্য নিরতিশয় নৃশংসাত্মা হইয়াছ।' কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি ও স্বীকার ক'রে নেন, 'অঙ্গীকার করিয়া প্রদান করা সর্বদাই কর্তব্য।' অতঃপর সুকৃষ তাঁর আত্মজদের নিজেদের পক্ষীর আহারে পরিণত হতে বললেন। আত্মজরা দশরথপুত্র রামের মতন পিতৃসত্যকে নিজ সত্যে পরিণত করলেন না। বললেন, 'এ কার্য কখনই হইবে না। বুদ্ধিমান ব্যক্তি পরদেহের জন্য নিজ দেহ কিরূপে বিনষ্ট করিতে পারেন?' তাতে রুষ্ট হয়ে সুকৃষ তাদের শাপ দিলেন এবং অতঃপর নিজেকেই ভক্ষ্য হিসেবে পক্ষীকে নিবেদন করলেন। পক্ষী জীবিতদেহ ভক্ষণ করতে অস্বীকৃত হওয়ায় সুকৃষ যোগ অবলম্বন করে নিজ দেহকে প্রাণহীন করতে উদ্যত হলেন। এই সময়ে যা হওয়ার তাই হল, অর্থাৎ পক্ষিরূপ ত্যাগ ক'রে ইন্দ্র নিজরূপে প্রকাশিত হয়ে সুকৃষের সত্য প্রতিজ্ঞার প্রশংসা করলেন ইত্যাদি। (৩৮)

অন্য একটি গল্প সুদর্শন-ওঘবতীর। সুদর্শন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, 'গৃহাশ্রমে থাকিয়া মৃত্যুকে পরাজয় করিব' এবং পত্নী ওঘবতীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'তুমি কদাচ অতিথি-সেবায় পরাঙ্মুখ হইও না, অতিথিকে আত্মসমর্পণ করিতে হইলে তাহাতেও পরাঙ্মুখ হইও না।' একদিন সুদর্শন কাষ্ঠ আহরণার্থ বহির্গত হলে ব্রাহ্মণরূপী ধর্ম এসে ওঘবতীর কাছে আতিথ্য প্রার্থনা করলেন এবং বললেন, 'রাজনন্দিনি! আমি তোমার সহিত সম্ভোগ বাসনা করি।' ওঘবতী অনেক আপত্তির পর সলজ্জভাবে আত্মনিবেদন করলেন। সুদর্শন

ফিরে এসে অবস্থা জ্ঞাত হয়ে, 'ক্রোধ ও ঈর্ষা পরিত্যাগপূর্বক' হাস্যমুখে অতিথিকে বলেন, "ব্রাহ্মণ! আপনি পরমসুখে আমার ভার্য্যা লইয়া সম্ভোগ করুন।"(৩১)

৩

সত্যরক্ষা বিষয়ে এতক্ষণ যে আলোচনা করলাম, বেশ কিছু যে প্রসিদ্ধ ও তত-প্রসিদ্ধ-নয় উদাহরণের উল্লেখ করলাম, তার পিছনে আমাদের উদ্দেশ্য এখন কতগুলি প্রশ্ন তোলা যা আমাদের মনে জাগে কিন্তু যার উত্তর আমাদের জানা নেই। প্রথমতঃ লক্ষণীয়, অধুনা-কালে একটি ধারণার বহুল প্রচার ঘটানো হয়েছে যে আমাদের সনাতন ধর্মের দুটি পদ, সত্য ও অহিংসা। কিন্তু রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে সত্যকে যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে অহিংসা-জাতীয় কোনো ধারণাকে তার এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও দেওয়া হয়নি। দ্বিতীয়তঃ, অধুনাকালে এই সত্যকে ইংরিজিতে TRUTH এই বাক্যে অনুবাদ করা হয়েছে। এই অনুবাদ সর্বতোভাবে ভ্রান্তিপূর্ণ বলে মনে হয়। সত্য কী বলতে আলোচনায় আমরা সত্যের যত রকম সংজ্ঞা পেয়েছি তাদের কোনটির সঙ্গেই ইংরিজি TRUTH-এর কোনো সম্পর্ক নেই। (অবশ্য true to one's word—এই ভাবাধৃত ভাবের সঙ্গে অঙ্গীকার পালন অর্থে সত্যের একটা সম্পর্ক পাই)। এমন কি মিথ্যা কথা না বলার অর্থে সত্যও TRUTH-এর সমার্থবাচক নয় এই কারণে যে, সেখানেও সত্যকথনকে পরপীড়াশূন্য হতে হবে এই-জাতীয় শর্তের উপর নির্ভরশীল করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গ থেকে অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ উঠে পড়ে। পাশ্চাত্য ধর্মীয় চিন্তাধারায় সত্যের ধারণার কাছাকাছি কোনো ধারণারই মনে হয় হদিশ পাওয়া যায় না। TRUTH, যা কি না আমরা এইমাত্র বললাম আমাদের ঐতিহ্যের সত্যের ধারণার সমার্থবাচক নয়, যদিও মিথ্যা কথা না বলার ধারণার কাছাকাছি বটে, এই TRUTH ও খ্রীস্টীয় ধর্মীয় চিন্তায় বা প্রাকৃখ্রীস্টীয় ধর্মীয় চিন্তায় কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল বলে আমার জানা নেই।

তৃতীয় যে প্রসঙ্গ উঠে পড়ে তা এই, যে সত্যকে যে জাতীয় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তাতে কি আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের ধর্মীয় চিন্তায় একটা ভারসাম্যের অভাব সৃষ্টি করা হয় নি? সত্যধর্ম সর্বসম্মতিক্রমে শ্রেষ্ঠধর্ম বলে স্বীকৃত হলেও অন্য অনেক ধর্মের কথাই একই শাস্ত্র-কারেরা বহুভাবে বলে গেছেন। সত্য স্বর্গের সোপানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হতে পারে কিন্তু অন্য অনেক সোপানের কথাই ঘোষণা করা হয়েছে যেমন ইন্দ্রিয়দমন, শরণাগতকে আশ্রয়, অনৃশংসতা, যজ্ঞ, তপস্যা, দান, গোব্রাহ্মণের সেবা—প্রভৃতি যে বিষয়গুলি নিয়ে আমরা পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছি। জীবনে এমন অনেক অবস্থারই উদ্ভব হয় যেখানে একটি ধর্মকে অনুসরণ করতে গিয়ে অন্য কোনো ধর্মকে লঙ্ঘন করতে হয়। এই জাতীয় ধর্মের সংঘর্ষ ধার্মিক ব্যক্তিকে ধর্মসংকটের সম্মুখীন করে। আমাদের মহাকাব্য এবং পুরাণে জীবন এমন সরল মোটেই ছিল না যে তাতে ধর্মসংকট দেখা দিত না—পদে পদেই দিত। রামায়ণের আখ্যানভাগ তো পুরোপুরিই ধর্মসংকট সংক্রান্ত। কিন্তু যা দেখে আশ্চর্য হতে হয় তা এই যে, সত্যপ্রতিজ্ঞ বলে আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে যাঁরা খ্যাতি অর্জন ক'রে গেছেন তাঁরা যেন সত্যের সঙ্গে অন্য কোন ধর্মের সংঘর্ষকে সংকট বলেই মনে করেন নি।

অনায়াসে অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মকে পদদলিত ক'রে লোকোত্তর প্রতিজ্ঞার সত্যধর্ম পালন করে গেছেন। এবং সেজন্যেই তাঁদের ধন্য ধন্য করা হয়েছে। ভীষ্মই বোধহয় তাঁর প্রসিদ্ধ দুটি প্রতিজ্ঞা উচ্চারণের সময়ে অন্য কোনো ধর্মকে লঙ্ঘন করেন নি (যদি না অবশ্য সন্তানোৎপাদন করে পিতৃঋণ শোধ করাকে অন্যতম ধর্মের দাবি বলে মানা যায়)। কিন্তু কর্ণ এককথায় ভেকধারী ইন্দ্রকে কবচকুণ্ডল কেটে দান করে দিয়ে নিজের আত্মহননের জন্যই শুধু দায়ী হলেন না, কৌরবপক্ষের পরাজয়েরও কারণ হলেন। অপরদিকে অপক্ষপাতকে সত্যের একটি সংজ্ঞা বলে ভীষ্ম বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইন্দ্র যে খলতার আশ্রয় নিয়ে অর্জুনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে তাঁকে জিতিয়ে দিলেন এদোষের জন্য ইন্দ্রের বা অর্জুনের ততটা নিন্দা মহাভারতকার করলেন না যতটা প্রশংসা করলেন কর্ণের সত্যরক্ষার। শ্রীরামচন্দ্রের বনগমনের ঘটনা তো আরও চমকপ্রদ। শ্রীরামচন্দ্র বনে যেতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন, কৌশল্যা, লক্ষ্মণ ও ভরতের সর্ববিধ আজ্ঞা, অনুরোধ ও যুক্তি উপেক্ষা করে। তাঁর বনে যাওয়ার ফলে দশরথ শোকে দগ্ধ হয়ে প্রাণ ত্যাগ করলেন, কৌশল্যা হলেন জীবন্মৃতা। অযোধ্যাবাসিগণ হলেন অনাথ, সীতাকে পেতে হল চূড়ান্ত নিগ্রহ, লক্ষণের পত্নী হলেন উপেক্ষিতা। এসবই ঘটল রামের নিজ সত্যরক্ষার খাতিরে নয়, রামের ধারণা অনুযায়ী পিতৃসত্যরক্ষার খাতিরে। যদিও রামকে বনবাসে পাঠানোর আজ্ঞা দশরথ নিজমুখে একবারও উচ্চারণ করেন নি। আজ্ঞা দিয়েছিলেন কৈকেয়ী এবং তার পিছনে প্ররোচনা ছিল একটি দুষ্টাবুদ্ধি তুচ্ছ রমণীর। এই দুষ্টাবুদ্ধি তুচ্ছ রমণী মন্থরার নির্দেশনাকে অনড়, অটল ভবিতব্যের স্থান দিয়ে বসলেন রাম তাঁর পিতৃসত্য রক্ষার ধারণার ভিত্তিতে। অথচ এখানে স্পষ্টতঃই একাধিক ধর্মের সংঘর্ষ ঘটেছিল। এই প্রসঙ্গটি আমরা পরবর্তী একটি পরিচ্ছেদে বিশদভাবে আলোচনা করব।

হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যানও সত্য রক্ষার উপাখ্যান হিসাবে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে কিন্তু তা অধিকতর মাত্রায় বিশ্বামিত্রের খলতা ও নৃশংসতার উপাখ্যান বলে পরিগণিত হতে পারত। আশ্চর্যের বিষয়, আখ্যানকার ঐ খলতা ও নৃশংসতার কোন নিন্দা করেন না, হরিশ্চন্দ্রের সত্য-ধর্মের প্রশংসা করেই ক্ষান্ত থাকেন। হরিশ্চন্দ্র নাহয় বরুণদেবের কাছে অপরাধ করেছিলেন, তাঁর পুত্রকে বলি দেবেন বলে অঙ্গীকার ক'রে পরে স্নেহমোহবশতঃ ঐ নৃশংস কর্ম ক'রে উঠতে পারেন নি। কিন্তু বিশ্বামিত্র যে হরিশ্চন্দ্রকে চণ্ডালের ভৃত্য করিয়ে ছাড়লেন, তাঁর দোষলেশহীনা স্ত্রী শৈব্যাকে যে অকথ্য শোক, দুঃখ, যন্ত্রণা ও অপমানে ভোগালেন, তার সপক্ষে কোনো যুক্তির কথা ভাবা যায় কি? অবশ্য হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যা যখন চিতারোহণ করতে যাচ্ছেন তখন দেবতাপরিবৃত হয়ে এসে বিশ্বামিত্র বলেন, তাঁকে পরীক্ষা করা হচ্ছিল মাত্র। কিন্তু এ কী মারাত্মক ধরনের পরীক্ষা! পরীক্ষা করার নামে এ কী চূড়ান্ত অত্যাচার! অথচ এত সত্ত্বেও বিশ্বামিত্রের মহিমা ক্ষুণ্ণ হয় না। উপাখ্যানটি এমনভাবে বিবৃত হয়েছে যেন হরিশ্চন্দ্রের ঐভাবে অকারণ নিগ্রহ মেনে নেওয়াটা ধর্মশীল ব্যক্তিমাত্রেরই একটি অনুসরণ যোগ্য মহৎ আদর্শ।

সুদর্শন ও ওঘবতীর উপাখ্যানে সুদর্শন তো ক্রোধ ও ঈর্ষা জয় করতে পারার জন্য প্রশংসনীয় হলেন, সত্যরক্ষা করার জন্য মহিমা অর্জন করলেন, কিন্তু ওঘবতীর উপর যে চরম অত্যাচার করা হল, তাঁকে যে পতিবাক্য অনুসরণ করা এবং পরপুরুষ গমন না করার

উভয় সংকটে ফেলা হল, বিশেষ করে যে পুরুষের দিকে যখন তাঁর বিন্দুমাত্র কামনা ছিল না, তার কোন আভাস কাহিনীর বিবৃতিতে পাই না।

ফলে সত্যের নামে সীতার উপর, ঊর্মিলার উপর, কৌশল্যার উপর, হরিশ্চন্দ্রের উপর, শৈব্যার উপর, ওঘবতীর উপর কি পরিমাণ INJUSTICE ই না করা হয়েছে! কিন্তু মহা-কাব্যকার-পুরাণকারেরা যেন সে বিষয়ে অবহিতও নন। একথাটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে INJUSTICEএর কোন সংস্কৃত প্রতিশব্দ নেই। তাই কথাটিকে ইংরিজিতেই রাখলাম।

চতুর্থ প্রশ্ন মনে জাগে: সত্যরক্ষা, যাকে এমন চূড়ান্ত গুরুত্ব আমাদের শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে, সেই ধর্মবোধ কোথায় গেল পরবর্তী কালের ভারতবর্ষে? কি কি ভাবে এই বিশিষ্ট ধর্মধারণাটি ভারতবাসীর জীবনকে পরবর্তী যুগে প্রভাবিত করেছে? পরবর্তী কোন ঐতি-হাসিক যুগেই কি ভারতবর্ষের অধিবাসীরা সমকালীন অন্য কোন সভ্যতাপ্রাপ্ত দেশের অধিবাসীদের চেয়ে অধিকতর মাত্রায় মিথ্যা কথা না বলা বা অঙ্গীকার রক্ষা করা অর্থে সত্য-নিষ্ঠা দেখিয়েছে বলে কোন নজির আছে? মুসলমানদের আগমনের আগে পর্যন্ত এই ব্যাপারে ভারতীয়দের নৈতিকমান সম্বন্ধে যে তথ্য পাওয়া যায় তা পরস্পর বিরোধিতাশূন্য নয়, কিন্তু এ তো আমরা জানি যে রাজপুত বীরদের মধ্যে, মারাঠা রাজপুরুষদের মধ্যে ভীষ্ম বা কর্ণের আদর্শ অনুযায়ী কোন পুরুষের নজিরই পাওয়া যায় না; এই যুগের বীরত্বকাহিনী প্রায়শঃই শঠতার কাহিনী, বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী। ইংরেজ-ফরাসীরা যখন এদেশে হাজির হল তখন তো ভারতবাসীদের পরম দুর্নামই রটে গেছে, ভারতবাসীরা পরম মিথ্যা-বাদী এবং বিশ্বাসের একেবারেই অযোগ্য। এই দুর্নাম সবটা যথার্থ না হলেও ভীষ্ম, কর্ণ ও রামচন্দ্রের আদর্শকে যে জাতি যুগ যুগ ধরে সর্বোচ্চ স্থান দিয়ে এসেছে তার এবংবিধ দুর্নাম রটার সূত্রই বা এলো কোথা থেকে? আর একেবারে যদি স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতবর্ষে চলে আসি তো এ কথা কি বলতে পারি যে অন্যান্য দেশ, যাদের ঐতিহ্যে সত্যধর্মের কোন গন্ধও নেই, সেসব দেশের অধিবাসীদের তুলনায় মিথ্যা কথা না বলা বা অঙ্গীকার রক্ষা করা—এ দুয়ের কোন্ অর্থে আমরা ভারতবাসীরা অধিক সত্যনিষ্ঠ? বরং ধর্মের মধ্যে যে ভারসাম্যের অভাবের কথা বলা হয়েছে তারই যেন ব্যাপক প্রভাব আমাদের আধুনিক ভারতবাসীদের মানসিকতায় লক্ষ্য করা যায়।

উদ্ধৃতি-নির্দেশক

১। অযোধ্যাকাণ্ড, সর্গ ৬১ (অমরেশ্বর ঠাকুরের অনুবাদ)
২। অনুশাসনপর্ব, অধ্যায় ৭৫ (কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ)
৩। শান্তিপর্ব, পূর্বার্ধ, অধ্যায় ১৯৯ (ঐ)
৪। দেবীভাগবত, ৭ম স্কন্ধ, অধ্যায় ২১
৫। আদিপর্ব, অধ্যায় ৭৪
৬। অযোধ্যাকাণ্ড, সর্গ ৬১
৭। উদ্যোগপর্ব, অধ্যায় ৩৪

৮। উদ্যোগপর্ব, অধ্যায় ৩৪
৯। উদ্যোগপর্ব, অধ্যায় ৪২
১০। বৃহৎ ধর্ম, মধ্যমখণ্ড, অধ্যায় ২৬
১১। অযোধ্যাকাণ্ড, সর্গ ৬১
১২। শান্তিপর্ব, পূর্বার্ধ, অধ্যায় ১৭৫
১৩। বনপর্ব, অধ্যায় ১৮৪
১৪। দেবীভাগবত, ৪র্থ স্কন্ধ, অধ্যায় ১২
১৫। মহাভারত, উদ্যোগপর্ব, অধ্যায় ১২১
১৬। দেবীভাগবত, ৪র্থ স্কন্ধ, অধ্যায় ৪
১৭। শিবপুরাণ, ধর্মসংহিতা, অধ্যায় ২২
১৮। মহাভারত, শান্তিপর্ব, পূর্বার্ধ, অধ্যায় ১৯৯
১৯। মহাভারত, অনুশাসনপর্ব, অধ্যায় ৭৫
২০। বাল্মীকি রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, অধ্যায় ৬.
২১। বাল্মীকি রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, অধ্যায় ৬১
২২। লিঙ্গপুরাণ, পূর্বভাগ, ৮ম অধ্যায়
২৩। বৃহৎ ধর্ম, পূর্বখণ্ড, ২য় অধ্যায়
২৪। মহাভারত, শান্তিপর্ব, পূর্বার্ধ, অধ্যায় ১৬২
২৫। মহাভারত, বনপর্ব, অধ্যায় ২১২
২৬। মহাভারত, শান্তিপর্ব, উত্তরার্ধ, অধ্যায় ৩৩০
২৭। বাল্মীকি রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, সর্গ ২১
২৮। বাল্মীকি রামায়ণ, সুন্দরাকাণ্ড, সর্গ ৩৩
২৯। বাল্মীকি রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, সর্গ ১৫ (১ বং)
৩০। মহাভারত, উদ্যোগপর্ব, অধ্যায় ১৯২
৩১। মহাভারত, শান্তিপর্ব, উত্তরার্ধ, অধ্যায় ৩৩০
৩২। মহাভারত, শান্তিপর্ব, পূর্বার্ধ, অধ্যায় ১৯৯
৩৩। বৃহৎধর্ম, মধ্যকাণ্ড, অধ্যায় ১৭
৩৪। মহাভারত, বনপর্ব, অধ্যায় ৭০
৩৫। মহাভারত, আদিপর্ব, অধ্যায় ১০৩
৩৬। বাল্মীকি রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, সর্গ ১৪
৩৭। শিবপুরাণ জ্ঞানসংহিতা, অধ্যায় ৭৪
৩৮। মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ৩য় অধ্যায় (পঞ্চানন তর্করত্নের অনুবাদ)
৩৯। মহাভারত, অনুশাসনপর্ব, ২য় অধ্যায়

এই প্রবন্ধটি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে 'সত্যরক্ষা' নামে প্রকাশিত হয়েছিল 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় ১৩৮২ সালে।

পঞ্চম অধ্যায়

ক্রোধ ও শাপ প্রদান

কোশল দেশে দেবদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণ অপুত্রক হওয়ায় পুত্রার্থে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন এবং গোভিলকে উদ্গাতা পদে বরণ করেন। গোভিলের সাম বেদ মন্ত্রের উচ্চারণে ত্রুটি দেখে দেবদত্ত কুপিত হয়ে বলেন, "মূর্খবৎ আপনার স্বরের ব্যতিক্রম"। গোভিল জবাবে শাপ দেন, 'তুমি যখন আমায় মূর্খ বলিলে, তখন তোমার শঠ প্রকৃতি শব্দ জ্ঞান বিবর্জিত ঘোর মূর্খ পুত্র হইবে"। দেবদত্ত তারপর গোভিলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং গোভিল সদয় হয়ে তাঁর শাপের প্রতিষেধক রূপে কিছু ব্যবস্থা করে দিলেন। এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "মুনিগণ সতত ক্রোধবিহীন ও সকলের সুখপ্রদ হইয়া থাকেন...বস্তুত মহৎ ব্যক্তিদিগের ক্রোধ ক্ষণস্থায়ী ও পাপিষ্ঠদিগের ক্রোধ কল্পান্তস্থায়ী হইয়া থাকে"।(১)

দেবী ভাগবতের এই উপাখ্যানটি দিয়ে শুরু করার কারণ এই যে শাপ দেওয়া নামক যে ঘটনা আমাদের পৌরাণিক সাহিত্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তার সম্বন্ধে যে কয়টি প্রশ্ন এই প্রবন্ধে আলোচনা করতে চাই তাদের প্রায় সব কটিই এই উপাখ্যানে প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, "মুনিগণ সতত ক্রোধবিহীন" হন। কিন্তু পুরাণ, উপপুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতে যত শাপ দেওয়ার কাহিনী আছে তাদের প্রায় সব কটিতেই দেখা যায় যে শাপদাতা ক্রোধে কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে শাপ দিয়েছেন। সুচিন্তিত পরিকল্পনার ভিত্তিতে ন্যায়বিচার অনুসারে কেউ কাউকে শাপ দিয়েছে এরকম ব্যতিক্রম খুবই কম।

শাপ সম্বন্ধে আর একটি ধারণার স্পষ্ট প্রকাশ এই কাহিনীতে পাই। তা এই যে শাপ কখনও ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। যত অযৌক্তিক, যত অন্যায়ই হোক, শাপ দেওয়ার পর শাপদাতা যতই উপলব্ধি করুন যে অন্যায় ও অবিচার করা হয়ে গেছে একবার শাপ হিসাবে যা উচ্চারিত হয়েছে তার একটুও এদিক ওদিক হওয়া সম্ভব নয়। শাপের এই লক্ষণটি পৌরাণিক সাহিত্যে ব্যতিক্রমহীন। তেমনি ব্যতিক্রমহীন অপর আর একটি লক্ষণ। তা হল এই যে শাপদাতা নিজেই শাপমুক্তির উপায় দেখিয়ে দিতে পারেন। শাপের অপনয়ন সম্ভব না হলেও খানিকটা ক্ষতিপূরণস্বরূপ এমন ব্যবস্থা করতে পারেন যা বর দানের স্বরূপ। যেমন দেবদত্তের স্তবে তুষ্ট হয়ে গোভিল বলেন, "তোমার পুত্র মূর্খ হইয়াও পরে বিদ্বান হইবে।" শাপ দেওয়ার ক্ষমতার ভিত্তি কী, শাপ কে দিতে পারে কে দিতে পারে না, সে বিষয়ে কোন স্পষ্ট নিয়ম নেই। মুনি-ঋষিরা তো কথায় কথায় শাপ দিতেন। দেবতাদের মধ্যেও যাঁরা বেশী ওজনে ভারী তাঁরাও শাপ দেওয়ার ব্যাপারে কার্পণ্য করতেন না। কিন্তু অনেক উপাখ্যানে দেখা যায় যে, শাপদাতা একজন অতিসাধারণ ব্যক্তি। শাপ যাকে দেওয়া হচ্ছে তার স্থান তখনকার দিনের মূল্য বিচারে অনেক উপরে। সুতরাং, শাপ দেওয়ার ক্ষমতা সর্বত্র শাপদাতার সামাজিক বা আত্মিক মর্যাদার উপর নির্ভরশীল নয়। অপরপক্ষে যে কারণে শাপ দেওয়া তার ন্যায় অন্যায়ের বিচারও এই ক্ষমতার ভিত্তি নয়। অত্যন্ত তুচ্ছ, অত্যন্ত সামান্য এবং অনেক সময় সম্পূর্ণ ভুল ও অন্যায় ধারণার বশবর্তী অবস্থায় এমন কি

অত্যন্ত গর্হিত কামনা সিদ্ধির উদ্দেশ্যে শাপ দেওয়া হয়েছে এমন ঘটনা ব্যতিক্রম তো নয়ই বরং খুবই সাধারণ। আবার প্রায়শই দেখা যায় যে, খুব সঙ্গত কারণ থাকা সত্ত্বেও এবং আত্মিক ও সামাজিক মর্যাদার বিচারে খুব উর্ধ্বস্থানের অধিকারী হয়েও শাপদাতা প্রতিপক্ষের কোন ক্ষতি করতে সম্পূর্ণরূপে অপারগ।

শাপ এক ধরনের ম্যাজিক। অবশ্য ম্যাজিক বলতে Frazer তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ The Golden Bough-এ যা বুঝেছেন, ঠিক সেই অর্থে ম্যাজিক শাপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। উক্ত লেখকের মতে ম্যাজিক এবং বিজ্ঞান সমধর্মী, কেননা প্রাকৃতিক নিয়মাবলী যে অমোঘ ও অপরিবর্তনীয় এই মৌলিক ধারণা উভয়েরই ভিত্তিপ্রস্তর স্বরূপ। প্রভেদ এই যে, বিজ্ঞান প্রাকৃতিক নিয়মদের সঠিকভাবে অনুধাবন করতে সমর্থ হয়। ম্যাজিক-এ সেই নিয়মদের ভ্রান্তভাবে বোঝা হয়। কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই এই নিয়মাবলীকে নৈর্ব্যক্তিক বলে মনে করা হয়। শাপ কিন্তু একান্তভাবে ব্যক্তিনির্ভর।

শাপ জিনিসটা একটা স্বয়ং গতিশীল যন্ত্রবৎ। বাক্য উচ্চারণের দ্বারা এই যন্ত্রের উদ্ভাবনা। একবার সৃষ্ট হওয়ার পর যন্ত্রের গতি প্রাকৃতিক নিয়মের মতই অমোঘ ও অপরিবর্তনীয়। কিন্তু সেই গতিটা কি হবে তা নির্ভর করছে তার জন্মদাতার বাক্যের উপর। কার বাক্যের দ্বারা এরকম যন্ত্রের সৃষ্টি হতে পারে সে সম্বন্ধে কোন নিয়মই খুঁজে পাওয়া যায় না।

গান্ধারী যখন কৃষ্ণকে অভিশাপ দেন তখন তিনি বলেন, "আমি পতিশুশ্রূষা দ্বারা যে কিছু তপঃ সঞ্চয় করিয়াছি সেই নিতান্তই দুর্লভ তপঃ প্রভাবে তোমাকে অভিশাপ প্রদান করিতেছি"।(২) তেমনি রামকে উদ্দেশ করে বালী-পত্নী তারা বলেন, "পাতিব্রত্য গুণবত্তা বশত আমি তোমাকে শাপ প্রদান করিতে সমর্থা। বৈধব্যাভিভূতা আমার নিকটে তুমি অভিশাপ পাইতে পার না"। (৩) এরকম দু-চার জায়গায় শাপ দেওয়ার ক্ষমতার উৎস সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ধারণা পাওয়া যায়, কিন্তু অর্জুনকে যে উর্বশী শাপ দিয়ে ক্লীবে পরিণত করেছিল তার ক্ষমতার উৎস কি ছিল"?(৪) প্রেমের মহিমা কি? কিন্তু উর্বশীর তো সতীত্ব নামক নারীর যে পরম ধন তার কিছুই ছিল না।

শুধু যে স্বর্গের অপ্সরাও শাপ দেওয়ার ক্ষমতা রাখত তাই নয়, সামান্য একটি কুকুরীও রাজপুত্রদের শাপ দিয়ে শাস্তি দিতে পেরেছিল। (৫) জনমেজয়ের যজ্ঞানুষ্ঠানকালে একটি কুকুর সেখানে উপস্থিত হলে তার ভ্রাতৃগণ ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে প্রহার করেন। কুকুর তার মায়ের কাছে গিয়ে নালিশ করলে কুকুর-মাতা সরমা সেখানে উপস্থিত হয়ে রোষভরে বলেন, "আমার পুত্র যজ্ঞের হবিঃ অবেক্ষণ ও অবলেহন করে নাই, তোমরা নিরপরাধকে প্রহার করিয়াছ অতএব অনুপলক্ষিত ভয় তোমাদিগকে আক্রমণ করিবে"।

এ ব্যাপারটা মনে হয় খুবই অনিশ্চিত ছিল। কে কখন কি ধরনের শাপ দিতে পারবেন সে সম্বন্ধে তখনকার মানুষের ধারণা খুবই অস্পষ্ট ছিল বলতে হবে। কেন না, এমন অসংখ্য উপাখ্যান পাওয়া যায় যেখানে অকারণ কৌতুক বা দুর্মতির প্রেরণায় শাপদাতাকে ক্রুদ্ধ করা হয়েছে। শাপ দেওয়ার সম্ভাবনা আছে জানলে যেচে নিশ্চয় কেউ সাংঘাতিক সাংঘাতিক কল্পনাতীত অবস্থায় নিজেদের পড়তে দিত না। কোন সাহসে বপু নামক অপ্সরা দুর্বাসার মত মুনির তপস্যা ভঙ্গ করাতে যায়? তাকে যে পক্ষি যোনিতে জন্মগ্রহণ

করতে হয় সে তো প্রায় বেঁচে যাওয়া। (৬) পরীক্ষিৎই বা কি মৌনব্রতাবলম্বী মুনির স্কন্ধে মৃত সর্প স্থাপন করতেন যদি তাঁর এতটুকুও ধারণা থাকত যে, এই অপরাধে তাঁকে সপ্ত রাত্রির মধ্যে যমালয়ে প্রেরণ করার ক্ষমতা ঐ মুনির পুত্রের ছিল ? (৭) আর নহুষের কি দুঃসাহস সে বাঁ পা দিয়ে অগস্ত্যের মস্তকে আঘাত করে, যে মস্তকে জটার মধ্যে বাস করছিলেন ভৃগু। (৮) ভৃগুর শাপে নহুষকে যে সর্পদেহ ধারণ করতে হয় এও অপরাধের তুলনায় সেকালের শাস্তির বিচারে কমই বলতে হবে। অগস্ত্যের মত মহামান্য মুনির শাপ দেওয়ার ক্ষমতা সম্বন্ধে কুবেরও আশ্চর্য রকম অজ্ঞ ছিলেন। কঠোর তপস্যা মগ্ন মহর্ষির শিরে কুবেরের সখা মনিমান থুথু নিক্ষেপ করেন। (৯) যদুবংশ যে ধ্বংস হল তার উপস্থিত কারণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, একদা মহর্ষি বিশ্বামিত্র, কর্ণ ও তপোধন নারদকে পরিহাস করার জন্য সারণ প্রভৃতি কয়েকজন কৃষ্ণতনয় শাম্বকে স্ত্রীবেশে তাদের কাছে এনে বলেন, "ইনি অমিত পরাক্রম বভ্রুর পত্নী। মহাত্মা বভ্রু পুত্রলাভের নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছেন। আপনারা বলুন ইনি কি প্রসব করিবেন"। (১০) ঋষিগণ ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, "এই বাসুদেব তনয় শাম্ব, বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশ বিনাশের নিমিত্ত ঘোরতর লৌহময় মুষল প্রসব করিবে"। এই মুষলকে উপলক্ষ করে কি করে যদু বংশ ধ্বংস হয় সে কাহিনী সকলেরই জানা। বর্গা, সৌরভেয়ী, সমীচী, বুদ্বুদা ও লতা—এই পাঁচ অপ্সরা কুম্ভীর যোনি প্রাপ্ত হয় এক ব্রাহ্মণের শাপে তার তপস্যা ভঙ্গ করার চেষ্টা করতে গিয়ে।(১১) মুনি-ঋষিদের তপস্যা ভঙ্গ করানোটা অপ্সরাদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য ছিল, সুতরাং তারা যেচে বিপদ ডাকতে গিয়েছিল বলা যায় না। কিন্তু কন্দর্প কি করে মহাদেবের ক্ষমতা সম্বন্ধে এত দূর অজ্ঞ হতে পারল যে, তাঁর তপস্যা ভঙ্গ করতে গিয়ে অনঙ্গ দশা প্রাপ্ত হল ? (১২)

শাপ নামক যন্ত্রটির অনিশ্চিত কর্মপ্রণালীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচেয়ে আশ্চর্যকর উদাহরণ ভুরি পরিমাণে পাওয়া যায় রামায়ণ মহাভারতে। এই দুই মহাকাব্য তো লেখাই হতে পারত না যদি রাম-লক্ষ্মণের এবং পঞ্চ পাণ্ডবের শাপ দেওয়ার ক্ষমতা থাকত। রাম তো বিষ্ণুর অবতার। উনি কেন পারলেন না শাপ দিয়ে রাবণকে কাবু করতে ? ওঁকে কেন অত পরিশ্রম করে অতবার হার মেনে মরি মরি করে কোন মতে রাবণ ও তার রাক্ষস সেনাদের বিনষ্ট করতে হল ? কপিল মুনি তো একবার রোষকষায়িত নয়নে তাকিয়েই ষষ্ঠসহস্র সগর পুত্রদের ভস্মীভূত করেছিলেন। রাম বা রামের হয়ে আর কেউ কেন ঐভাবে লঙ্কাপুরী ধ্বংস করতে পারলেন না ? বিশ্বামিত্র তো তাঁর তপস্যার বলে ত্রিশঙ্কুর জন্য স্বর্গ ও মর্তের মাঝখানে দ্বিতীয় একটি স্বর্গই সৃষ্টি করে দিতে পারলেন। হনুমানও তো অলৌকিক ক্ষমতার প্রয়োগে এক লাফে সমুদ্র লঙ্ঘন করতে পারলেন। রামকে কেন অপেক্ষা করতে হল সেতু বন্ধনের জন্য ?

পঞ্চ পাণ্ডব তো দেবতাদেরই পুত্র ছিলেন। পিতাদের থেকে তাঁরা যে শাপ দেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করতে পেরেছিলেন তার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁরা ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয় ধর্ম অনুসারে নীতিসংগত সম্মুখ যুদ্ধ ব্যতীত শত্রু জয় করবেন না এই মনোভাব থেকে নিশ্চয় তাঁরা মন্ত্রশক্তির ব্যবহার থেকে নিরস্ত থাকেন নি। কারণ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, দুর্যোধন এঁদের কাউকেই পঞ্চ পাণ্ডবেরা ক্ষত্রিয় ধর্ম অনুযায়ী রণে পরাস্ত করতে পারেন নি। ছলনা ও কপটতার আশ্রয় নিতে হয়েছিল। এবং কৃষ্ণকেও মন্ত্রশক্তির আশ্রয় নিতে হয়ে-

ছিল। পদে পদেই তাঁকে অলৌকিক শক্তির আশ্রয় নিতে হয়েছিল। কিন্তু কৃষ্ণ যখন ছলনায় আশ্রয় নিলেনই অলৌকিক ক্ষমতার ব্যবহারও করলেন তখন কপিল মুনির মতো সংক্ষিপ্ত উপায়ে কৌরব সৈন্যের বিনষ্টিসাধন করলেন না কেন ?

শাপের যান্ত্রিকতার অন্য একটি দিক, যা সব সময় কার্যকরী না হলেও প্রায়শই হয়ে থাকে, তা হল যাকে বলা যেতে পারে তার প্রতিবিম্ব বা অনুগমন প্রবণতা। দুই-একটা উদাহরণ দিয়ে আমার বক্তব্য বোঝানোর চেষ্টা করব। জমদগ্নির চার পুত্র পিতার দ্বারা মাতা রেণুকার মস্তক ছেদন করতে অস্বীকার করে মূঢ় ও জড়ের ন্যায় বসে থাকায় জমদগ্নি তাদের এই বলে শাপ দেন, "তোরা জড়বৎ বসিয়া রহিলি, আমার কথা শুনিলি না, এই দোষে তোরা অবিলম্বে জড়ভাবাপন্ন হ।(১৩) প্রতিবিম্ব প্রবণতা বা অনুগামিতা বলতে কি বোঝাচ্ছি তা শাপের ব্যবহৃত বাক্যের মধ্যেই পরিস্ফুট। পাণ্ডুর দ্বারা শরাহত মৃগরূপী কিন্দম মুনি যখন বলেন, "সংগম সময়ে আমাকে বধ করাতে তোমার যে পাপ হইয়াছে তাহার ফল অবশ্যই তোমাকে ভোগ করিতে হইবে। তুমি যে সময়ে স্ত্রী সংসর্গ করিবে সেই সময় তোমার মৃত্যু হইবে"। তখনও ভবিষ্যৎ ঘটনাকে পশ্চাতের ঘটনার অনুগামী করা হয়। (১৪) ঠিক অনুরূপ প্রতিবিম্ববৎ শাপের উপলক্ষ একই কারণে হয়েছিলেন রাক্ষস দশাগ্রস্ত কল্মাষপাদ রাজা যিনি কামক্রীড়ায় আসক্ত এক বিপ্র দম্পতিকে দেখতে পান এবং ব্রাহ্মণকে ধরে ভক্ষণ করেন।(১৫) ব্রাহ্মণী তাঁকে এই বলে শাপ দেন, "আমি ঋতুকাল উপস্থিত দেখিয়া সন্তানার্থ ভর্তার সহিত সংগত হইয়াছিলাম ..তুই যেমন মনোরথ পরিপূর্ণ না হইতেই আমার সমক্ষে প্রিয়তমের প্রাণ সংহার করিলি তোকেও সেইরূপ ঋতুকালে পত্নী সহযোগ করিবা মাত্র পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতে হইবে"। আর কল্মাষপাদ যে রাক্ষস দশাগ্রস্ত হয়েছিলেন তাও ঐ একই জাতীয় শাপের কারণে। রাজা মোহবশে মহর্ষি শক্তিকে প্রহার করলে ঋষি অভিশাপ দেন, "তুই যেমন দুরাচার রাক্ষসের ন্যায় তাপসকে কশাঘাত করিলি, অদ্যাবধি মদীয় শাপ প্রভাবে রাক্ষস হইবি এবং মনুষ্য মাংস লোলুপ হইয়া তোকে এই পৃথিবী পর্যটন করিতে হইবে"।(১৬)

শাপের যান্ত্রিকতার একটি পরম লক্ষণ যে তা অব্যর্থ ও অপরিবর্তনীয় একথা সূচনাতেই বলে নিয়েছিলাম। তবে খুব কদাচিৎ এর ব্যতিক্রম যে পাওয়া যায় না, তা নয়। একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রমের উদাহরণ বিষ্ণুকে প্রদত্ত ভৃগুর শাপ। দেবাসুরের সংগ্রামকালে দৈত্যগণ ভৃগুপত্নীর আশ্রয় গ্রহণ করলে বিষ্ণু ক্রোধে চক্র দ্বারা তার মস্তক ছেদন করেন। ভৃগু ক্রুদ্ধ হয়ে বিষ্ণুকে শাপ দেন কিন্তু সে শাপ সফল হয় না।(১৭)

শাপকে অনেক জায়গাতেই ব্যবহার করা হয়েছে এমনভাবে যা আদিম মনের কৌতূহলের পরিচায়ক। গাছেরা সংবৎসর ফুল দেয় না কেন ? কারণ মহর্ষি স্থূলশিরা যখন সুমেরু পর্বতে ঘোরতর তপশ্চরণ করছিলেন তখন শীতল বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় মহর্ষি পরিতুষ্ট হন। বনস্পতিগণ ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে মহর্ষিকে পুষ্পশোভা প্রদর্শন করেন এবং সেই কারণে ঋষির দ্বারা অভিশপ্ত হন।(১৮) চন্দ্র কৃষ্ণপক্ষে প্রতি তিথিতে ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয় কেন ? কারণ দক্ষ তাঁর ষাটটি কন্যার সাতাশটিকে চন্দ্রকে প্রদান করেন কিন্তু চন্দ্র তাদের একজনের প্রতি বেশী অনুরক্ত ছিলেন। ফলে দক্ষ তাঁকে এই বলে অভিশাপ দেন, "অদ্যাবধি চন্দ্র যক্ষ্মারোগে সমাক্রান্ত হইবে"।(১৯)

এতক্ষণ আমরা শাপের বাস্তিকতার আলোচনা করলাম। এবার আমরা এর নৈতিকতার দিকটা দেখব।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা পাপ কি পুণ্য কি, কি গুণের অধিকারী হলে মানুষকে উত্তম বলা হয় আর কি দোষের অধিকারী হলে অধম বলা হয় তা নিয়ে আমাদের পুরাণকারেরা কি ধরণের ভাবনা চিন্তা করেছিলেন সে বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছিলাম এবং রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদি থেকে অনেক উক্তি জড়ো করে উদ্ধৃত করেছিলাম। তাতে দেখেছিলাম যে, অনেক অনেক গুণের অনেক অনেক তালিকার মধ্যে যে গুণ অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করে তা হল যাকে শম ও দম এই দুই বাক্য দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। শম মানে মনের স্থিরতা, মনঃসংযম। দম মানে দমন, ইন্দ্রিয়দের উপর প্রযোজ্য। প্রজ্ঞার স্থিতিশীলতা এবং ইন্দ্রিয়দের দমন এই দুই গুণকে যে আমাদের ধর্ম চিন্তায় পরম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তার স্বপক্ষে বোধ হয় অনেক যুক্তিতর্ক ও উদাহরণ দেওয়াব প্রয়োজন নেই। শ্রীমদ্-ভগবদ্-গীতার সারৎসার নিষ্কর্ষণ করতে পারলে যে কয়টি পরম বাণী পাওয়া যাবে তাদের মধ্যে একটি নিশ্চয়ই হবে "দুঃখেষনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ। বীতরাগ ভয়ক্রোধঃ"। "বশে হি যস্যেন্দ্রিয়ানি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠাতা"---ইন্দ্রিয়গুলি বশে না থাকলে প্রজ্ঞা যে স্থির হয় না একথা গীতায় কত জায়গায় কতবার বলা হয়েছে? কাম ও ক্রোধ এই দুই রিপু সম্বন্ধে সাবধানবাণী কতবার উচ্চারণ করা হয়েছে? যতিগণ যে কামক্রোধ বিযুক্ত হবেন, "কামঃ ক্রোধস্তথা লোভঃ" যে "ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং"- এই উপদেশেরও কোন ব্যতিক্রম কোথাও পাওয়া যায় না। "অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্" থেকে মুক্ত হয়ে "অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ। নির্মমো নিরহংকারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী" হয়ে ওঠার নির্দেশ ঘুরেফিরে কতবার যে গীতাকার দিয়েছেন তার ঠিক নেই। বিশেষ করে ক্রোধ সম্বন্ধে যত নিষেধ যত বারণ তাকে ভারতীয় ধর্মচিন্তার একটি বৈশিষ্ট্য বলে মনে করতে হয়। খ্রীষ্টীয় চিন্তায় lust বা কাম seven deadly sins-এর অন্তর্গত কিন্তু ক্রোধ নয়। যীশুর বাণীর মধ্যে ক্রোধের উল্লেখ খুবই কম।

এই ক্রোধ রিপু সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহ। সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ। স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি"। এই সব কথারই মূল বক্তব্য একই, "যদা দীপো-নিবাতস্থো"—যথা বায়ুশূন্য স্থানে দীপ চঞ্চল হয় না—এই সুন্দর উপমা দিয়ে যাকে বোঝান হয়েছে।

এতক্ষণ যা বললাম তা সকলেরই এতই জানা যে, স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে, এই অতি পরিচিত কথাগুলির এত পুনরাবৃত্তি করছি কেন। করছি এই জন্য যে, একটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যা আমাদের দেশের শাস্ত্র সম্পর্কিত আলোচনায় আলোচিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। এই সব বাণী, এই সব উপদেশাবলী—প্রচার করা হয়েছে যাদের মুখ দিয়ে অর্থাৎ পুরাকালের মুনি-ঋষি ও অগ্রগণ্য দেবতারা, তাঁদের নিজেদের আচরণে এদের অনুসৃত হতে দেখা যায় কি? যায় না। শুধু তাই না। যা যা করা নিন্দনীয় বলে প্রচার করা হয়েছে তার সবই এঁরা করেছেন, ব্যতিক্রম হিসাবে নয়, নিতান্তই স্বাভাবিক-ভাবে। কোথায় বায়ুশূন্য স্থানে অচঞ্চল দীপের শিখা? সামান্য বায়ুতেই এই সব লোকবন্দিত পরম পুরুষদের চিত্তে ঝড়ঝঞ্ঝা দেখা যেত। আর দীপশিখা পরিণত হত দাবানলে। কাম

ক্রোধ উভয় সম্বন্ধেই এ কথা প্রযোজ্য এবং যত বড় মুনি ঋষি এবং যত বড় দেবতা তত বেশী করে এ কথা সত্য। তাঁরা যে শুধু তাঁদেরই প্রদত্ত উপদেশাবলীর উচ্চতম স্তরকে মেনে চলতে পারতেন না তা নয়। এই ঘোর কলিকালের অতি সাধারণ মানুষ যে পরিমাণে ইন্দ্রিয় সংযম করে চলে এবং কাম ক্রোধকে সংবরণ করে রাখে তাও যেন ছিল তাঁদের সাধ্যের অতীত অথবা লক্ষ্যের বহির্ভূত। এই প্রবন্ধে আমরা ক্রোধ ও ক্রোধের তাড়নায় শাপ দেওয়ার বিবরটি আলোচনা করছি। স্বতন্ত্র একটি প্রবন্ধে (ষষ্ঠ অধ্যায়) এই একই পরম পুরুষেরা, যাঁরা শম, দম অনুশীলন করেই পরম পুরুষ স্তরে উন্নীত হয়েছেন বলে ধরে নিতে হয়, তাঁরা কত সহজে কত নির্দ্বিধায় রিরংসার কাছে আত্মসমর্পণ করতেন তার আলোচনা করব।

যেখানে কলিকালের সাধারণ একজন মানুষ সামান্য একটু বিরক্ত হবে বা অহংবোধে খানিকটা চোট লাগবে বড় জোর, তার দরুণ একটু উষ্মা প্রকাশের চেয়ে আর কিছুই করবে না এমন সামান্য কারণেও শাপ দিয়ে অপর একজনের অপরিমেয় ক্ষতি সাধন করার উদাহরণ আমাদের পৌরাণিক সাহিত্যে ভুরি ভুরি পরিমাণে পাওয়া যায়।

যেমন মহাভারতের আদি পর্বের জরুৎকারু ঋষির সম্পর্কিত নিম্নলিখিত উপাখ্যানটা(২০) বিশ্লেষণ করা যাক। তিনি তাঁর ভার্যা নাগরাজ বাসুকীর ভগিনীর সঙ্গে এই রকম নিয়ম করেছিলেন, "তুমি কদাচ আমার অপ্রিয় আচরণ করিবে না, অপ্রিয় কার্যের অনুষ্ঠান করিলে আমি তৎক্ষণেই তোমাকে পরিত্যাগ করিব"। একদিন জরুৎকারু একান্ত ক্লান্ত হয়ে প্রিয়তমার অঙ্কশয্যায় শিরোনিবেশপূর্বক শায়িত ও নিদ্রিত হলেন। সায়ংকাল উপস্থিত দেখে স্বামীর সন্ধ্যা বন্দনাদি ক্রিয়ালোপের আশঙ্কায় ভার্যা ঋষিকে জাগিয়ে দিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর স্ত্রীকে পরিত্যাগ করলেন। অসময়ে ঘুম ভাঙানোর মত কারণে যদি সাধারণ স্বামীরা স্ত্রীদের পরিত্যাগ করতে পারতেন তো সংসারে স্বামী-স্ত্রীদের একত্রে বাস করাটা সম্ভবই হত না।

তেমনি মার্কণ্ডেয় পুরাণের বলদেব সংক্রান্ত কাহিনীটি (২১) মনে করা যাক। মদ্যপানাসক্ত হয়ে মহাবল বলদেব একদা স্ত্রীগণে পরিবৃত হয়ে মনোহর রৈবতকানন পরিদর্শন করতে যান। তথায় কৌশিক ভার্গব ও ভরদ্বাজ প্রভৃতি বংশীয় ব্রাহ্মণগণ আসীন ছিলেন, বলদেবকে দেখে সকলে গাত্রোত্থানপূর্বক তাঁকে পূজা করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে সূত অনুরূপ কাজ না করায় বলদেব রাগান্বিত হয়ে তাঁকে সংহার করলেন। এই অবস্থায় ক্রোধ হওয়াটাই সাধারণ মানুষের পক্ষে নিন্দনীয় হত কিন্তু দেবতার ক্ষেত্রে ক্রোধের বশে সংহার করাটাও স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া হল। বশিষ্ঠ মুনি একদা সায়ংকালে প্রচ্ছন্ন-বেশে উপবিষ্ট ছিলেন, বসুগণ তাঁকে যথাবিধি সম্মান প্রদর্শন না করায় তিনি তাঁদের শাপ দিলেন, "মনুষ্য যোনি প্রাপ্ত হও"। (২২) মৎস্য পুরাণ এবং দেবী ভাগবতে আমরা বশিষ্ঠ মুনি ও নিমিরাজের পরস্পরকে শাপ প্রদানের উপাখ্যান পাই। (২৩) নিমিরাজের কুলগুরু নিমিরাজ এক যজ্ঞের আয়োজন করে বশিষ্ঠকে যজন কার্য সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করেন, বশিষ্ঠ পরিশ্রান্ত থাকায় একটু সময় চান কিন্তু নিমি অপেক্ষা না করে গৌতমকে আহ্বান করলেন। বশিষ্ঠ অপমানবোধ করে নিমিরাজকে বিদেহ বা দেহহীন হওয়ার অভিশাপ দিলেন, নিমিরাজও বশিষ্ঠকে "অদ্যই তোমার দেহ পতিত হোক" বলে অভিশাপ দিলেন। কালিকাপুরাণে দেখি (২৪) কপিল মুনি তপস্যা হেতু মনুকে একটি সুন্দর

স্থান নির্মাণ করে দিতে বলেন, মনু ঐ প্রার্থনা না মেটালে কপিল মুনি রুষ্ট হয়ে মনু সৃষ্ট ঐ জগতের ধ্বংস কামনা করেন। শিব কর্তৃক দক্ষযজ্ঞ নাশ সম্বন্ধে প্রাচীন সাহিত্যে বিভিন্ন উপাখ্যান পাওয়া যায়। কিন্তু তাদের প্রত্যেকটিরই একটি মূলসূত্র অভিন্ন। তা এই যে দক্ষযজ্ঞে মহাদেবকে অন্যান্য দেবতাদের তুলনায় সম্মান কম দেওয়া হয়েছিল। এই অপরাধে শিব ক্রোধান্বিত হয়ে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই তোলপাড় করে ছাড়েন। মহাভারতের আদিপর্বে বিনতা ও কদ্রুর মধ্যে কোন অশ্বের পুচ্ছের বর্ণ নিয়ে যে কলহ হয় তার চেয়ে হাস্যকর আর কি হতে পারে ?(২৫) কদ্রু বলেন, অশ্বের পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ এবং বিনতা বলেন, অশ্বের পুচ্ছ শুক্লবর্ণ। তাঁদের মধ্যে কথা হয়ে যায় যে যাঁর অনুমান মিথ্যা হবে তিনি অপরের কাছে দাসী হয়ে থাকবেন। কদ্রু গৃহে আগমন করে পুত্রদের বলেন, অশ্বের পুচ্ছদেশে লম্ববান হয়ে তৎপুচ্ছের কৃষ্ণতা সম্পাদন করে দিতে। যে পুত্রেরা এই আজ্ঞা প্রতিপালন করল না তারা জন্মেজয়ের সর্প যজ্ঞে বিনষ্ট হবে বলে জননীর দ্বারা অভিশপ্ত হল।

মহর্ষি উদ্দালোকের শিষ্য কহোড়ের মাতৃগর্ভস্থিত সন্তান অধ্যয়নশীল পিতাকে বলেন, "হে তাত, আপনি সমস্ত রাত্রি অধ্যয়ন করেন কিন্তু আপনার অধ্যয়ন সম্যক্ হয় না"। (২৬) শিষ্যদের সম্মুখে এভাবে অপমানিত হওয়া কোন গুরুর পক্ষেই প্রীতিকর নয় নিশ্চয়ই কিন্তু তাই বলে নিজের সন্তানকে শাপ দিয়ে অষ্টাবক্র করে দেওয়াটা খুব শম, দম চর্চার পরিচায়ক কি ? কিন্তু এই একই ধারা অষ্টাবক্র নিজেও অনুসরণ করে চলেন। উর্ধশীর কন্যা চিত্রাঙ্গদা বালিকা অবস্থায় তাঁকে উপহাস করায় তিনি শাপ দেন, "তুমি দাসীর ঈশ্বরী হইয়া অনূঢ়া অবস্থায় পুত্রদ্বয় প্রসব করিবে"। (২৭)

উপরে গোটা কয়েক মাত্র উদাহরণ দিলাম। এ রকম অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যায় যেখানে তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে চূড়ান্ত ক্ষতিকারক শাপ দেওয়া হয়েছে। ক্রোধ যদি বর্জনীয় দোষ হয়ে থাকে তো তা বর্জনের কোন প্রচেষ্টা তো নেইই, যে সব কারণে ক্রোধের উদ্রেক তার প্রত্যেকটি আমাদের শাস্ত্রানুযায়ী একাধিক দোষের সূচনা করে। প্রায়শই শাপদাতার অহংবোধে একটু কিছু লেগেছে বা। অহমিকার ঊর্ধ্বে উঠতে হবে এও তো আমাদের শাস্ত্রের অন্যতম প্রধান বাণী। কিন্তু মহা মহা মুনি-ঋষিরাও দেখা যাচ্ছে সংকীর্ণতম অহংবোধকে আঁকড়ে ধরে বসে থাকতেন। অহংবোধের গায়ে আঁচড়টুকু লেগেছে কি এমন শাপ দিয়ে বসতেন যা অচিন্তনীয়ভাবে অকল্যাণকর।

শুধু যে তুচ্ছ কারণে কথায় কথায় শাপ দেওয়া হয়েছে তাই নয়, এমন অনেক উপাখ্যান আছে যেখানে দেখা যাচ্ছে যে শাপদাতার ক্রোধের কারণ কোন অত্যন্ত নিন্দনীয় ন্যক্কারজনক উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে বাধা পাওয়া। যেমন বৃহস্পতি যে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উতথ্যের পত্নী মমতার গর্ভস্থ পুত্রকে শাপ দিয়ে অন্ধ করে দিলেন তার কারণ কি ? না সেই মহাপুরুষ ব্যক্তি বলপূর্বক মমতার সঙ্গে সংগম করতে চেয়েছিলেন, গর্ভস্থ পুত্র তাতে বাধা দিয়েছিল। (২৮) এই মুনিবর যা করতে চেয়েছিলেন তাকে এই ঘোর কলিকালেরও ঘৃণ্য অপরাধ বলে গণ্য করা হয়, তার জন্য সভ্য সমাজে দশ বছর জেল খাটতে হয়। কিন্তু পৌরাণিক নীতি অনুসারে শাস্তি পেতে হল গর্ভস্থ পুত্রকে।

একই ধরণের ঘৃণ্য ব্যবহার কপোত মুনির। তিনি কামার্ত হয়ে তারাবতীকে কামনা

করেন। কিন্তু তারাবতী চতুরতার দ্বারা কপোত মুনিকে ছলনা করে নিজ সতীত্ব রক্ষা করেন। সে কথা জানতে পেরে কপোত মুনি ক্রোধে রুষ্ট হয়ে এই বলে শাপ দেন, "তুই সতীত্ব রক্ষার্থে আমার সহিত ছলনা করিলেও বীভৎসবেশধারী বিরূপ ধনহীন নরকপালশোভী পলিতকেশ কোন ব্যক্তি তোকে হঠাৎ গ্রহণ করিবে এবং দুইটি বানর মুখাকৃতি পুত্র প্রসব করিবি"। (২৯)

যযাতি যে তাঁর পুত্রদের সাংঘাতিক সব শাপ দিয়ে শাস্তি দিলেন তার কারণ কি? না, তিনি চেয়েছিলেন তাঁর পুত্রদের কেউ তাঁর জরার সঙ্গে যৌবন বিনিময় করুক। কি চমৎকার আহ্লাদ, নয় কি? সারা জীবন ইন্দ্রিয় ভোগ করার পরও বৃদ্ধ পিতা যেন আরও ভোগ করতে পারেন সে জন্য পুত্রকে নিজের যৌবন দিয়ে দিতে হবে! না দেওয়াটা হয়ে গেল মহা অপরাধ। (৩০) আর যযাতিকে জরাগ্রস্ত হতে হল যে শুক্রাচার্যের শাপে সে শাপও একেবারেই স্বার্থহীন নয়। শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানী ছিল যযাতির দুই পত্নীর এক পত্নী, অন্য পত্নী শর্মিষ্ঠার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে পিতার কাছে স্বামীর সম্বন্ধে নালিশ করতে গিয়েছিল এই হল যযাতির শাপগ্রস্ত হওয়ার কারণ। (৩১) জমদগ্নি যে পরশুরাম আর তার চার ভাইকে শাপ দিয়ে জড়ে পরিণত করলেন, সে কোন অপরাধে? তিনি পুত্রদের আজ্ঞা করেছিলেন মাতা রেণুকার মস্তক ছেদন করার জন্য। মাতৃহত্যা কাজটা কারো কাছে খুব প্রিয় নাও ঠেকতে পারে এবং শাস্ত্রানুসারে তা ঘোর পাপকর্মও বটে। রেণুকার যা-ই অপরাধ হয়ে থাকুক—তিনি নাকি রাজা চিত্ররথকে দেখে কামার্ত হয়েছিলেন—কিন্তু মাতৃহত্যা করতে না চাওয়াটা নিশ্চয়ই খুব বড় অপরাধ নয়। অপর দিকে জমদগ্নির মনোভাবে শম, দম, অহংবোধের ঊর্ধ্বে ওঠা এ সবের কোন ছায়াই নেই। (৩২)

অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য ক্রোধের সংগত কারণ ছিল। চ্যবনপুত্র প্রমতি যখন দুর্মতি নলকে শাপ দেন, "যেহেতু তুমি মদোন্মত্ত হইয়া আমার এই আশ্রমে মদীয় ভার্যাকে বলপূর্বক গ্রহণ করিলে সেই হেতু অচিরাৎ ভস্মীভূত হও।" তখন সেই শাপকে ন্যায়সঙ্গতিহীন বলা যায় না।(৩৩) অন্যত্র ক্রোধের কারণ এবং শাপ দ্বারা প্রদত্ত শাস্তির পরিমাণ এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যের প্রশ্ন না উঠে পারে না। ধর্মপরায়ণ মহাতপাঃ ত্রিতকে তাঁর দুই ভাই তাঁর গাভীর লোভে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করে চলে যান। এই অপরাধের শাস্তি হিসেবে ত্রিতর "আমার শাপ প্রভাবে দংষ্ট্রায়ুধ ভীষণ বৃকরূপ ধারণ করিয়া ইতস্তত বিচরণ কর।" (৩৪) এই অভিশাপকেও আতিশয্য যুক্ত নাও মনে হতে পারে যদিও মহাতপাঃ ঋষির মধ্যে ক্ষমার ছিটেফোঁটা তো দেখিই না, যা দেখি তা বেশ এক প্রতিহিংসাপরায়ণ হিংস্র মনোভাব।

গৌতম মুনির শাপে অহল্যা যে প্রস্তরে পরিণত হল সে কি চূড়ান্ত অবিচার নয়? ইন্দ্র তো গৌতম মুনির রূপ ধারণ করেই এসেছিলেন, সেটা যে ছদ্মবেশ তা জানার উপায় অহল্যার ছিল না, কিন্তু গৌতম মুনি জেনেছিলেন। পতি পরম দেবতা, তাঁর কামনা পূর্ণ করাই সতীসাধ্বীর পরম ধর্ম। ছলনাকারী কামুক ইন্দ্রকে "তোমার বৃষণদ্বয় পতিত হউক" এই শাপ দেওয়াটা খুবই ন্যায়সঙ্গত হয়েছিল, দেবগণ যদি মেষের স্থূল বৃষণদ্বয়ের সাহায্যে তাঁকে আবার সবীর্য না করতেন তো আরো ভাল হত, স্বর্গের, মর্তের অনেক নারী এই দুষ্কৃতকারীর লোলুপতার হাত থেকে রক্ষা পেত। (৩৫)

কর্ণ অবশ্য পরশুরামকে ছলনাই করেছিলেন। নিজেকে ব্রাহ্মণ পরিচয় দিয়ে তাঁর

কাছে অস্ত্রশিক্ষা গ্রহণ করছিলেন। কিন্তু কর্ণের যে গুরুভক্তির পরিচয় এই বিখ্যাত উপাখ্যানে পাওয়া যায়—কীট তাঁর উরুদেশ বিদীর্ণ করলেও গুরুর নিদ্রাভঙ্গের আশঙ্কায় সে শরীরকে নিশ্চল রাখে—এই সহ্যশক্তি ও এই গুরুভক্তির জন্য তাঁর কোন পুরস্কার মিলল না। পরন্তু নিজেরই গুরুর থেকে এমনই শাপ পেলেন যার দরুণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অন্যায় সমরে অর্জুন তাঁকে নিধন করতে সমর্থ হলেন। (৩৬)

শাপ দেওয়ার একটা যে কারণ ঘুরে-ফিরে বেশ অনেক জায়গায় পাওয়া যায় তা সম্ভোগকালে বাধা পাওয়া জনিত ক্রোধ। এর আগেই বৃহস্পতি ও কপোতের বলাৎকারের চেষ্টায় বাধা পাওয়ার কথা উল্লেখ করেছি। আরো অনেক উপাখ্যান আছে যেখানে বাধা-প্রাপ্ত ব্যক্তি স্বাভাবিক কর্মে লিপ্ত ছিলেন এবং তাদের কাছে এই অবস্থায় বাধা পাওয়া অত্যন্ত আপত্তিকর বলে মনে হয়েছিল। যথা, একদা পার্বতী কামার্ত হয়ে মহাদেবের নিকট গমন করেন, কিন্তু ভৃঙ্গী ও মহাকাল মহাদেবের দ্বারদেশে থাকায় দেবীকে লজ্জিত হতে হয় এবং উনি শাপ দেন যে ওদেরকে মনুষ্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করতে হবে।(৩৭) পাণ্ডু ও কল্মাষপাদ কিভাবে সম্ভোগকালে বাধা দিয়ে শাপগ্রস্ত হয়েছিলেন তার উল্লেখ করেছি। অরট্টদেশীয় দস্যুরা এক পতিব্রতা সীমন্তিনীকে অপহরণ পূর্বক তাঁর সতীত্ব ভঙ্গ করলে তাঁর ক্রুদ্ধ হওয়া খুবই স্বাভাবিক।(৩৮) বিশেষ করে তিনি মুনি-ঋষিও নন এবং তাঁর উপর অত্যাচারটাও চূড়ান্ত রকমের নৃশংস। তথাপি তাঁর অভিশাপ, "তোমাদিগের কুলকামিনীগণ সকলেই ব্যভিচারিণী হইবে।" এটা একটু অতিরিক্ত মনে হয়। ভরদ্বাজ-তনয় যবক্রীতকে যে মহর্ষি রৈভ্য নিহত করান তাকে বরং অধিক ন্যায়বিচারসঙ্গত বলে মনে করা যেতে পারে। (৩৯) যবক্রীত উক্ত মহর্ষির পুত্রবধূর সতীত্ব নষ্ট করেছিল, তাঁর নিজের অপরাধে তাঁকে একাই শাস্তি পেতে হয় এ ব্যাপারটা মেনে নেওয়া অনেক সহজ।

শাপ দেওয়া ব্যাপারটা অনেক সময়ই নিতান্তই ঝগড়াঝাঁটির ব্যাপার। আজকালকার দিনে যেমন রাগ করে দুজন দুজনকে গালাগালি দিতে পারে বা হাতাহাতি করতে পারে তেমনি প্রাচীন কালে একই ধরণের শাপের বিনিময় চলত যেমন কচ ও দেবযানীর পরস্পরকে শাপ প্রদান। (৪০) দেবযানী শাপ দিলেন, "তোমার সঞ্জীবনী বিদ্যা ফলবতী হইবে না।" কচ প্রতিশাপ দিলেন "অন্য কোন ঋষিকুমারও তোমার পাণি গ্রহণও করিবে না।" দুই ভাইয়ে সম্পত্তির ভাগ নিয়ে ঝগড়া হল। (৪০) বিভা বসুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুপ্রতীককে শাপ দিলেন, "তুমি কারণ যোনি প্রাপ্ত হও।" সুপ্রতীক জবাব দিলেন, "তুমিও কচ্ছপ যোনি প্রাপ্ত হও।" এইভাবে দুই ভাই গজ ও কচ্ছপে পরিণত হলেন। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের ঝগড়ার মধ্যে মুনিসুলভ গুণ খুবই কম খুঁজে পাওয়া যায়। (৪২) বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রকে নাজেহাল করছিলেন। হরিশ্চন্দ্রের গুরু বশিষ্ঠকে এসে শাপ দিলেন, "তুই যখন বকবৎ বঞ্চনার্থ বৃথা ধ্যানপরায়ণ তখন বকদেহই ধারণ কর।" বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে শাপ দিলেন, "আমি যাবৎকাল বকদেহ ধারণ করিব তাবৎকাল তুমিও আড়ী পক্ষী হয়ে থাক।" সুতরাং উভয়ই মানস সরোবরতীরে আড়ী ও বকরূপী হয়ে একটি বৃক্ষে বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে বাস করতে লাগল।

এতক্ষণ পর্যন্ত যত উদাহরণ দিলাম তার অধিকাংশই নীতি চেতনার অভাব সূচনা করে। শাপদাতারা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ইংরেজীতে যাকে বলে amoral। খুব কদাচিৎ কখনও সুনীতি দুর্নীতির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। শাপের প্রসঙ্গে ন্যায় বিচারের দৃষ্টিভঙ্গীর উদা-

হরণ হিসাবে যমদেব ও মুনিবর অনীমাণ্ডব্যের উপাখ্যানের কথা ভাবতে পারি। (৪৩) মুনি বিনা দোষে কিছু দস্যুর হাতে নিগৃহীত হন। কেন জানতে চাইলে যমরাজ মুনিকে বলেন, "আপনি পতঙ্গের পুচ্ছদেশে তৃণ প্রবিষ্ট করিয়াছিলেন, সেই দুষ্কর্মের প্রতিফল প্রাপ্ত হইয়াছেন।" তখন মুনি যমরাজকে শাপ দিলেন. "যেহেতু তুমি লঘু পাপে আমাকে গুরুদণ্ড বিধান করিয়াছ এই নিমিত্ত তোমাকে মনুষ্য হইয়া শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হইতে হইবে।" এই এক জায়গায় ছাড়া লঘু পাপে গুরুদণ্ড বা কি রকম পাপে কি রকম দণ্ড তার কোন উল্লেখ বা আলোচনা অন্য কোথাও আমরা পাইনি। বিদুর এক জায়গায় বলেছেন, "কেহই শাপ প্রদান করিলে তাহার উপর কদাচ প্রতিশাপ প্রদান করিবে না। বরং ক্রোধ সংবরণ করিবে"। (৪২) কিন্তু এই উপদেশ যে অনেকে অনুসরণ করতেন এবং সুফল পেতেন তা তো কোথাও দেখি না।

আমরা বোধ হয় ভুল করছি। শাপের ব্যাপারে যদি শাস্ত্রকারেরা সম্পূর্ণ নীতিচেতনাহীন হতেন তো পৌরাণিক সাহিত্যে শাপকে যেভাবে অপব্যাখ্যার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে তা হোত না। আমরা অপব্যাখ্যা বলতে ইংরেজীতে যাকে র‍্যাশনালাইজেশন বলে তাই বোঝাচ্ছি। কোন একটা ঘটনা ঘটেছে যা আপাতদৃষ্টিতে ধর্মের বিরোধী। কিন্তু ধর্ম যে ক্ষুণ্ণ হয়নি তা প্রতিপন্ন করতে হবে। এর জন্য এক একটা শাপের উপাখ্যানের অবতারণা করা হয়েছে। অতীতে শাপ দেওয়ার অর্থ ছিল যে, যাকে যা শাপ দেওয়া হচ্ছে সেটা তার ভবিতব্য। তার খণ্ডন সম্ভব নয়। এইভাবে আপাতদৃষ্টিতে অধর্মকে সাধারণ লোকের চোখে ধর্মের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে দেখানোর যে বক্রগতির প্রচেষ্টা তা এক ধরণের দোষগ্রস্ত নীতিচেতনাই সূচিত করে।

কর্ণকে অন্যায় যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করা হয়, এটা পাণ্ডব পক্ষের একটি কলঙ্ক। এই কলঙ্ক ঢাকতে কত না শাপের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। যেমন কর্ণকে যখন অর্জুন বধ করেন তখন কর্ণ রথ থেকে অবতীর্ণ হয়ে মেদিনীর গ্রাস থেকে রথচক্রকে পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করছিলেন। এই লজ্জাকর ঘটনাকে ধর্মসংগত করে নিতে নিম্নলিখিত শাপের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। একদা কর্ণের শরাঘাতে দৈবাৎ এক অগ্নিহোত্ররক্ষক ব্রাহ্মণের হোমধেনু বিনষ্ট হয়। কর্ণ ক্ষমা ভিক্ষা করা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ অভিশাপ দেন—"তুমি যাহার সহিত নিয়ত স্পর্ধা করিয়া থাক এবং যাহাকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত সর্বশেষ চেষ্টা করিতেছ তাহারই সহিত যুদ্ধ করিবার সময় পৃথিবী তোমার রথচক্র গ্রাস করিবেন। চক্র ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইলে বিপক্ষ তোমার মস্তক ছেদন করিবে।" (৪৫) আর সেই অবস্থায় কর্ণ যে পরশুরামের কাছ থেকে লব্ধ ব্রহ্মাস্ত্র ব্যবহার করতে পারলেন না সেই ঘটনাকেও যুক্তিসঙ্গত করার জন্য আনা হয়েছে কর্ণকে দেওয়া পরশুরামের শাপের উপাখ্যান যার কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। কর্ণ যেহেতু কীট দ্বারা উরুদেশ বিদীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও পরশুরামের নিদ্রাভঙ্গ করেননি সেই অপরাধে পরশুরাম শাপ দেন, "তুমি শঠতাচরণ পূর্বক আমার নিকট হইতে যে ব্রহ্মাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছ তোমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে তাহা আর স্মৃতিপথারূঢ় হইবে না।" কিন্তু নীতি সম্বন্ধে উপাখ্যানকারদের ধারণাগুলি কতটা যে গোলমেলে ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় এই একই উপাখ্যান থেকে। যে কীট কর্ণের উরুদেশ বিদীর্ণ করে তাকে শাপগ্রস্ত করালো সে আর কেউ না, স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র, যে তার পুত্র অর্জুনের হিতাভিলাষে এই কাজ করেছিল। দুর্যোধনকে যে অধর্ম যুদ্ধে ভীম

পরাজিত করল এই কলঙ্ক ঢাকার জন্য নিম্নলিখিত শাপের উপাখ্যানের উদ্ভাবন করা হয়েছে। (৪৬) ভগবান মৈত্রেয় দুর্যোধনের কাছে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করার কথা বলতে গেলে দুর্যোধন "করিকরাকার স্বীয় উরুদেশে" করাঘাত করে উপেক্ষা প্রদর্শন করে। মহামুনি মৈত্রেয় ক্রুদ্ধ হয়ে ও "বিধিকর্তৃক আদিষ্ট হয়ে" তাকে অভিসম্পাত দেন, "সেই যুদ্ধে মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন গদাঘাতে তোমার উরুভগ্ন করিবেন।" রামের কবন্ধ রাক্ষস বধ করার সম্বন্ধে বলা হয়েছে এর দ্বারা বস্তুত কবন্ধের মঙ্গলই করা হয়েছিল। (৪৭) কারণ এই ছিল তার শাপমুক্তির উপায়। কবন্ধ পূর্বে দনুর পুত্র ছিল, অচিন্তনীয় রূপ ছিল কিন্তু সে লোক-ভয়ঙ্কর বিকট রূপ ধারণ করে বনবাসী ঋষিদের ভয় দেখাতো। এই অপরাধে স্থূলশিরা নামক মহর্ষি তাকে শাপ দেন, "তোর এই লোকনিন্দিত নৃশংস রূপই থাকুক।" পরে কবন্ধ সেই ক্রুদ্ধ ঋষিকে প্রসন্ন করলে তিনি শাপমুক্তির উপায় বলে দেন—"রাম যখন তোর মুণ্ড-ছেদনপূর্বক নির্জন বন মধ্যে তোকে দগ্ধ করিবেন তখন তুই স্বীয় সুবিপুল মনোহর রূপ লাভ করিবি।" এভাবে শাপকে বরে পরিণত হওয়ার উদাহরণ পৌরাণিক সাহিত্যে অজস্র পাওয়া যায়। কৈকেয়ীর যে ঘৃণ্য ব্যবহারের জন্য রামকে বনবাসে যেতে হয়, যাকে পৌরাণিক সাহিত্যে ও মহাকাব্যে আগাগোড়াই নিশ্ছিদ্র নিন্দার ভাগী হতে হয়েছে, তারও কলঙ্ক মোচন করে তোলার প্রচেষ্টা করা হয়েছে সংস্কৃত কাব্যে, ভাসের 'প্রতিমা' নাটকে। দশরথ মৃগ ভ্রমে শব্দভেদী বাণ দ্বারা যে অন্ধক মুনির একমাত্র পুত্রকে বধ করেছিলেন এবং সেই উপলক্ষ্যে অন্ধক মুনি যে শাপ দিয়েছিলেন তার উল্লেখ করে কৈকেয়ী ভরতকে বোঝান যে মুনির শাপ অব্যর্থ, তিনি উপলক্ষ্য ছিলেন মাত্র। ভাসের নাটকে ভরত তার মাকে যত কটুকথা বলে-ছিলেন সবই ফিরিয়ে নেন এবং মাতা পুত্রের মিলন দেখান হয়।

কি ধরণের নীতি চিন্তা শাপের উপাখ্যানের মধ্যে প্রতিফলিত হয় তা এইবার সংক্ষেপিত করে বলা যেতে পারে। প্রথমত আমরা দেখি যে নীতির প্রচার ও নীতির প্রয়োগের মধ্যে অচিন্তনীয় অসংগতিই যেন ছিল প্রাচীনকালের সমাজের ও আত্মিক জগতের শীর্ষস্থানে যাঁরা অবস্থিত ছিলেন তাঁদের নৈতিক ব্যবহারের মূল লক্ষণ। দ্বিতীয়ত, ইংরেজীতে যাকে জাস্টিস বলে, যাকে হয়তো ন্যায় বিচার বলে বাংলায় বলা যেতে পারে, ঐ নৈতিক ধারণাটির অত্যন্ত সামান্য উন্মেষই আমাদের পৌরাণিক যুগে ঘটেছিল। তৃতীয়ত, যেটুকু বা এই ধারণা দানা বেঁধেছিল তার মধ্যে অনেক দোষ ও বিকার বর্তমান ছিল, যা প্রকাশ পায় অধর্মকে ধর্মসঙ্গত করে দেখানোর প্রয়াসের মধ্যে।

উদ্ধৃতি-নির্দেশক

১। দেবী ভাগবৎ, তৃতীয় স্কন্ধ, অধ্যায় ১০
২। মহাভারত, স্ত্রীপর্ব, অধ্যায় ২৫
৩। রামায়ণ, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, বিংশ সর্গ
৪। মহাভারত, বনপর্ব, অধ্যায় ৪৬
৫। মহাভারত, আদিপর্ব, তৃতীয় অধ্যায়

৬। মার্কণ্ডেয়পুরাণ, প্রথম অধ্যায়
৭। মহাভারত, আদিপর্ব, অধ্যায় ৪১
৮। মহাভারত, অনুশাসনপর্ব, অধ্যায় ১০০
৯। মহাভারত, বনপর্ব, অধ্যায় ১৬১
১০। মহাভারত, মৌষলপর্ব, তৃতীয় অধ্যায়
১১। মহাভারত, আদিপর্ব, অধ্যায় ২১৬
১২। রামায়ণ, আদিপর্ব, সর্গ ২৩ ও অন্যান্য অনেক
১৩। কালিকাপুরাণ, অধ্যায় ৮৩
১৪। মহাভারত, আদিপর্ব, অধ্যায় ১১৮
১৫। মহাভারত, আদিপর্ব, অধ্যায় ১৮২
১৬। মহাভারত, আদিপর্ব, অধ্যায় ১৭৬
১৭। রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, সর্গ ৫১
১৮। মহাভারত, শান্তিপর্ব, উত্তরার্ধ, অধ্যায় ৩৪৩
১৯। মহাভারত, ঐ
২০। মহাভারত, আদিপর্ব, অধ্যায় ৪৭
২১। মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ষষ্ঠ অধ্যায়
২২। মহাভারত, আদিপর্ব, অধ্যায় ৯৬
২৩। রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, সর্গ ৫৫ এবং মৎস্যপুরাণ, অধ্যায় ৩১
২৪। কালিকাপুরাণ, অধ্যায় ৩২
২৫। মহাভারত, আদিপর্ব, অধ্যায় ২০
২৬। মহাভারত, বনপর্ব, অধ্যায় ১৩২
২৭। কালিকাপুরাণ, অধ্যায় ৪৯
২৮। মহাভারত, আদিপর্ব, অধ্যায় ১০৪
২৯। কালিকাপুরাণ, অধ্যায় ৫০
৩০। মহাভারত, আদিপর্ব, অধ্যায় ৮৪
৩১। রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, সর্গ ৫৮
৩২। কালিকাপুরাণ, অধ্যায় ৮৩
৩৩। মার্কণ্ডেয়পুরাণ, অধ্যায় ১১৫
৩৪। মহাভারত, শল্যপর্ব, অধ্যায় ৬৭
৩৫। শিবপুরাণ, ধর্মসংহিতা, অধ্যায় ১১
৩৬। মহাভারত, কর্ণপর্ব, অধ্যায় ৪৩
৩৭। কালিকাপুরাণ, অধ্যায় ৪৭
৩৮। মহাভারত, কর্ণপর্ব, অধ্যায় ৯১
৩৯। মহাভারত, বনপর্ব, অধ্যায় ১৩৬
৪০। মহাভারত, আদিপর্ব, অধ্যায় ৭৭
৪১। মহাভারত, আদিপর্ব, অধ্যায় ২৯
৪২। দেবী ভাগবৎ, ষষ্ঠ স্কন্ধ, অধ্যায় ১৩
৪৩। মহাভারত, আদিপর্ব, অধ্যায় ১০৮
৪৪। মহাভারত, উদ্যোগপর্ব, অধ্যায় ৩৫
৪৫। মহাভারত, শান্তিপর্ব, পূর্বার্ধ, অধ্যায় ২
৪৬। মহাভারত, বনপর্ব, অধ্যায় ১০
৪৭। রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, সর্গ ৭১

এই প্রবন্ধটি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে "ক্রোধ ও শাপ" নামে প্রকাশিত হয়েছিল 'দেশ' পত্রিকায় ১৩৮৬ সালে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কাম

অন্যান্য ধর্মচিন্তার মত আমাদের কামসম্পর্কিত চিন্তাও অন্তর্দ্বন্দ্বে জটিলভাবে বিজড়িত। মহাকাব্য ও পৌরাণিক সাহিত্য থেকে উদাহরণ দিয়ে এই বক্তব্যটা প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করব। কাজটা কঠিন ও গোলমেলে। এজন্য যে সেই রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের যুগে যত নৈতিক অন্তর্দ্বন্দ্ব আমাদের মনে ছিল, সেগুলি তো এখনও আমাদের মনে স্থান অধিকার করে আছেই। তার উপর আবার নূতন করে আরও কিছু অন্তর্দ্বন্দ্ব, আরো কিছু জটিলতা আমরা আমদানি করেছি আধুনিককালে বহির্জগৎ থেকে। পাশ্চাত্ত্য জগতের কিছু কামশাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিত এই রকম একটা ধারণা প্রচার করেছেন যে কামের ব্যাপারে প্রাচ্য সভ্যতা পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার তুলনায় অনেক বেশী অগ্রসর, এই অর্থে যে কামকে এই সভ্যতায় অনেক উদার উন্মুক্ত ও নির্মল মন নিয়ে গ্রহণ করা হয়েছে। অবশ্য আমি যে সব পণ্ডিত-দের কথা বলছি তাঁরা প্রাচ্য চিন্তায় কামের স্থান সম্বন্ধে কোন পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেন নি। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতায়, বিশেষ করে খ্রীষ্টীয় ভাবধারায়, কামকে কিভাবে বিষাক্ত করে তোলা হয়েছে তার আলোচনার প্রসঙ্গে নিতান্তই তির্যকভাবে প্রাচ্য চিন্তার প্রসঙ্গটা তাঁরা টেনে এনেছেন। খ্রীষ্টীয় ভাবধারায় কামকে যে নানাবিধ জটিলতায় আবেষ্টন করে রেখে তার শ্বাসরোধ করার চেষ্টা করা হয়েছে সে বিষয়ে অবশ্যই কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। এবং তার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া হিসাবে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য দুনিয়ায় কাম নিয়ে যে ধরনের আতিশয্য যে কোন বহিরাগত ব্যক্তির চোখে পড়তে বাধ্য ঠিক সে জাতীয় আতিশয্য এখন পর্যন্ত তুলনীয় মাত্রায় আমাদের সমাজ-জীবনে বা তার প্রতিফলন যে সাহিত্য ও শিল্পে ঘটে থাকে তাদেরকে চিহ্নিত করেনি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বলব এই বিষয়ে যে কোন তুলনাই ভ্রান্ত হতে বাধ্য। প্রথমত, প্রাচ্য সভ্যতা, প্রাচ্য চিন্তা এই বাক্যগুলির ব্যবহার কতটা অর্থ বহন করে? সত্যই কোন সভ্যতাকে প্রাচ্য সভ্যতা বলে চিহ্নিত করা যায় কি না, চৈনিক জীবনাদর্শ, ব্রাহ্মণ্য জীবনাদর্শ এবং ইসলাম ধর্মী আরবদের জীবনাদর্শের মধ্যে মিলই বা কতটা আর অমিলই বা কতটা এসব প্রশ্নের উত্তর সহজ নয়। দ্বিতীয়ত, কাম বা অন্য যে কোন ক্ষেত্রে আদর্শ, ধর্মের নির্দেশনা ও জনগণের মনোভাবের মধ্যে প্রকারগত বিভিন্নতা যত আছে তাদের অলোচনা নিশ্চয়ই হতে পারে কিন্তু তাদের মধ্যে ভালমন্দের তুলনার মানদণ্ড খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে। আমার নিজস্ব মত এই যে কামের ব্যাপারে প্রাচীন বা আধুনিক ভারতীয় মানসিকতায় বিশেষ কোন উন্মুক্ত উদারতার পরিচয় পাওয়া যায় এ একেবারেই ভুল ধারণা।

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, খ্রীষ্ট ধর্ম মানবিকতাবাদ বিরোধী—মানুষের জন্মগত প্রবৃত্তিগুলির বিরোধিতা করে, নিগৃহীত করে, তাদের শ্বাসরোধ করে মারার

প্রতি এ ধর্মের প্রচণ্ড আগ্রহ। আমরা এ কথাটা মেনে নিয়েছি। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি কথা বিনা বিচারে বিনা বিশ্লেষণে মেনে নিয়েছি। আমরা বুঝে নিয়েছি যে আমাদের স্বদেশীয় ধর্মচিন্তা খ্রীষ্ট ধর্মের মত মানবিকতা-বিরোধী নয়। মানুষের জন্মগত প্রবৃত্তিগুলিকে এই ধর্মচিন্তা সহজভাবে মেনে নেয়, তাদের গলা টিপে হত্যা করার চেষ্টা করে না। এই ধারণা কি করে আমাদের মস্তিষ্কে এক মুহূর্তকালও স্থান নিতে পারলো তা ভেবে আশ্চর্য হতে হয়। আমাদের ধর্মশাস্ত্র চর্চা করলে এই ধারণার স্বপক্ষে প্রায় কিছুই খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই বহিরাগত চিন্তাধারা আমাদের নিজেদের সম্বন্ধেই চিন্তাধারাকে কতদূর প্রভাবান্বিত করেছে তার একটি বিশেষ প্রকাশ পাওয়া যায় আমাদের দেশের মন্দির-ভাস্কর্যের কামকলা সম্পর্কে অসতর্ক চিন্তায় ও চিন্তাহীন উচ্ছ্বাস প্রকাশে। খাজুরাহোর শিল্প সৌন্দর্যে যে কোন রসিকজনের পক্ষেই বিহ্বল হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সমাজ সম্বন্ধে জীবন সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান আছে এবং আরও জানার আগ্রহ আছে এমন যে কোন ব্যক্তির পক্ষেই শুধুমাত্র সৌন্দর্য রসে আপ্লুত হওয়া স্বাভাবিক নয়, আরও কিছু প্রশ্ন মনে জাগাই স্বাভাবিক। না জাগাই অস্বাভাবিক। যে প্রশ্নটির কথা বলছি তা এই। যে মন্দিরের গায়ে এই শিল্প সেই মন্দির যে ধর্মচেতনাকে প্রকাশ করে, আর এই শিল্প যে জীবনদর্শনকে রূপায়িত করে তাদের মধ্যে এমন সাংঘাতিক অসঙ্গতি কেন? রেখার ছন্দ, আকারের ভারসাম্য ইত্যাদি মিলিয়ে এই ভাস্কর্যে যে অত্যুচ্চ স্তরের সৌন্দর্যের সৃষ্টি করা হয়েছে তা ছাড়াও এই মিথুন ভাস্কর্যে আরও কিছু বলা হয়েছে। এই শিল্প বিমূর্ত শিল্প নয়। এই শিল্প খুব বেশী রকমভাবেই বিষয়ভিত্তিক। এবং বিষয়টি হচ্ছে কাম। শুধু কাম নয় কাম নিয়ে ক্রীড়া। শুধু ক্রীড়া নয় এমন ক্রীড়া যা সাধারণ নরনারীর নাগালের বাইরে। যে ক্রীড়া আয়ত্ত করতে হলে বেশ শ্রমসাধ্য দীর্ঘকালীন যোগব্যায়াম অনুশীলনের প্রয়োজন। যে ধর্ম চেতনা ঐ মন্দিরের আত্মিক ভিত্তি তার মধ্যে কিন্তু কামকে কোথাও ক্রীড়া হিসাবে নেওয়ার নির্দেশ নেই। ক্রীড়া হিসাবে নেওয়ার জন্য যে মানসিক প্রশ্রয়ের প্রয়োজন সে প্রশ্রয় এ ধর্মচেতনা কখনই দেয়নি। স্পষ্টতই এখানে আমরা একটি দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হচ্ছি। কামকে ষড়্ রিপুর মধ্যে অন্যতম প্রধান রিপু হিসাবে আমাদের ধর্মচিন্তায় আগাগোড়াই দেখানো হয়েছে। কাম যে কোন প্রকার সাধনারই শত্রু, এই মনোভাবের বৈপরীত্য আমাদের ধর্মশাস্ত্রে কোথাও পাওয়া যায় না। কাম সম্বন্ধে যে ধর্মের এই মনোভাব সেই ধর্ম কি করে একই কালে কাম সম্বন্ধে এমন অবাধ আতিশয্য শিল্প মারফত প্রকাশ করতে পারল তা অবশ্যই একটি সমস্যা বটে।

এই বিষয়টিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে এই শিল্পের এসথেটিক আলোচনা অসম্পূর্ণ ও অসততা দোষে দুষ্ট হতে বাধ্য। কিন্তু প্রায় সময়ই অনেক শিল্প সমালোচকই এই বিষয়টির প্রসঙ্গ সযতনে এড়িয়ে যান। একটা পুরো বই একবার দেখেছিলাম যার বিষয় খাজুরাহোর ভাস্কর্য। লেখিকার নাম উর্মিলা আগরওয়াল। লেখিকাকে বাহবা দিতে হয়—পুরো বইটির মধ্যে অনেকগুলি প্লেট তিনি দিয়েছেন, কিন্তু একটির মধ্যেও কোন কামক্রিয়ারত মিথুনের উদাহরণ নেই। এভাবে যাঁরা প্রসঙ্গ এড়িয়ে যান তাঁরা প্রায়ই এমন ব্যাখ্যা উপস্থিত করেন যা স্পষ্টতই চিন্তাগত অগভীরতা বা অসততা প্রকাশ করে। এর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ উদাহরণ বোধহয় মুল্ক রাজ আনন্দ্। উনি একটি পুরো বই লিখে ফেলেছেন যার নাম 'কামকলা'। এ বইয়ের ভিতরে উনি অনেক কয়টি চিত্র দিয়েছেন এবং তার সঙ্গে

দিয়েছেন একটি টীকাভাষ্য যার নাম "Notes on the Philosophical Basis of the Hindu Erotic Sculpture." এই নিবন্ধে আনন্দ্ মহাশয় বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে এই মিথুন-ভাস্কর্যে প্রকাশ পেয়েছে এমন এক ধর্মচেতনা যার মূল কথা আনন্দ। এই মিথুনক্রীড়া নাকি অতীতের ভারতের নরনারীদের জীবনে কামের স্থান কতটা সুস্থ, স্বাভাবিক, সুন্দর ও আনন্দময় ছিল তারই পরিচয় দিচ্ছে। আনন্দ্ এ প্রসঙ্গে হিন্দু ও বৌদ্ধ সভ্যতার 'টেণ্ডার হিউম্যানিজম্'-এর কথা বলেন। আরও অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিই একই জাতীয় ভ্রান্তিতে পড়েছেন। আনন্দ কুমারস্বামীর মত বিদগ্ধ পণ্ডিতেরও প্রতিক্রিয়া হয়েছিল মন্তব্য করা 'ঐ সমাজের অনুভূতির রাজ্য কি বৈচিত্রময় ও ঐশ্বর্যশালী ছিল...'। মার্কসবাদী পণ্ডিত শ্রীহীরেন মুখোপাধ্যায়ও কোনো বিতর্কে ভারতীয় ঐতিহ্যে মানবিকতাবাদ কত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল তা প্রতিপন্ন করতে এই ভাস্কর্যের উদাহরণ দিয়েছিলেন।

খুবই আশ্চর্য হতে হয় এই ভেবে যে একই সঙ্গে অনেকগুলি বিষয় সম্পর্কে চোখকে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে না পারলে এমন ভুল দেখা ভুল বোঝা সম্ভব হতে পারে না। এই পণ্ডিত ব্যক্তিরা কি করে দেখেও দেখলেন না যে এই মিথুন-ভাস্কর্যে যা দেখান হয়েছে তা সাধারণ নরনারীর ক্রিয়াকলাপের প্রতিচ্ছবি হতেই পারে না। একই কালে একাধিক নারী ও পুরুষ এবং কখনও কখনও সেই সঙ্গে কিছু পশুও আছে—এ জাতীয় সমবেত যৌন ক্রিয়া কি করে সাধারণ মানুষের প্রেম জাতীয় কোন সূক্ষ্ম মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ হতে পারে? যা দেখান হয়েছে তা প্রায়শই ইংরেজীতে যাকে বলা হয় orgy। এবং যে জাতীয় ভঙ্গি প্রদর্শিত হয়েছে তাও হঠযোগীদের পক্ষেই আয়ত্তে আনা সম্ভব। একটু ইতিহাস অনুসন্ধান করলেই জানা যায় যে এই কামক্রীড়া মোটেই সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক আনন্দময় অভিজ্ঞতার ব্যাপার ছিল না। বামমার্গী নানান ধর্মীয় গুপ্ত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের মধ্যে বিভিন্ন অদ্ভুত ও বীভৎস আচার ও ক্রিয়াকাণ্ডের মারফত, সংক্ষেপে, ইংরেজীতে যাকে শর্ট-কাট বলে সেই পথে, সিদ্ধিলাভের প্রচেষ্টা এদেশের ধর্ম অনুশীলনে কখনও বেশী কখনও কম গুরুত্ব অর্জন করেছে। এই কামক্রীড়া ও পঞ্চ'ম'কার অনুশীলন সেই সস্তায় স্বর্গলাভের ধারাভুক্ত। কৌল, কাপালিক, সিদ্ধ, আচার্য প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে মদ্য, মাংস, মৈথুন প্রভৃতির চর্চার কথা সাধারণ লোকের কাছে অজানা নয়। ইতিহাস চর্চা করলে অতীতের কোন কোন যুগে ভারতবর্ষের কোন কোন অঞ্চলে এই ভাবধারার প্রভাব অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছিল তারও হদিস পাওয়া যায়। যথা গবেষকেরা খুঁজে পেয়েছেন যে খাজুরাহোর মন্দির তৈরি করেছিলেন যে চণ্ডেল্লা রাজারা তাঁরা কৌলিক-শাক্ত সম্প্রদায়ের প্রভাবে পড়েছিলেন। কোনারকের মন্দির যখন তৈরি করা হয়েছিল সেই সময় উড়িষ্যা, বঙ্গদেশ ও কামরূপে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল যেসব সম্প্রদায় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বজ্রযানী, কাপালিক, অঘোর পন্থী প্রভৃতি। এইসব সম্প্রদায়ের আচার ও ক্রিয়াকাণ্ড কখনই কোন শ্রেণীর নরনারীর সাধারণ স্বাভাবিক আচরণ ছিল না। এইসব ক্রিয়াকাণ্ডে লিপ্ত হতেন রাজপুরুষেরা এবং যাজক ও সমাজের অন্যান্য শক্তিশালী শ্রেণীর ব্যক্তিরা। এ'দের উদ্ভট সাধনার জন্য যেসব নারীর প্রয়োজন হতো তাদের অধিকাংশই স্বেচ্ছায় স্বাভাবিক আকর্ষণে এ জাতীয় ক্রিয়াকাণ্ডে লিপ্ত হতেন না। এ জাতীয় ধর্মের প্রয়োজনে ব্যবহার করার জন্য নারী সরবরাহ আমাদের সমাজে বরাবরই করা হয়েছে। দক্ষিণ ভারতের ও উড়িষ্যার মন্দিরে যাদের দেবদাসী বলা

হোত সেই জাতীয় নারীদের কথা বলছি। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় অন্যান্য অনেক দেশেই অনেক ধর্মের মন্দিরেই কুমারী কন্যাদের পরিবার থেকে সমর্পণ করে দেওয়ার প্রথা ছিল। এই উপায়ে পরিবারেরা পুণ্য অর্জনও করতেন আবার কন্যাদায় থেকেও মুক্তিলাভ করতেন। নারীদের এ ধরণের ধর্মীয় আচারে লিপ্ত করানোটা নিশ্চয়ই এক চূড়ান্ত অত্যাচার। নারীত্বের ও মনুষ্যত্বের এক অন্তিম অবমাননা। সমাজের শীর্ষস্থানীয় রাজপুরুষ ও যাজক সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের সিদ্ধিলাভের লোভের কাছে এবং অনেক সময় সিদ্ধির নামে বিকৃত কামনা চরিতার্থ করার লালসার কাছে স্বাধীনতা বিবর্জিত নারীদের সমর্পণ এক অত্যন্ত লজ্জাকর সামাজিক ব্যাভিচার। এই ঘটনাকে এইভাবে না দেখে এর মধ্যে নরনারীর সুস্থ জীবনানন্দের প্রকাশ, 'টেণ্ডার হিউম্যানিজম্'-এর প্রমাণ দেখতে বিশেষ রূপে বিকৃত দৃষ্টিসম্পন্ন হতে হয়।

কামকলা আলোচনার ক্ষেত্রে বড় বড় পণ্ডিতদের মধ্যেও এই যে বিরাট ভ্রান্তি তার সঙ্গে তুলনীয় কোন ভ্রান্তি সংস্কৃত কাব্যের আলোচনায় কিন্তু পাওয়া যায় না। সংস্কৃত কাব্যের আধুনিক সমালোচকেরা এই বিষয়ে যথেষ্ট স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। আমি অবশ্য সংস্কৃত কাব্যের মধ্যে গীত-গোবিন্দ এবং রাধাকৃষ্ণের লীলা সংক্রান্ত প্রাচীন ও অর্বাচীন সব সাহিত্যকেই বাদ দিচ্ছি। রাধাকৃষ্ণের ব্যাপারটাও কামকলার মতই এক চরম আতিশয্য দোষে দুষ্ট এবং সেই ব্যাপারেও আধুনিক মনের স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে ভাল আলোচনা এ যাবৎ হয়েছে বলে জানা নেই। সংস্কৃত নাটক ও কাব্যের মূল বিষয়ও কাম। প্রেম নয়, নিতান্তই কাম। কিন্তু সে এমন কিছু নয় যা নিতান্তই অবাস্তব, বল্‌গাহীন অশ্বের মত কল্পনার উপর ধাবমান, অথবা অত্যন্ত সংকীর্ণ পরিধির কোন :গোপন বা বিকৃত সামাজিক অভিজ্ঞতার প্রকাশ। সংস্কৃত নাটক ও কাব্য স্পষ্টতই তৎকালীন সমাজের রাজপরিবারের এবং অন্যান্য উচ্চতর শ্রেণীর পুরুষ ও নারীদের সাধারণ জীবন যাত্রাই প্রতিফলন করে। এই প্রসঙ্গে শ্রীসুশীলকুমার দে-র নিম্নউদ্ধৃত উক্তিগুলি প্রণিধানযোগ্য। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন "এমন এক নৈর্ব্যক্তিকে উপভোগ যাতে কোন ব্যক্তিগত আবেগের স্থান নেই। যার উপলক্ষ্য কোন বিশেষ নারী নয়, কোন Laura নয় কোন Beatrice নয়, যে কোন নারী, একমাত্র শর্ত তাকে হতে হবে যুবতী ও সুন্দরী"। (১) অপর এক জায়গায় তিনি লিখেছেন "এ যুগের প্রেমের কাব্য কদাচিৎই মনকে আনন্দে বা দুঃখে গভীরভাবে আন্দোলিত করে। কারণ, এই প্রেমকে তার অতল গভীরতায় বা অনুভূতির তীক্ষ্ণতায় বিধৃত করা হয় নি, করা হয়েছে প্রাণচাঞ্চল্যময় উপভোগের লীলার মনোভাবে।" এই প্রসঙ্গে শ্রীবুদ্ধদেব বসুর বক্তব্যও স্মরণ করা যেতে পারে। তাঁর মেঘদূত কাব্যের অনুবাদের ভূমিকায় তিনি যা বলেছেন তার উল্লেখ করছি। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পরবর্তীকালের সুধীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ প্রভৃতি কয়েকজন কবির সঙ্গে কালিদাসের তুলনা করে তিনি দেখিয়েছেন যে এই আধুনিকদের তুলনায় কালিদাসের প্রেমের ধারণা কতটা সংকীর্ণ পরিধির ছিল।

২

সংস্কৃত কাব্যের আলোচনা এসে গেল প্রসঙ্গক্রমে। কামকলার আলোচনায় যে ভ্রান্তি

পণ্ডিতেরা করেছেন সেই ভ্রান্তি সংস্কৃত কাব্যের আলোচনায় করা হয়নি এই বক্তব্য রাখতে গিয়ে। কিন্তু কাম সম্বন্ধে যে অপাপবিদ্ধ মানসিকতার পরিচয় ক্রমক্রমে পণ্ডিতরা মিথুন-ভাস্কর্যে পেয়েছেন তার কিছু খাঁটি নমুনা পেতে হলে আমাদের যেতে হয় পৌরাণিক সাহিত্যে ও মহাকাব্যদ্বয়ে। অবশ্য কাম সম্পর্কে পৌরাণিক মনোভাবে অবিমিশ্র পাপ চেতনাহীন বিমল আনন্দই মাত্র ছিল না। সেই পুরাণ ও মহাকাব্যের যুগেই কাম সম্পর্কে মনোভাবে অসুস্থ অন্তর্দ্বন্দ্বের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল। এই মনোভাবে একটি স্পষ্ট ও বড় দ্বিধাবিভক্তি প্রথম দর্শনেই নজরে পড়ে। একদিকে কাম ষড়্‌রিপুর এক রিপু, যে কোন সিদ্ধির পথে প্রধান প্রতিবন্ধক। কাম নিন্দনীয় ও বর্জনীয়, সাধকমাত্রকেই কামকে জয় করতে হবেই। বামমার্গীয় সাধনার ধারা বাদ দিলে বেদান্ত উপনিষদ ও ষড়্‌দর্শনের উপর স্থাপিত এমন কোন সাধনার ধারাই নেই যাতে না কাম প্রমুখ ইন্দ্রিয়দের অতিক্রম করাকে সিদ্ধিলাভের প্রাথমিক শর্ত বলে মনে করা হয়েছে। কারও চরিত্রের প্রশংসা করতে গেলেই জিতেন্দ্রিয় ও ঊর্ধ্বরেতা এই দুইটি বিশেষণের প্রয়োগ প্রাচীন সাহিত্যে অতি ব্যবহৃত। ক্রোধ সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে গীতা থেকে যে কয়টি উদ্ধৃতি দিয়েছিলাম (২) তাদের প্রত্যেকটিতে ক্রোধের সঙ্গে কামকেও মোক্ষলাভের অন্তরায় বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। অন্য এক অধ্যায়ে (৩) দেখিয়েছি যে আমাদের পৌরাণিককালের ধর্মচিন্তার অনেক অনেক ধর্মের কথা বলা হয়েছে কিন্তু তাদের সকলের মধ্যে উচ্চতম স্থান দেওয়া হয়েছে যে ধর্মকে তা হল সত্যরক্ষার ধর্ম। এবং দ্বিতীয় প্রধান স্থান আমাদের শাস্ত্রকারেরা যাকে দিয়েছেন তা হল ইন্দ্রিয়জয়। এই যদি হয় কাম সম্বন্ধে একটি মনোভাব, বিপরীত এক মনোভাব হল পাপবোধ ও লজ্জাচেতনাহীন শিশুমনের আগ্রহ, উৎসাহ ও অধীরতা। এই দ্বিতীয় মনোভাবের মধ্যে এক আশ্চর্য অনাবিল সৌন্দর্যের প্রকাশ কখনো কখনো ঘটেছে তা অস্বীকার করা যায় না। প্রাচীন সাহিত্যে এই বিশেষ মনোভাবের প্রকাশ যেখানে যেখানে ঘটেছে সেখানে এক উচ্চস্তরের কাব্যগুণের প্রসাদ আমাদের মনকে স্নিগ্ধ ও মুগ্ধ করে। এইসব বিশেষ অবস্থায় সামাজিক নৈতিকতার কোন প্রশ্নই তোলা হয়নি। আমরা তুলতে গেলে আমাদের নিজেদেরকেই নীচ্‌ বলে গ্লানি বোধ করতে হবে। উদাহরণ হিসাবে প্রথমে নেওয়া যাক কামের সেই বিশ্বরূপ যা সত্যবান সাবিত্রীকে দেখিয়েছিলেন। "কামী ভ্রমর কূজন করিতে করিতে পুষ্পরেণুবিলিপ্তাঙ্গী প্রিয়ার অনুসরণপূর্বক এক কুসুম হইতে কুসুমান্তরে যাইতেছে। দেখ, এই বনে বহু পুষ্প থাকিলেও পুংস্কোকিল যুবা একটি মাত্র সহকার মঞ্জরী লইয়া কান্তার ন্যায় তাহাকে উপভোগ করিতেছে। ঐ দেখ, বৃক্ষাগ্রস্থ কাক নবপ্রসূতা পক্ষাচ্ছাদিতপুত্রা কাকীকে নিজ চঞ্চুর অগ্রভাগ দ্বারা আপ্যায়িত করিতেছে। ঐ দেখ, যুবা কপিঞ্জল পক্ষী দয়িতা সহিত নিম্ন ভূভাগে যাইয়া কামাকুল চিত্তে আহার গ্রহণেও বিরত রহিয়াছে। হে বিশালাক্ষি! ঐ দেখ চটক পক্ষী নিজ প্রিয়ার উৎসঙ্গে থাকিয়া পুনঃ পুনঃ রমণ দ্বারা কামীদিগকে উৎকণ্ঠিত করিতেছে। ঐ শুকপক্ষী ভার্য্যা সহ বৃক্ষশাখায় উপবেশন করিয়া দেহভারে বৃক্ষশাখাকে অবনমিত করায়, ঐ শাখা ফলবান বলিয়াই প্রতীত হইতেছে। ঐ দেখ, মাংসাস্বাদ তৃপ্ত সিংহযুবা নিজ প্রিয়াকে আলিঙ্গন করিয়া কেমন নিদ্রা যাইতেছে। ঐ দেখ, শৈলকন্দর মধ্যে ব্যাঘ্রদম্পতি রহিয়াছে; উহাদিগের নেত্র-প্রভায় গুহামধ্যে সুপ্রকাশ হইয়াছে। ঐ দ্বীপী জিহ্বাগ্রদ্বারা নিজ প্রিয়াকে পুনঃ পুনঃ লেহন করিতেছে! এবং স্বয়ং প্রিয়া কর্তৃক লিহ্যমান হইয়া প্রীতি অনুভব করিতেছে! ঐ দেখ, বানরী স্বীয় ক্রোড়ে মস্তক

রাখিয়া নিদ্রিত কান্তকে তদীয় দেহের কীট উদ্ধার করিয়া কতই না সুখিত করিতেছে। ঐ দেখ, মার্জারী ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া স্বীয় উদর প্রদর্শন করিতেছে, আর মার্জ্জার তাহাকে নখদন্ত দ্বারা দংশন করিতেছে বটে, কিন্তু তাহাতে মার্জারীর পীড়া জন্মাইতেছে না। ঐ দেখ, শশক ও শশকী উভয়ে কেমন গাত্রপদাদি লুকায়িত করিয়া নিদ্রা যাইতেছে। পরন্তু উহাদিগের কর্ণদর্শনেই উহাদিগকে জানিতে পারা যাইতেছে। কামাকুল করিবর পদ্মাকর সরোবরে স্নানান্তে মৃণালকবল লইয়া নিজ পত্নীর সম্ভাবনা করিতেছে। ঐ দেখ, বরাহ স্বীয় শিশুসন্তান লইয়া পতির অনুগমপূর্ব্বক পতির নাসিকা দ্বারা সমুদ্ধৃত মুশা ভক্ষণ করিতেছে। ঐ দেখ, দৃঢ়াঙ্গসন্ধি কর্দমাক্ততনু মহিষ উৎসুক হইয়া ধাবমানা প্রিয়ার অনুগমন করিতেছে। অয়ি চারুগাত্রি! দেখ ঐ মৃগ, কৌতুহলযুক্ত হইয়া কটাক্ষ দ্বারা তোমার সহিত আমাকে দেখিতেছে। দেখ, ঐ রোহী মৃগী স্নেহার্দ্রচিত্তে শৃঙ্গাগ্র দ্বারা নিজ পতিকে আকর্ষণ করিতেছে। আর কখন বা পশ্চাৎপদ দ্বারা তাহার মুখ কণ্ডুয়ন করিতেছে। দেখ দেখ, ঐ সিতরোমা চমরী স্থির হইয়া রহিয়াছে; আর কামী চমর তাহার নিকটে আসিয়া গর্বিতভাবে আমাকে দেখিতেছে"। (৪)

বর্ণনা এইখানেই শেষ নয়। আরও আছে। উদ্ধৃতিটা একটু দীর্ঘই হল। লোভ সামলাতে পারলাম না। কামের এমন নিষ্পাপ আনন্দময় সৌন্দর্যময় বর্ণনা সাহিত্যে বিরল। এ জাতীয় অনাবিল দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কামকে জীবনের অন্যতম আনন্দ ও সৌন্দর্যের আধার বলে গ্রহণ করতে পারে যে মন সে মনের পক্ষেই সম্ভব ব্যক্তিগত জীবনের পারস্পরিক সম্পর্কেও একই সহজভাবে কামনাকে প্রকাশ করা। রাজা পুরঞ্জনকে জনৈকা নারী যখন বলেন, "দেখিতেছি আপনি ইন্দ্রিয়সুখ অভিলাষ করিতেছেন, আমি মদীয় সখা ও সখিগণ দ্বারা সে সুখ সম্পাদন করিয়া দিব" (৫) তখন ঐ ইন্দ্রিয়সুখ নিবেদনের মধ্যে কোনো পাপের ছায়া দেখলে নিজেদেরকেই পাপী বলে মনে হবে। তেমনি সত্যবতী যখন মহারাজা শান্তনুকে বলেন, "হে রাজন! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা আমারও অভিলষিত..... কামদেব নবযৌবনান্বিতা আমাকে যেরূপ পীড়ন করিতেছে আপনাকে সেরূপ নহে"। (৬) তখন সত্যবতীকে কামপরায়ণা বলে অশ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারার মত বুকের পাটা আমাদের কারো আছে কি? একই সহজ সরল আবেদন কপোতমুনির, যখন তিনি বলেন, "সুন্দরি! তোমাকে দর্শন করিয়া অবধি তোমার সম্ভোগের নিমিত্ত কাম আমাতে সংগত হইয়া আমাকে নিরন্তর পীড়া দিতেছে। তাহার উপশমে তুমিই সক্ষম"। (৭) অথবা সেই সুন্দরীর যিনি অষ্টাবক্র মুনিকে উদ্দেশ করে বলেন, "আমি আপনাকে স্পর্শ করিয়া অনঙ্গশরে নিতান্ত জর্জ্জরীভূত হইয়াছি......আপনি প্রফুল্ল মনে আলিঙ্গন করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন"। (৮)

আপাতদর্শনে নির্মল ও পাপ-চেতনাহীন এই যে মনোভাব ব্যক্তিগত সম্পর্কের স্তরে, তারই সমগোত্রের প্রকাশ পাওয়া যায় নরনারীদের সমবেত ব্যবহারে প্রমোদ উৎসবের বর্ণনায়। মিথুন-ভাস্কর্যের প্রসঙ্গে যে orgy-র কথা বলছি তার থেকে অন্য জাতের ইন্দ্রিয়ভোগোৎসবের উল্লেখ প্রাচীন সাহিত্যে স্থান বিশেষে পাওয়া যায়। যেমন রামায়ণে বর্ণিত ভরদ্বাজ মুনি কর্তৃক আয়োজিত ভরত ও তার অনুগামী সৈনিকদের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা, যাকে "দিব্যসৎকার সাধনম্" বলে বর্ণনা করা হয়েছে। (৯) ভরত সৈন্যসহ রামকে তাঁর চৌদ্দ বৎসরের বনবাসের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়ে ফিরিয়ে আনার মানসে যে যাত্রা করেছিলেন তার পথে ভরদ্বাজ মুনির

আশ্রমে একরাত্রি যাপন করেন। সৈন্য-সামন্তদের ক্রোশ পরিমিত দূরে স্থাপন করে "ধর্মাত্মা ভরত শস্ত্র ও পরিচ্ছেদ পরিত্যাগ পূর্বক ক্ষৌমবস্ত্র ও উত্তরীয় ধারণ" করে পদব্রজে ভরদ্বাজের আশ্রমে প্রবেশ করলেন। 'মহা তপস্বী' ভরদ্বাজ ভরতকে বলেন "আমি একথাও জানি যে তুমি যে-কোন সামান্য বস্তুতেই সন্তুষ্ট হইবে। তথাপি তোমার সৈন্যগণকে ভোজন করাইতে আমার ইচ্ছা হইতেছে।" এই ইচ্ছার বশে সেই মহাতপস্বী যে আয়োজন করলেন তা বাস্তবিকই লোমহর্ষক। তিনি বিশ্বকর্মাকে আহ্বান করলেন, ইন্দ্র, যম, বরুণ ও কুবের এই চারজন লোকপালকে আহ্বান করলেন, দেব গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের আহ্বান করলেন। মদ্যপানের আয়োজনের জন্য একাধিক সুরাবাহিনী নদীদের গতি পরিবর্তন করিয়ে তথায় নিয়ে এলেন। "পায়সরূপ কর্দমে পূর্ণা নদী সকল"কেও উপস্থিত করালেন। "স্বর্ণ নির্মিত সহস্র সহস্র অন্নপাত্র নিযুত নিযুত ভোজনপাত্র প্রভৃতিতে যে সব আহার্য ও পানীয় পরিবেশিত হল তাদের মধ্যে মৈরয় নামক মদ্য এবং ছাগ মাংস, বরাহ মাংস, মৃগ ময়ূর ও কুক্কুট মাংস এবং আম্র প্রভৃতি ফলের নির্যাস ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু মহাত্মা ভরদ্বাজ শুধুমাত্র ভোজন বিলাসের ব্যবস্থা করলেন না। রতি বিলাসেরও তিনি যে ব্যবস্থা করলেন তার বিবরণে সত্যিই চমৎকৃত হতে হয়। যেমন, "যাহাদের দ্বারা আলিঙ্গিত হইয়া পুরুষ উন্মত্ত হৃদয় হইয়া থাকে তাদৃশ বিংশতি সহস্র রমণী নন্দন বন হইতে সমাগতা হইল।......... অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, পুণ্ডরীকা ও বামনা ভরদ্বাজের আদেশানুসারে ভরতের সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিল।...শিশংপা, আমলকী, জম্বু ও কাননস্থিত অন্যান্য লতা সকল রমণীমূর্তি ধারণ-পূর্বক ভরদ্বাজের আশ্রমে বাস করিতে লাগিল। তাহারা বলিতে লাগিল—মদ্যপানকারিবৃন্দ! তোমরা মদ্যপান কর। ক্ষুধার্তগণ! তোমরা পায়স ও পবিত্র মাংস ভক্ষণ কর, অথবা যাহার যেরূপ ইচ্ছা হয় সেইরূপই ভক্ষণ কর। অনন্তর সাত-আটজন রমণী এক একজন পুরুষকে মনোহর নদীতীরে উদবর্তন করাইয়া স্নাত করাইতে লাগিল। বিশালনয়না বরাঙ্গণাগণ স্নাত পুরুষগণের আর্দ্র-অঙ্গ শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা মার্জিত করিয়া চরণসেবা করত সুধাপান করাইতে প্রবৃত্ত হইল।" (১০)

রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে হনুমানের চোখ দিয়ে রাবণের অন্তঃপুরের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাকে কোন orgy হিসেবে নয়, সেই অন্তঃপুরের যে কোন সাধারণ রজনীর জীবনযাত্রার আলেখ্য হিসেবেই রাখা হয়েছে। "মদ্যপানজন্যপরিশ্রম সময়ে রমণীগণ নিদ্রায় অচেতন হইলে তাহাদের আলুলিত কেশপাশ সুশ্লিষ্ট কোমল মাল্যদাম এবং শ্রেষ্ঠ ভূষণরাজি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। কাহারও তিলক মুছিয়া গিয়াছিল। কাহারও নূপুর পদভ্রষ্ট হইয়াছিল, কোনও প্রধানা রমণীর হারশ্রেণী পার্শ্বদেশে বিগলিত হইয়া পড়িয়াছিল। কেহ বা বিগলিত মুক্তাহার পরিবৃতা, কেহ বা বিগলিত বসনা, কাহারও কাঞ্চীগুণ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। শ্রান্তা নারীগণ বহনক্লিষ্টা ঘোটকীর ন্যায় বিক্ষিপ্তভূষণা হইয়া নিদ্রা যাইতেছিল। অন্য কাহারও কুন্তল ধারণ করাই হয় নাই, কাহারও মাল্য বিমর্দিত হইয়াছিল, তাহাতে তাহারা মহারণ্যে বনহস্তিবিমর্দিত প্রফুল্ল লতার ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিল। কাহারও কাহারও চন্দ্রকিরণের ন্যায় ধবল মুক্তাহার উর্ধ্বদিকে বিক্ষিপ্ত হওয়ায় সেই প্রমদাগণের স্তনমধ্যে সুপ্ত হংসের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। অপর রমণীগণের কাহারও বৈদূর্য্য মনিখচিত হারমালা কলহংসের ন্যায়, কাহারও স্তনমধ্যস্থ হেমহার চক্রবাকের ন্যায় শোভা পাইতেছিল।

হংসকারন্ডবাবিরাজিত, চক্রবাক পক্ষি সুশোভিত নদীর ন্যায় কোন সুন্দরীর জঘন পুলিনের ন্যায় শোভিত হইতেছিল।"(১১)

"অনিন্দ্য সুন্দরী কোন রমণী মদশ্রমকাতরা কৃশোদরী ভুজপাশের মধ্যে কক্ষগত পণবের (নামক বাদ্য যন্ত্রের) সহিত নিদ্রিতা। (পৃষ্ঠদেশে) ডিণ্ডিমসংলগ্না কোন রমণী ডিণ্ডিমকে (ক্রোড়দেশে) আলিঙ্গন করিয়া নিদ্রিত হওয়ায় পতিপার্শ্বে পুত্রক্রোড়ে শায়িতা কামিনীর ন্যায় মনে হইতেছে। পদ্মপলাশনয়না মদমত্তা কোন নারী আড়ম্বর (নামক বাদ্যযন্ত্র) কে ভুজদ্বারা সম্ভোগাবস্থার ন্যায় নিপীড়ন করিয়া প্রসুপ্তা। বসন্তকালে কুসুমসমূহ কর্বুর বর্ণা (জল) পরিমার্জিতা মালার ন্যায় কোন কামিনী আলিঙ্গনপূর্বক (জলসিক্তাবস্থায়) শয়ানা। কোন অবলা স্বর্ণকলসদ্বয়সদৃশ কুচযুগল দ্বারা সমাবৃত করিয়া নিদ্রাভিভূতা। কমলপত্রাক্ষী, পূর্ণচন্দ্রনিভাননা কোন কামিনী অন্য এক নিতম্বিনীকে আলিঙ্গনপূর্বক নিদ্রাবশীভূতা"। (১২)

এই বিবরণ পড়তে পড়তে এই কথাটি মনে না হয়েই পারে না যে রতিসুখের কল্পনায় দেশকালজনিত বহু ব্যবধান সত্ত্বেও কি আশ্চর্য পরিমাণে সমমনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। রাবণের অন্তঃপুরে হনুমান যে সুখের চিত্র দেখেছিলেন তারই অনুরূপ অনেক চিত্র পাওয়া যায় ইসলাম ধর্ম অনুসারী পুণ্যবানদের জন্য রক্ষিত বেহেস্ত-এর বর্ণনায়। ইউরোপের রেনেসাঁস্ পরবর্তী যুগের চিত্রশিল্পীদের অনেক প্রসিদ্ধ চিত্রেই একই ধরণের কামবিলাসের সপ্রশ্রয় প্রতিফলন পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে ফরাসী চিত্রশিল্পী Ingre-এর হারেমের প্রসিদ্ধ চিত্রটির কথা মনে না এসেই পারে না। কেউ যদি বলেন যে Ingre রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের অন্তঃপুর বর্ণনাকেই তাঁর বিষয়বস্তু করেছিলেন তো তাতে আপত্তি করার কোন কারণ থাকবে না।

বাইবেল অনুসারে মানুষের মনে পাপ চিন্তার প্রথম উদয় হয় বিশেষ একটি দিনে ও মুহূর্তে যখন আদম ইভের দ্বারা প্রলোভিত হয়ে একটি আপেল খেয়েছিলেন। এ জাতীয় কোনো উপাখ্যান আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে নেই। কিন্তু আপেল খাওয়ার আগে পর্যন্ত আদমের মন যে রকম নিষ্পাপ ছিল তারই সঙ্গে তুলনীয় সম্পূর্ণরূপে পাপচেতনাহীন মনের অধিকারীর দুইটি উদাহরণ আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে পাই। এই দুইটি কাহিনী অতিশয় মনোরম এবং সেই কারণে জনপ্রিয়। আমি বিভাণ্ডকপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ এবং ব্যাসপুত্র শুকদেবের কথা বলছি। এই দুই মুনিপুত্র স্ত্রী-পুরুষের ভেদ পর্যন্ত জানতেন না। প্রথমোক্তকে প্রলোভিত করার জন্য রাজা লোমপাদ কর্তৃক প্রেরিত বারবণিতাকে সেই মুনিপুত্র কিভাবে ব্রহ্মচারী পুরুষ বলে ভ্রম করেছিলেন, কিভাবে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির রূপ দর্শনে তিনি নির্মল আনন্দবোধ করেছিলেন, কিভাবে সেই নারীর কামোদ্দীপনের বিভিন্ন প্রচেষ্টাকে পরম প্রীতি ও আনন্দের সঙ্গে তিনি গ্রহণ করেছিলেন সেই কাহিনী সকলেরই জানা। (১৩) শুকদেবকে দেখে স্নানরতা নগ্নাবস্থা অপ্সরাগণ কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেনি কিন্তু তাঁর পিতা ব্যাসদেবকে দেখে তারা লজ্জায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং বস্ত্র সংবরণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এর কারণ জিজ্ঞাসা করায় অপ্সরাগণ ব্যাসদেবকে বলে যে তাঁর স্ত্রী-পুরুষ ভেদজ্ঞান ছিল, কিন্তু তাঁর পুত্র শুকদেবের তা ছিল না। (১৪)

এই কাহিনীটি আমার কাছে অতি মোক্ষম রকমের গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। কারণ মহাভারত, অধিকাংশ পুরাণ এবং ঐ শ্রেণীর আরও অনেক শাস্ত্রের রচয়িতা হিসাবে ব্যাসদেবের

নাম খুব বেশী পাওয়া যায়। ব্যাসদেব বলে কোন একজন ব্যক্তি কেউ ছিলেন কিনা এবং সত্যিই তিনি একা এই বিপুল পরিমাণ সাহিত্য সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন কিনা তা আমাদের জানার দরকার নেই। এই সাহিত্যের মধ্যে যে মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে তাই আমাদের আলোচনার বিষয়। এই মানসিকতা যে পাপচেতনাহীন ছিল না সেই কথাটি স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে বলা হল আর কারো মুখ দিয়ে নয় কয়েকটি অপ্সরার মুখ দিয়ে। ব্যাসদেবের নামে যে আদর্শ প্রচার করা হয়েছে মহাভারতে, পুরাণগুলিতে এবং গীতায় সে আদর্শের অনুসরণ কেউ করে থাকলে সে ঐ এক ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব। স্বয়ং ব্যাসদেব অন্যান্য সব মুনিঋষিদের মতনই আদর্শ প্রচার এবং আদর্শ অনুসরণের মধ্যে অলঙ্ঘ্য ব্যবধান রেখে চলতেন। তাঁরও রেতঃস্খলন ঘটাতে ঘৃতাচীকে দর্শন দিতে হয়েছিল মাত্র। (১৫) বিভাণ্ডক মুনিরও উর্বশীকে নয়নগোচর করা মাত্রই রেতঃস্খলন ঘটেছিল। (১৬)

৩

বস্তুত প্রাচীন সাহিত্যে এমন কোন পর্বই খুঁজে পাওয়া যাবে না যার আগে পর্যন্ত মনের সব প্রকাশই আপেল খাওয়ার আগের আদমের মনের মত অনাবিল পাপবোধহীন। প্রাচীন সাহিত্যে পাপচেতনার উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি পাশাপাশি অবস্থান করে। এই এককালীন পাপচেতনার উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি একটি নৈতিক অন্তর্দ্বন্দ্ব। অপর যে দ্বৈতভাব এই প্রাচীন সাহিত্যের কাম সম্বন্ধীয় মনোভাবকে চিহ্নিত করে তা একই কালে কামকে বর্জনীয় ও অলঙ্ঘনীয় মনে করা। কামের শক্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রকারদের ধারণা মাত্রাতিরিক্ত ছিল। শিব-পুরাণে বলা হয়েছে, "সেই কাম অন্যের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া সকলকে আপনার অধীন করত ত্রিজগৎ মধ্যে জয়লাভ করিয়াছেন"। (১৭) এবং কন্দর্প নিজে গর্বভরে ইন্দ্রকে বলেছে, "মনুষ্যের নিপাতনে তো আমার কিঞ্চিন্মাত্রা চিন্তা হয় না। আপনার বজ্র বা অন্যান্য নানাবিধ অস্ত্র দূরে থাকুক. হে প্রভো! আমি মিত্র থাকিতে ঐ সকল অস্ত্রের প্রয়োজন কি? আমি আর কাহাকেও গণনা করি না"। (১৮) কামশরে পীড়িত হয়ে মুনিঋষিদের হামেশাই রেতঃস্খলন তো ঘটতই। কিন্তু কামপীড়া এমনই হত যে জীবন সংশয়ও ঘটত। দেখুন নাগকন্যা উলুপীর অর্জুনকে দেখে কি অবস্থা হয়েছিল যে সে এভাবে কামভিক্ষা করল. "আমার পরিত্রাণের দ্বারা আপনার ধর্ম লোপ হইবে না। যদি আপনার ধর্মের সামান্য ব্যতিক্রম হয়, তাহা হইলেও অর্জুন! আমার প্রাণরক্ষার দ্বারা আপনার মহাপুণ্য হইবে। প্রভো! আমি আপনার ভক্তা, আপনি আমাকে রতিদানের দ্বারা ভজনা করুন! পার্থ! আর্তকে রক্ষা করা সৎপুরুষগণের ধর্ম"। (১৯) বুঝে দেখুন, আর্তের পরিত্রাণও তো ধর্ম, তাকে লঙ্ঘন করা যায় কি করে ব্রহ্মচর্যব্রতের নামে?

কামের এমনই শক্তি দেখান হয়েছে যে এই ঘোর কলিকালের আমাদের মত অত্যন্ত সাধারণ এবং অধম, ষড়্‌রিপুর তাড়নায় লাঞ্ছিত স্ত্রী-পুরুষেরা ভাবতেও পারব না যে ধরনের দুর্বলতার কথা সেই ধরনের দুর্বলতার কাছে পদে পদে আত্মসমর্পণ করতেন সেই সব দেবতা ও মুনিঋষিরা যাঁরা সর্বদাই জিতেন্দ্রিয় ও ঊর্ধ্বরেতা হওয়ার মাহাত্ম্য প্রচার করতেন। এবং এই দুর্বলতার দরুন এমন এমন কাজ তাঁরা অনায়াসে করে বসতেন যার শতভাগের

একভাগ করলেও আজকালকার দিনের সভ্য সমাজের ছাত্রছাত্রীদের কান ধরে কলেজ থেকে বার করে দেওয়া হবে, চাকুরিয়াদের চাকুরী নিয়ে টানাটানি হবে, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে জেল খাটারও সমূহ সম্ভাবনা থাকবে।

ইন্দ্র, বরুণ, বায়ু, মিত্র ও অশ্বিনীদ্বয় প্রমুখ বৈদিক দেবতাদের ব্যাপক লাম্পট্যের প্রসঙ্গ তুলবই না। এঁদের লাম্পট্য কোন নৈতিক সমস্যার উত্থাপন করে না। কেন না ভারতবাসীর নৈতিক ধ্যান-ধারণার সঙ্গে এ'দের কোন যোগ বৈদিককালে থেকে থাকলেও পরবর্তীকালে তা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়েছে। কিন্তু ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তো পরবর্তীকালের হিন্দু ধর্মের স্তম্ভ স্বরূপ। এ'দের (বিষ্ণুর ক্ষেত্রে কৃষ্ণাবতার রূপে) আচরণ এতই ন্যক্কারজনক যে পরবর্তীকালের হিন্দুধর্ম অধুনাকাল পর্যন্ত যে নৈতিক অন্তর্দ্বন্দ্বে সাংঘাতিকভাবে বিভক্ত হয়ে থাকবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। ব্রহ্মার তো বদ অভ্যাসই ছিল কামপীড়িত হয়ে উদগতেন্দ্রিয় অবস্থায় নারীদের ধাওয়া করা। একবার তিনি এই অবস্থায় উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁরই আত্মজা সন্ধ্যার সম্পর্কে। (২০) ঐ উপলক্ষ্যে মহাদেব নিজের অসংখ্য কীর্তিকলাপের কথা স্রেফ্ ভুলে গিয়ে ব্রহ্মাকে প্রচণ্ড তিরস্কার করে লজ্জা দেন। (২১) দ্বিতীয় এক উপাখ্যানে ব্রহ্মা এই একই অবস্থায় উপনীত হয়েছিলেন "সুরসুন্দরী সদৃশী অতি সুরূপা যুবতী অমোঘ"-কে দেখে। (২২)

কিন্তু ব্রহ্মাও বেদ-পরবর্তী যুগের হিন্দুধর্মে তেমন গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেন না। সেই স্থান অধিকার করে আছেন হর ও হরি। শিব ও বিষ্ণু। ব্রজের কৃষ্ণ গোপিনীদের সঙ্গে যে কাণ্ডকারখানা করেছিলেন সেটা সুপরিচিত। ঐ সমস্ত ব্যাপারটাকে আত্মা ও পরমাত্মার লীলা হিসাবে দেখানোর প্রচেষ্টা অবশ্যই এক বিকৃত মানসিকতার পরিচায়ক। কিন্তু মহাদেবও খুব কম যেতেন না। মহাভারতে ও বিভিন্ন পুরাণে তাঁর যে কামপরায়ণতা বর্ণিত হয়েছে তা রুচির বিচারে অনেক সময়ই বেশ স্থূল। এবং দার্শনিক তত্ত্বের চুলচেরা বিচার ঢুকিয়ে তাকে ঊর্ধ্বস্তরের আর কিছু প্রতিপন্ন করার চেষ্টাও করা হয়নি। শিবপুরাণ তো শৈবদেরই ধর্মগ্রন্থ বিশেষ। শিবের মাহাত্ম্য প্রচারই এই পুরাণের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু এই পুরাণেই প্রচণ্ড উৎসাহ সহকারে মহাদেবের যেসব রতিবিলাসের কাহিনী বিবৃত হয়েছে তাদের মধ্যে মহাদেবের আচরণে সংযমের অভাব, শালীনতার অভাব এবং সাধারণভাবে সম্ভ্রমের অভাবের মাত্রা আধুনিক মনের পাঠককে বিস্মিত না করেই পারে না। অসংখ্য উপাখ্যানের থেকে যে কোন একটি উপাখ্যান নিয়ে দেখা যাক। একদা বানাসুর নগরে বাস করার কালে "ভগবান চন্দ্রশেখর ক্রীড়া করিতে করিতে অনির্জিত কামদেব কর্তৃক উন্মাদিত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে নন্দীকে আদেশ করিলেন, হে বানরানন ! তুমি আমার আদেশ অনুসারে কৈলাস পর্বতে গমন করিয়া কৃতমণ্ডনা গৌরীকে আমার নিকট শীঘ্র আনয়ন কর।'' নন্দীর কৈলাস পর্বতে গিয়ে পার্বতীকে সজ্জিত করে আনতে যেটুকু সময় লাগল মহাদেবের কিন্তু সেইটুকুও তর সইল না। "তৎকালে ত'াহার কামপীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল" এবং ত'ার কষ্ট দূর করবার জন্য অপ্সরাগণ মন্ত্রণা করে সকলে ছদ্মবেশ ধারণ করলেন। চিত্রলেখা স্বয়ং গৌরীর রূপ ধারণ করলেন। ঘৃতাচী কালীরূপ, বিশ্বাচী চণ্ডিকা রূপ, প্রম্লোচী সাবিত্রী রূপ, মেনকা গায়ত্রীরূপ, সহজন্যা জয়ারূপ, পুঞ্জিকস্থলী বিজয়ারূপ এবং ক্রতুস্থলী বিনায়করূপ ধারণ করলেন এবং সকলে মিলে নানারূপ কামক্রিয়ার দ্বারা মহাদেবের সন্তোষ বিধান করলেন। (২৩)

দেবদারু বনে মুনিপত্নীদের সঙ্গে মহাদেবের আচরণের যে বিবরণ পাওয়া যায় সে তো আরও সাংঘাতিক। অনেকাংশে তা শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ঃ "দারুবনবাসী মুনিগণ শ্রদ্ধা সহকারে সকাম ধর্ম আচরণ করিতেছেন কিনা, সকৌতুকে তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য এবং দেবদারু বনস্থ সকাম ধর্মচারীদিগের নিষ্কাম ধর্মানুরাগ প্রতিষ্ঠার্থ ভগবান শঙ্কর বিকৃতরূপ ধারণ করিয়া অর্থাৎ দিগম্বর, বিষম লোচন, সুন্দর দ্বিহস্ত কৃষ্ণাঙ্গ হইয়া দিব্য দারুবনে প্রবেশ করিলেন...পতিব্রতা কামিনীগণও বনমধ্যে বিকৃতরূপধারী পুরুষরূপী মহাদেবকে দর্শন করিয়া সমাদরে তাঁহারই অনুগমন করিল। বনস্থ পর্ণকুটির দ্বারস্থিত এবং বৃক্ষ-বাটিকালম্বিনী রমণীগণ তাঁহার মুখারবিন্দে হাস্য দর্শন করত গলিত বস্ত্র ও পতিতাভরণা হইয়া চেষ্টান্তর পরিত্যাগ পূর্বক তাহারই অনুগমন করিল। কেহ কেহ স্বভাবতঃ বিলাস শূন্য হইলেও তাঁহাকে অবলোকন করত কামমদে ঘূর্ণিত লোচন হইয়া ভ্রূবিলাস প্রকটিত করিতে লাগিল। অনন্তর কোন কোন কামিনী তাঁহাকে অবলোকন করিয়া সুস্মিত বদনে গান করিতে আরম্ভ করিল। তাঁহাদিগের বসন অল্প অল্প স্খলিত ও কটিভূষণ গলিত হইতে লাগিল। কোন কোন বিপ্রাঙ্গনা তখন তাঁহাকে বনমধ্যে অবলোকন করত মদোন্মত্তা হইয়া স্বীয় স্বীয় বিচিত্র বলয় ও বন্ধুজন পরিত্যাগপূর্বক গমন করিতে লাগিল। তৎকালে তাহাদিগের নববসন স্খলিত হইল। (২৪)

উপরিউক্ত বিবরণটি 'লিঙ্গপুরাণ' থেকে নেওয়া। 'শিবপুরাণে' এই একই ঘটনার বিবরণ আরও অনেক দীর্ঘসূত্রভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন "শুভা সাধ্বী বশিষ্ঠপত্নী 'অরুন্ধতী' ব্যতিরেকে বালিকা, যুবতী এবং বৃদ্ধা সকলেই কামাতুরা হইয়াছিল"। (২৫) "তাহারা কখন ভ্রমণ করিতে লাগিল, কখন হাসিতে লাগিল, কখন পড়িতে লাগিল, কখন হাই তুলিতে লাগল, কখন ভয় প্রকাশ করিতে লাগিল, কখন শাপ দিতে লাগিল, কখন শব্দ, কখন রোদন করিতে লাগিল"। (২৬) আর স্বয়ং মহাদেব সম্বন্ধে বলা হয়েছে "ভগবান বিরূপাক্ষ এইরূপে গান করিতে করিতে কোন স্থানে নৃত্য করিতে লাগিলেন। কোথাও অত্যন্ত হাস্য করিয়া, লম্ফ প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন; কোন স্থানে প্রমথদিগের সহিত বন্য ফল-মূল ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন"। (২৭) এই বিবরণ যে স্থানবিশেষে কতটা অশালীন হয়ে উঠেছে তার একটা উদাহরণ সংস্কৃতেই দেওয়া যাকঃ "ঈশৎ সন্দর্শয়েয়ুশ্চ গোপান্যঙ্গানি তস্য তাঃ"। (২৮) এখানে লক্ষণীয় যে নিষ্কাম ধর্মানুরাগ প্রতিষ্ঠার জন্য এরূপ বেলেল্লাপনার প্রয়োজন ছিল এ জাতীয় অবিশ্বাস্য কোন কু-যুক্তি শিবপুরাণে দেওয়া হয়নি। বরং বলা হয়েছে, "গোপিকারূপধারিনী মাতৃগণের সহিত পরিশোভিতা গৌরী সকৌতুহলে স্ত্রীলম্পট ভর্তার পরস্ত্রী সমাগম; মুনিপত্নীদিগের দুঃশীলতা এবং সাধ্বী স্ত্রীদিগের ধৈর্যদর্শনের নিমিত্ত অল্পে অল্পে দেবদারুবনে গমন করিলেন"। (২৯) লক্ষণীয় যে মহাদেবকে শিবপুরাণেই স্ত্রীলম্পট ('স্ত্রীলম্পটম্') বলে বর্ণনা করা হচ্ছে— শুধু এখানেই না আরও অনেক জায়গাতেই। ভর্তার এই লাম্পট্য কিন্তু গৌরীর কোন বিরাগের কারণ ঘটায় না। তাঁর মনোভাবে ছিল শুধু কৌতুহল ও কৌতুকবোধ।

এই বিবরণ থেকে তৎকালের মুনিপত্নীদের সংযম কতটা ছিল না ছিল তার খানিকটা পরিচয় পাওয়া যায়। স্পষ্টতই অপ্সরা ও বারাঙ্গনাদের চেয়ে মুনিপত্নীরা অনেক বেশী কামাতুর ছিলেন। বারাঙ্গনা ও অপ্সরারা যা করত সে তো তাদের সমাজ নির্দিষ্ট কর্তব্য। কিন্তু

মুনিপত্নীরা যে প্রায়শই মোহাবিষ্ট হয়ে পরপুরুষ গমন করতেন তার উদাহরণ এই সাহিত্যে ভূরি পরিমাণ। এই একই দারুবনের উপাখ্যানে মুনিপত্নীদের মুখ দিয়ে বলা হয়েছে, "তুমি ভিক্ষা করিয়ো না, চক্ষুর্বয় উন্মীলন করত আমাদিগের শরীরের ও স্তনের লাবণ্য-দর্শন কর। আমরা পরস্ত্রী, আমাদিগের স্বামী অতি বৃদ্ধ, পরমসাধু, অস্থি চর্মাবশিষ্ট এবং ব্রাহ্মণ"..."সকাম বা নিষ্কাম যুবাদিগের পরস্ত্রী সমাগমই অভিপ্রেত"। (৩০)

কিন্তু মুনিপত্নীদের কথা না হয় ছেড়ে দেওয়া যাক। তাঁরা তো জিতেন্দ্রিয়, স্থিতপ্রজ্ঞ, ঊর্ধ্বরেতা ইত্যাদি হওয়ার আদর্শ প্রচার করেননি। যাঁরা করেছিলেন তাঁদের একজন মহর্ষি ভরদ্বাজ। "তিনি যজ্ঞ দীক্ষিত হইয়া একদা মহর্ষিগণ সমভিব্যহারে গঙ্গায় প্রাতঃস্নান করিতে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে অপ্সরোগ্রগন্যা ঘৃতাচী স্নান করিয়া তীরে উঠিতেছিল, দৈবাৎ বায়ুবেগে তাঁহার গাত্রবসন উড্ডীন হইল। মহর্ষি সেই সুরূপা নবযৌবনা মদদৃপ্তা অপ্সরাকে বিবসনা দেখিয়া কামশরে জর্জরিত কলেবর হইলেন। দুর্জয় কুসুমায়ুধের দুঃসহ প্রভাবে তপোধনের রেতঃ স্খলিত হইল"। (৩১) মোটামুটি এই একই ধরণের উপাখ্যান শত শত জায়গায় পাওয়া যায়। এখানে যেমন ভরদ্বাজ ও ঘৃতাচী অন্যত্র তেমনি দধিচী ও অলম্বুষা, বিশ্বামিত্র ও মেনকা বা বেদব্যাস ও ঘৃতাচী। এইসব উপাখ্যানের মধ্যেও কিন্তু দধিচীকে "অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয়" (৩২) বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বিশ্বামিত্র "অগ্নিসম তেজস্বী ধর্মাত্মা মহাতপাঃ"। (৩৩) শরদ্বান "অসাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন তপস্বী"। (৩৪) ভরদ্বাজ "দৃঢ়ব্রত মহর্ষি"। (৩৫) এইসব বিশেষণের ব্যবহার এবং উপাখ্যানে বর্ণিত আচরণের মধ্যে যে ব্যবধান তা শাস্ত্রকারদের এতটুকুও অস্বস্তির কারণ ঘটায়নি। শরদ্বানের সম্বন্ধে বলা হয়েছে তিনি এতই বিচলিত হয়েছিলেন যে তাঁর "নয়নদ্বয় বিকশিত হইয়া উঠিল, হস্ত হইতে ধনুর্বাণ ভূতলে পতিত হইল, এবং বাতচালিত কদলী পত্রের ন্যায় সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল"। (৩৬) বিশ্বামিত্র সম্বন্ধে বলা হয়েছে "তপ জপ প্রভৃতি সমস্ত ধর্মকর্মের জলাঞ্জলি প্রদানপূর্বক দিনযামিনী কেবল সেই কামিনীর সহিত ক্রীড়া করত পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন"। (৩৭) বেদব্যাস সম্বন্ধে বলা হয়েছে ঘৃতাচীকে দেখার পর তিনি "বিশেষরূপ ধৈর্যাবলম্বনপূর্বক কাম নিবারণের চেষ্টায় অরণি মন্থন করিতে লাগিলেন কিন্তু কোন মতেই চঞ্চল চিত্তকে সুস্থির করাইতে পারেন নাই"। (৩৮)

৪

এই জাতীয় উপাখ্যানগুলির মধ্যে দুইটি বিষয় লক্ষ্য করে দেখবার মত। এক, মুনি ঋষিদের ক্ষেত্রে এ জাতীয় ইন্দ্রিয়দের কাছে পরাভব স্বীকার করাটা হয়তো ব্যতিক্রমস্থানীয় ছিল। তাঁরা তো বাঁচতেন সহস্র সহস্র বা অযুত নিযুত বৎসর। বেশির ভাগ সময়টা বোধহয় তাঁরা জিতেন্দ্রিয় ও ঊর্ধ্বরেতাই থাকতেন। হঠাৎ কখনও বা তাঁদের পদস্খলন ঘটত। কিন্তু দেবতাদের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য নয়। কামপরায়ণতা মনে হয় তাঁদের স্বভাবগত ছিল। মহাদেবের কামুকতা ব্যতিক্রম ছিল না। সেটাই ছিল নিয়ম। ব্রজের কৃষ্ণ সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। দ্বিতীয় যে ব্যাপারটা লক্ষণীয় তা এই যে পুরুষ দেবতাদের

চরিত্রে যে উচ্ছৃঙ্খলতা কল্পনা করা হয়েছে দেবীদের ক্ষেত্রে তা হয়নি। সাধারণ সুরপত্নীদের কথা বলছি না। দুর্গা, কালী, উমা, সতী ইত্যাদি বিভিন্নরূপে যে একই পরমাশক্তির প্রকাশ আমাদের ধর্মে, বিশেষ করে তার শাক্ত বিভাগে, গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে তাঁদের মধ্যে প্রায় কখনই কোন প্রকার সংযমহীন কামপরায়ণতার উদাহরণ পাওয়া যায় না। মহাদেবের সম্পর্কে পার্বতীর কামভাবকে অবশ্যই যতদূর সম্ভব বিশদ ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবেই বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এই বৃহৎ সাহিত্য যাতে যুগে যুগে বহু বিভিন্ন লেখনীর রুচি অনুযায়ী বহু বিষয় পরিবর্তন করা হয়েছে এবং অনেক বিষয় যোগও করা হয়েছে, তার মধ্যেও কোথাও পার্বতীকে মহাদেব ব্যতীত অন্য কোন পুরুষে আসক্ত দেখানো হয়নি, দেবদারু বনের ঐ মুনিপত্নীদের মতো কামাবেগে তাড়িত হতেও দেখানো হয়নি। বৈদিক দেবী ঊষা এবং পরবর্তীকালে সরস্বতী সম্বন্ধেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। এঁদের আচরণ বর্ণনায় শাস্ত্রকারেরা চূড়ান্ত সংযম ও শালীনতা বোধের পরিচয় দিয়েছেন। লক্ষ্মী যেহেতু একটু চঞ্চলা এক-আধসময়ে যে তিনি একটু ফষ্টিনষ্টি করেন নি তা বলা যায় না। একটি উপাখ্যানে দেখা যাচ্ছে আরও কয়েকজন সুরপত্নীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনিও একবার পরকীয়া প্রেমে মজেছিলেন। "অনন্তর যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে সোমদেবকে অলৌকিক রূপ-লাবণ্য সম্পন্ন দেখিয়া নয়জন দেব-যুবতী কাম-বাণে বিদ্ধগাত্র হইয়া তাঁহার সেবাপরায়ণ হইলেন। তখন লক্ষ্মী স্বীয় পতি নারায়ণকে সিনীবালা কর্দমকে, দ্যুতি বিভাবসুকে, তুষ্টি ধাতাকে, প্রভা প্রভাকরকে, কুহূ হবিষ্মানকে, কীর্তি জয়ন্তকে, বসু কশ্যপকে ও ধৃতি নন্দীকে পরিত্যাগ করিয়া সোমকে ভজনা করিতে লাগিলেন"। (৩৯) কিন্তু এই উপাখ্যানটি বোধহয় খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। লক্ষ্মী যখন নিজ মর্যাদায় পূজিত হন তখন তাঁর সেই রূপের মধ্যে অসংযত সম্ভ্রমহীন আচরণ একেবারেই রাখা হয়নি।

এই বিষয়টি আমার কাছে বেশ খানিকটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। এমন না যে শাস্ত্রকারেরা মনে করতেন যে পুরুষদের চেয়ে নারীরা কামের ব্যাপারে অধিকতর চরিত্রের অধিকারিণী। ঠিক তার বিপরীত। নারীরা যে অত্যধিক পরিমাণে কামপ্রবণ একথা আমাদের শাস্ত্রে সর্বত্রই খুব স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে। এমন ভাষায় এবং এমন অশ্রদ্ধার সঙ্গে যে সাধারণভাবে প্রাচীনপন্থী লোকেদের পক্ষেও ঐ নারী নিন্দাকে মেনে নেওয়া কঠিন। এটি একটি জটিল প্রশ্ন কেন এই নারী নিন্দুক শাস্ত্রকারেরা প্রধান দেবতাদের ক্ষেত্রে পুরুষদের সীমাহীন লাম্পট্যের দ্বারা চিহ্নিত করেছেন কিন্তু প্রধানা দেবীদের চিত্রিত করেছেন মহিমা ও মর্যাদার সঙ্গে।

মহাকাব্য ও পুরাণগুলির রচয়িতাদের চোখে কাম এতই শক্তিশালী ছিল যে তাঁদের মতানুসারে ইন্দ্রিয়বিকার নিরোধে সমর্থ হয়েছিলেন মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন ঋষি যাঁদের মধ্যে ছিলেন ক্রতু. বশিষ্ঠ, পুলস্ত্য, অঙ্গিরা এবং মরীচি প্রভৃতি অপর ছয়জন ঋষি। (৪০) (সপ্তর্ষিদেরও সকলে এই পরীক্ষায় পাশ করতে পারেননি—যেমন দধিচী)।

কিন্তু কামের কাছে আত্মসমর্পণের ব্যতিক্রমও পাওয়া যায়। দুর্লভ বলেই এই ব্যতিক্রমের কাহিনীগুলি উল্লেখযোগ্য। বপু নামক অপ্সরার দুর্বুদ্ধি হয়েছিল, গিয়েছিল দুর্বাসা মুনির তপোভঙ্গ করতে। ব্যর্থ তো হতে হয়েই ছিল, উপরন্তু শাপগ্রস্ত হয়ে বেচারীকে পক্ষিদশা প্রাপ্ত হতে হয়েছিল। (৪১) বরূথিনী নাম্নী অপ্সরার কোন ব্রাহ্মণ

তনয়কে দেখে কামাবেগ হয়। কিন্তু সেই মুনিশ্রেষ্ঠ তাকে মোটেই পাত্তা দেননি। (৪২) যত্রতত্র কথায় কথায় প্রেমে পড়ে যেতো যে অর্জুন সে হঠাৎ উর্বশীর মত বিশ্ববিজয়িনীকে উপেক্ষা করে বসল। কারণটা অদ্ভুত। নিতান্ত আহাম্মকের মত সে উর্বশীকে "আপনি আমার জননীতুল্য" ইত্যাদি বলে প্রণামাদি করতে শুরু করল। উর্বশী তাকে কিছুতেই বুঝিয়ে উঠতে পারে না যে সে কখনও তার মাতৃস্থানীয়া হতে পারে না। "আমরা অপ্সরাগণ সকলেই অনিয়ন্ত্রিত...পুরু বংশের যে সকল পুত্র পৌত্র বা অন্যান্য লোক তপোবলে এখানে আসিয়াছেন তাঁহারা সকলেই আমাদের সহিত রমণ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহাদের কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই"। (৪৩) কিন্তু এসব কথা শোনার পরও অর্জুন তাকে মাতৃ সম্বোধন করতেই থাকলে উর্বশী যখন তাকে শাপ দিয়ে নপুংসক করে দেয় তখন সেটাকে খুব অন্যায় বলে আমাদের মনে হয় না।

৫

এইসব ব্যতিক্রমের উপাখ্যানের চেয়েও রতি সংযমের ব্যাপারে যাঁর উদাহরণ আমার কাছে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক মনে হয় তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং রাবণ। আমার কাছে খুবই আশ্চর্য মনে হয় যে এই সংযমের জন্য রাবণের যে প্রশংসা প্রাপ্য তা প্রাচীন সাহিত্যেও তাঁকে দেওয়া হয়নি, অধুনাকালেও এই অবিচারটা কারও মনোযোগ আকর্ষণ করেনি। রাবণের রাজপুরীতে বন্দিনী অবস্থায় সীতা কতকাল বাস করেছিলেন কিন্তু কামুক হিসাবে অতিনিন্দিত ঐ রাবণ তাঁর বিন্দুমাত্র অসম্মান করেননি। এই সম্পর্কে ব্যাখ্যা হিসাবে বলা হয়েছে যে রাবণের কোন মহত্ত্বের পরিচয় এর মধ্যে নেই কেননা রাবণকে শাপ দেওয়া হয়েছিল যে তিনি যদি কোন নারীকে তার অনিচ্ছায় গ্রহণের চেষ্টা করেন তো তাঁর মস্তক শতধা বিদীর্ণ হবে। (৪৪) কিন্তু পাণ্ডুর উপরেও তো একই ধরনের শাপ দেওয়া ছিল। স্ত্রী সম্ভোগ করতে গেলেই মৃত্যু বরণ করতে হবে এই শাপের দরুন বেচারী পাণ্ডুরাজকে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে বাঁচতে হচ্ছিল। কিন্তু একদা বসন্ত ঋতুতে কামাবেগ তিনি আর সংবরণ করতে পারলেন না। মাদ্রীর শাপের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে নিবারণ করার চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি কিভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন সে কাহিনী সকলেরই জানা। কামের কাছে আত্মসমর্পণ করে মৃত্যু বরণ না করলেও বাঘা মুনিঋষিরা কিভাবে ইন্দ্রত্ব বা অন্যান্য তুলনীয় ঈপ্সিত বস্তু, যার জন্য তাঁরা শতসহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করেছিলেন, তার থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন তার অগণিত কাহিনীতে, মহাকাব্য ও পৌরাণিক সাহিত্য ভরা। এই পটভূমিকায় রাবণের আত্মসংবরণের মহত্ত্ব অনস্বীকার্য। রাবণ যে সংসারত্যাগী মুনিঋষি ছিলেন না, তিনি যে অতিরিক্ত রকমেই ইন্দ্রিয়বিলাসী ছিলেন সেই কারণে তাঁর প্রশংসা আরও বেশী করেই প্রাপ্য বলে মনে হয়। গীতায় এবং অন্যান্য সর্ব স্তরের ধর্মের আলোচনায় যে আদর্শকে চূড়ান্ত মূল্য দেওয়া হয়েছে তা তো ইন্দ্রিয়দের নিগ্রহ করার নয়। তা ইন্দ্রিয়দের সংযমে রাখার। ইন্দ্রিয়দের দাস না হয়ে ইন্দ্রিয়দেরকে দাস করে রাখতে পারলে ইন্দ্রিয়চর্চায় আমাদের ধর্মশাস্ত্রে কোনো দোষ দেখা হয়নি। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখলে যেসব মুনিঋষিরা সহস্র বৎসর যাবৎ কঠোর তপস্যা করতেন এবং কখনও মেনকা, কখনও রম্ভা,

কখনও ঘৃতাচী, কখনও উর্বশী প্রভৃতিদের দেখে তৎক্ষণাৎ কামপীড়িত হয়ে পড়তেন তাঁদের তুলনায় রাবণ, যিনি বহু ভার্যাদের নিয়ে পরম তৃপ্তিতে কামক্রীড়া করতেন কিন্তু যিনি সংযম হারিয়ে মাত্রা অতিক্রম করতেন না তাঁকে অনেক শ্রেয় বলে মনে হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে রাবণ শুধু সীতার সঙ্গেই সৎ ব্যবহার করেননি। তিনি যাঁদের তাঁর বিলাসের সহচরী করতেন তাঁদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে 'রাজর্ষি, ব্রাহ্মণ, দৈত্য, গন্ধর্ব এবং রাক্ষসকন্যাগণ তাঁহার কামবশবর্তিনী হইয়াছিল। সেই সমস্ত প্রমদা যুদ্ধাভিলাষে রাবণ কর্তৃক হৃতা হইয়াছিল। কতকগুলি মদমত্তা মদন কর্তৃক মোহিতা হইয়াই তাঁহার নিকট সমাগতা হইয়াছিল। বীর্যবান রাবণ বলাৎকার করিয়া কোন প্রমদাকে হরণ করিয়া তথায় আনেন নাই। কেহ রাবণের পরাক্রমে, কেহবা সৌন্দর্যাদি গুণে মুগ্ধা হইয়াছিল—যাঁহারা পূর্বেই পরপুরুষ সমাসক্তা হইয়াছিল বা স্বামিত্বে বরণ করিয়াছিল—জনকাত্মজা সীতা ব্যতীত অন্য কোন রমণী রাবণ কর্তৃক হৃতা হয় নাই''। (৪৫)

আমরা এবার আমাদের বক্তব্যকে গুটিয়ে আনব। হিন্দু ধর্মাদর্শে কামকে সহজ, সরল, সুন্দরভাবে জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে, এই প্রস্তাবটা একেবারেই মানা যায় না। অন্যান্য অনেক সভ্যতার মতনই হিন্দু সভ্যতাও কামের ব্যাপারে এক মনোবৈকল্য দ্বারা আক্রান্ত যে বৈকল্যের ইংরেজী নাম obssession। এটি এমন একটি বিষয় যার সঙ্গে আমাদের সভ্যতা কোন দিন কোন সন্ধি স্থাপন করে উঠতে পারেনি। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে যেসব নিয়মে সমাজকর্তারা বেঁধে রাখতে চেয়েছেন কামের দরুণ তারা প্রায়ই ভেঙ্গে পড়ে যায়। এই কারণে সমাজকর্তারা অনেক সময়ই কাম জিনিসটাকে একেবারে নিশ্চিহ্নই করে দিতে চেয়েছেন। কিন্তু এও তাঁরা দেখলেন যে কামকে মানুষের মন থেকে উৎপাটিত করার প্রচেষ্টা বিফল হতে বাধ্য। এই সত্যটিকে সাধারণভাবে স্বীকার না করে নিয়ে তাকে প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী এক শক্তি হিসেবে মনে করে নেওয়া হল। এবং এই প্রচণ্ড শক্তিকে অতিক্রম করতে পারাকেই দেওয়া হল চরম মূল্য। তারই ফলে জন্ম নিল সেই দ্বৈতভাবের যার একদিকে কাউকে ঊর্ধ্বরেতা বলাই যেন তার সবচেয়ে বড় প্রশংসা করা। অপরদিকে যাঁদের ঊর্ধ্বরেতা বলে বর্ণনা করা হচ্ছে তাঁদেরই একইকালে অত্যন্ত কামাতুর হিসাবে দেখানো।

অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ যে অন্য এক দ্বৈতভা। এই নৈতিক চিন্তাকে চিহ্নিত করে তা এই যে স্পষ্টতই নীতিবাগীশ শাস্ত্রকারেরা মানুষজাতিকে দুইভাগে ভাগ করে দেখতেন। সাধারণ মানুষ এবং অতি মানুষ—superman। মুনি-ঋষিরা ছিলেন superman। নীতি তাঁদের জন্য নয়। তাঁরা নীতির ঊর্ধ্বে। নীতি সাধারণ লোকের জন্য। কিন্তু নীতি প্রচার করাটাই ছিল supermanদের কাজ। তাঁরা যে নীতি প্রচার করতেন অবলীলাক্রমে তাঁরা তা লঙ্ঘন করতেন এবং তাঁরাই যেহেতু শাস্ত্রকার শাস্ত্রগুলি এই নীতির ব্যাপারে অন্তর্দ্বন্দ্বে একেবারে জর্জরিত।

উদ্ধৃতি-নির্দেশক

১। S. K. De., Ancient Indian Erotics and Erotic Literature

২। এই গ্রন্থ, ৫ম অধ্যায়
৩। এই গ্রন্থ, ২য় অধ্যায়
৪ মৎস্যপুরাণ, অধ্যায় ২০৯
৫ শ্রীমদ্ভাগবত, চতুর্থ স্কন্ধ, অধ্যায় ২৫
৬ দেবীভাগবৎ, দ্বিতীয় স্কন্ধ, অধ্যায় ৫
৭ কালিকাপুরাণ, অধ্যায় ৪৯
৮ মহাভারত, অনুশাসন পর্ব, অধ্যায় ১৯
৯ রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড সর্গ, ৯১
১০ ঐ
১১ রামায়ণ, সুন্দর কাণ্ড, সর্গ ৯
১২ রামায়ণ, সুন্দর কাণ্ড, সর্গ ১০
১৩। রামায়ণ, আদিকাণ্ড, সর্গ ১০ (এবং অন্যান্য অনেক)
১৪। শ্রীমদ্ভাগবত, প্রথম স্কন্ধ, অধ্যায় ৪ (এবং অন্যান্য অনেক)
১৫। মহাভারত, শান্তিপর্ব, উত্তরার্ধ, অধ্যায় ৩২৫
১৬। মহাভারত, বনপর্ব, অধ্যায় ১১০
১৭। শিবপুরাণ, ধর্মসংহিতা, অধ্যায় ১১
১৮। শিবপুরাণ, জ্ঞান-সংহিতা, অধ্যায় ১০
১৯। মহাভারত, আদিপর্ব, অধ্যায় ২১৩
২০। কালিকাপুরাণ, অধ্যায় ২
২১। ঐ
২২। কালিকাপুরাণ, অধ্যায় ৮২
২৩। শিবপুরাণ, ধর্মসংহিতা, অধ্যায় ৭
২৪। লিঙ্গপুরাণ, পূর্বভাগ, অধ্যায় ২৯
২৫। শিবপুরাণ, ধর্মসংহিতা, অধ্যায় ১০
২৬। ঐ
২৭। ঐ
২৮। ঐ
২৯। ঐ
৩০। ঐ
৩১। মহাভারত, আদিপর্ব, অধ্যায় ১৩০
৩২। মহাভারত, শল্যপর্ব, অধ্যায় ৫২
৩৩। রামায়ণ, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, অধ্যায় ৩৫
৩৪। মহাভারত, আদিপর্ব, অধ্যায় ১৩০
৩৫। ঐ
৩৬। ঐ
৩৭। মহাভারত, আদিপর্ব, অধ্যায় ৭৪
৩৮। মহাভারত, শান্তিপর্ব, উত্তরার্ধ, অধ্যায় ৩২৫
৩৯। মৎস্যপুরাণ, অধ্যায় ২৩
৪০। কালিকাপুরাণ, অধ্যায় ২
৪১। মার্কণ্ডেয়পুরাণ, অধ্যায় ১
৪২। মার্কণ্ডেয়পুরাণ, অধ্যায় ৬২
৪৩। মহাভারত, বনপর্ব, অধ্যায় ৪৬
৪৪। রামায়ণ, যুদ্ধকাণ্ড, সর্গ ১৩ (এবং অন্যান্য অনেক)
৪৫। রামায়ণ, সুন্দরকাণ্ড, সর্গ ৯

সপ্তম অধ্যায়

নারী ধর্ম

১

একটি গল্প দিয়ে শুরু করি। গল্পটা কল্পনা করা নয়। একেবারেই নিরেট সত্য। গল্পের নায়ক নায়িকারা সকলেই পাঠকদের অতি পরিচিত। বছর কয়েক আগে শান্তিনিকেতনে এক সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় দুই ব্যক্তির যাঁরা আধুনিক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে শীর্ষস্থান অধিকার করে আছেন। এঁদের সঙ্গে আলাপ করতে করতে সাহিত্য প্রসঙ্গ উঠে পড়ে। কথায় কথায় আমি কোন এক বিশেষ নারী কবির নাম করে জিজ্ঞাসা করি তাঁর কবিতা সম্বন্ধে এঁরা কি মনে করেন। এঁদের একজন বল্লেন, "ও তো কবিতা লিখতেই পারে না। কোন মেয়েই পারে না"। অপরজন বল্লেন, "কোনপ্রকার সৃষ্টিশীল প্রতিভাই মেয়েদের মধ্যে কখনও থাকে না। এটা একটি শোচনীয় সত্য। আমি নারী জাতিকে খুবই ভালবাসি। কিন্তু শয্যায় ছাড়া অন্য যে কোন অবস্থাতেই নারীর অবদান অকিঞ্চিৎকর"। কথাগুলি এমনই একেবারে ছাঁচে ঢালা, প্রায় কপি বইয়ের ধরনের, নারীবিদ্বেষের আদর্শ উদাহরণ যে আমি বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না যে সত্যিই এই দুইজন সংবেদনশীল কবিমনের অধিকারী ব্যক্তি এইরকম চূড়ান্ত রকমের অযৌক্তিক ও অন্যায় চিন্তা মনে পোষণ করতে পারেন। কিন্তু খানিক পরেই দেখলাম যে এই ব্যাপারে তাঁদের বিচারে তাঁরা অটল। বিশ্বের সাহিত্যের ইতিহাসে কয়জন নারী-কবি কয়টি ভাল কবিতা লিখেছেন? তাঁদের এই চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে আমি অনেক প্রসঙ্গ তুলতে পারতাম। আমি বলতে পারতাম, আধুনিক কালের আগে পর্যন্ত সমাজে নারীরা লেখা-পড়ার সুযোগ থেকেই বঞ্চিত থাকতেন। সে অবস্থায় কি করে নারীদের কাছ থেকে সাহিত্য-অবদান আশা করা যেতে পারে? তেমনি গ্যালিলিও, নিউটন, আইনস্টাইন প্রভৃতিরা সকলেই পুরুষ কেন, নারী নন কেন, সে প্রশ্নের উত্তরেও আমাকে ঐ একই দিকে যেতে হোত। আমি এও বলতে পারতাম যে গ্যালিলিও, নিউটন, আইনস্টাইন এঁদের কেউ যেমন নারী ছিলেন না, এঁদের কেউই কৃষ্ণচর্ম বিশিষ্ট পুরুষও ছিলেন না। সুতরাং, তার থেকে কি এই প্রমাণ হয় শ্বেতচর্ম বিশিষ্ট ইউরোপীয় না হলে প্রতিভার অধিকারী হওয়া যায় না? শ্বেতকায় ব্যক্তিরাও আজকাল আর কৃষ্ণকায় ব্যক্তিমাত্রই স্বভাবতই নিম্নস্তরের জীব এ জাতীয় ধারণা পোষণ করেন না। কিন্তু এঁদের মত এত গোঁড়া নারী-বিদ্বেষীরা এ জাতীয় ঐতিহাসিক যুক্তি মানবেন বলে মনে না হওয়ায় আমি অন্য এক যুক্তির দিকে গেলাম যা দিয়ে মনে করেছিলাম মোক্ষমভাবে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে পারব। আমি বললাম, নারীদের মধ্যে ভাল কবি, সাহিত্যিক বা বৈজ্ঞানিক হয় নি একথা

বলতে চান বলুন। কিন্তু কোন প্রকার সৃষ্টিশীল প্রতিভাই নারীদের থাকে না একথা বললেন কি করে? সঙ্গীত ও নৃত্য এই দুই কলার ক্ষেত্রে আমরা কি নারীর মধ্যে অত্যুচ্চ শ্রেণীর প্রতিভার নিদর্শন পাই নি? কেশরবাঈ কেরকার কি আমীর খাঁর সমপর্যায়ের শিল্পী নন? ভারতনাট্যমের বাল সরস্বতীর সঙ্গে তুলনা করার মত নৃত্য-প্রতিভা সমগ্র দুনিয়ায় কয়টি খুঁজে পাওয়া যাবে? কিন্তু এত করেও আমি আমার দুই প্রতিপক্ষের মত পরিবর্তন করতে পারলাম না। তাঁরা বললেন, সংগীত বা নৃত্য পরিবেশন করায় নাকি সৃজনশীল প্রতিভা লাগে না। তাঁরা সৃজনশীলতার একটি অভিনব সংজ্ঞা দিয়ে বসলেন। তাঁদের মতে গল্প লেখা, কবিতা লেখা সৃজনশীল কর্ম। কিন্তু সঙ্গীত পরিবেশন তা নয়, নৃত্যও নয়। সেখানে সৃজনশীলতা নাকি নূতন রাগ সৃষ্টি করা বা নূতন নৃত্য রচনা করার মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাঁরা বললেন, যাঁরা নাচেন তাঁরা আমাদের দেশে সবাই নারী সন্দেহ নেই, তাঁদের নাচ শিখিয়েছেন যে গুরুরা তাঁরা বেশির ভাগই পুরুষ। তাঁদের কথায় এক ফুৎকারে হিন্দুস্থানী ও কর্ণাটক সঙ্গীত জগতের জগৎবরেণ্য রথীমহারথী কণ্ঠ ও যন্ত্র শিল্পীরা সৃজনশীল প্রতিভার গণ্ডির বাইরে নিক্ষিপ্ত হলেন—কেশরবাঈ কেরকারের সঙ্গে আমীর খাঁও। আর গণ্ডির ভিতরে পড়ে রইল বাংলা দেশের সেই তাবৎ তরুণ সম্প্রদায় যারা সকলেই দু-ছত্র কবিতা লিখতে পারে।

এই দুই বিশিষ্ট কবির এই ইতিহাসবোধহীন যুক্তিহীন অনপনেয় নারীবিদ্বেষ নির্ভুল-ভাবে প্রতিফলিত করে ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের স্ত্রীবিদ্বেষকে।

এই ঐতিহ্যের জনক ও বাহক শাস্ত্রকারেরা যে সাংঘাতিক রকমের স্ত্রী বিদ্বেষী ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। অতীত নিয়ে গর্ব করতে গিয়ে আমরা যখন মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি দুএকটি নাম উচ্চারণ করে অতীতের ভারতবর্ষে সমাজে নারীর স্থান কতটা মর্যাদাসম্পন্ন ছিল প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করি তখন সত্য থেকে বিচ্যুত হই। একেবারে বৈদিকযুগে নারীর স্থান সমাজে কতটা উঁচুতে ছিল বা নীচুতে ছিল তা আপাতত আলোচনা করব না। তার পরবর্তীযুগ—যখন থেকে জাতিপ্রথার প্রচলন কায়েম হয়েছে এবং যে সময়ে আধুনিক ভারতবর্ষে যেসব দেবদেবীরা হিন্দুধর্মে প্রধানতম স্থান অধিকার করে আছেন তাঁদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যে যুগে রামায়ণ মহাভারত ও প্রধান প্রধান পুরাণগুলি রচিত হয়েছে—আমি সেই যুগের কথা আলোচনা করব। এই যুগ যে ঐতিহাসিক তারিখের বিচারে অতিশয় বিস্তীর্ণ তা ভুলে যাচ্ছি না। ভুলে যাচ্ছি না যে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলি একদিনে এমন কি এক শতাব্দীতেও রচিত হয় নি। অনেক শতাব্দী ধরে এবং অনেক অনেক লেখকের লেখনীর দ্বারা পরিবর্জিত পরিবর্ধিত ও পরি-মার্জিত হয়ে এখন তাদের যে আকার সে আকার পেয়েছে। এই বিস্তীর্ণ কালের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে যেসব নৈতিক ধারণাপুঞ্জ দানা বেঁধেছিল সেই ধারণাপুঞ্জই পরবর্তী সবকালের হিন্দুসমাজকে ধর্মের আধারে ধারণ করে রেখেছে। আমার মতে আজকের দিনের আমরাও ঐ একই আধারে ধৃত হয়ে আছি। এই কারণেই বৈদিক যুগের চেয়ে বেদ পরবর্তীযুগই আমার বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের পক্ষে বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের শাস্ত্ররচয়িতা মুনিঋষিরা যে অবিশ্বাস্য রকমের স্ত্রীবিদ্বেষী ছিলেন তা অনুমান করতে হয় না। বিচার বিশ্লেষণ করে প্রতিপন্নও করতে হয় না। তাঁরা নিজেরাই অত্যন্ত

স্পষ্ট ভাষায় তাঁদের বক্তব্য রেখে গেছেন—ভূরি ভূরি পরিমাণে। এই বক্তব্য কোন ব্যতিক্রম নয়, বরং বলা যেতে পারে এই বক্তব্য ব্যতিক্রমবিহীন। বস্তুত রামায়ণ মহাভারত ও অষ্টাদশ পুরাণের মহাসাগর মন্থন করেও নারী চরিত্র সম্বন্ধে প্রশংসাসূচক বাক্য প্রায় কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না। অপরদিকে নারীনিন্দার একেবারে ছড়াছড়ি। নারী চরিত্র যে কত খারাপ তা বলে বলেও যেন শেষ করা যায় না। সঙ্গীতের ওস্তাদেরা যেমন একটা রাগের স্বরূপকে নিংড়ে বার করে দেখাতে একের পর এক তানের খেলা দেখিয়েই যান, শাস্ত্রকারেরাও সহস্র সহস্র বাক্যে একই নারীনিন্দা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেই যান ক্লান্তিহীন উৎসাহে।

কিছু উদাহরণ দেওয়ার আগে এইটুকু লক্ষ্য করে নেওয়া যাক যে এই চূড়ান্ত নারী বিদ্বেষের ব্যাপারটা তৎকালীন ব্রাহ্মণ্য মনের অন্যান্য অভিব্যক্তির সঙ্গে সম্পূর্ণভাবেই সঙ্গতি-সম্পন্ন। নরনারীর মধ্যে যে বৈষম্য তা একক কিছু নয়, সামাজিক অন্যান্য অনেক বৈষম্যের মধ্যে তা একটি মাত্র। সমাজে নানারকমের শ্রেণীবিভাগ ও স্তরভেদ আছে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে শাসন ও শোষণের সম্পর্ক রয়েছে, বিভিন্ন স্তরের মধ্যে আয়, সম্পদ ও সামাজিক সুখ সুবিধার বণ্টনবিন্যাস খুবই অসম। নারী নির্যাতনও ঐ সামগ্রিক নির্যাতন, নিপীড়ন, দমন ও শোষণের অংশবিশেষ। দেশকাল নির্বিচারে সর্বত্রই, সমাজ মাত্রেই, মানুষে মানুষে এই সংঘাতের সম্পর্ক থেকে গেছে এবং নারীর নির্যাতনও সর্বত্রই ঘটেছে। কিন্তু এই দুর্ভাগাদেশে মানুষ দ্বারা মানুষের অপমানের পর্যায় যে অতল গভীর স্পর্শ করেছে তার তুলনা বোধহয় বিশ্বের ইতিহাসে নেই। গ্রীক ও রোমক সভ্যতায় দাস প্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিল। দাসেদের জন্তু জানোয়ারের মত ব্যবহার করা হত। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলব জাতিপ্রথার দ্বারা, বিশেষ করে অস্পৃশ্যতা ব্যবস্থার দ্বারা আমাদের দেশের নিম্নশ্রেণীর লোকেদের উপর যে নৈতিক অবিচার করা হয়ে এসেছে তার সঙ্গে তুলনীয় কোন অত্যাচার অবিচার দাসেদের উপর করা হয়নি। দাসেরা সুযোগ পেলেই পালাবার চেষ্টা করত। তাদের ধরে বেঁধে পাহারা দিয়ে রাখতে হোত। তা সত্ত্বেও সময়ে সময়ে দাসেরা বিদ্রোহে ফেটে পড়ত। কিন্তু আমাদের দেশের অস্পৃশ্যদের ধরে বেঁধেও রাখতে হোত না, তারা অতীতকালে বিদ্রোহ কখনও করেনি। তারা তাদের অস্পৃশ্য দশাকে ধর্মের বিধান বলে মেনে নিয়েছিল। অর্থাৎ দুনিয়ায় কোন দেশেই কোন নির্যাতিত শ্রেণীর লোকেদের মনটাকেও এমনভাবে বিজিত করা সম্ভব হয়নি যেমন আমাদের দেশের সমাজকর্তারা পেরেছিলেন করতে আমাদের সমাজের অন্তেবাসীদের মনকে।

ঠিক তেমনি সবদেশেই সবকালেই নারীদের পুরুষেরা অনেকভাবেই বঞ্চিত করে এসেছে। কিন্তু নারীজাতি সম্বন্ধে যে সীমাহীন ঘৃণা আমাদের দেশের সমাজ-শাসক পুরুষেরা পোষণ করতেন এবং যে ঘৃণাকে প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করে নারী সম্পর্কিত সমস্ত সামাজিক ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে তার তুলনা অন্য কোন দেশের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। আর নারীরা তাদের এই অবস্থানকে যেভাবে মেনে নিয়ে এসেছেন তাও তুলনাবিহীন।

২

নারীদের তো প্রাচীনকালে মানুষ বলেই গণ্য করা হোত না। আজকাল পাশ্চাত্ত্যজগতে

নারীমুক্তি আন্দোলনের অন্যতম প্রধান প্রতিবাদ এই যে, পুরুষেরা নারীদের সঙ্গে ব্যবহার করে যেন তারা বস্তুপিণ্ড মাত্র। তাদের নিজেদের যেন কোন ব্যক্তিত্বও নেই, নিজস্ব কোন সত্তাও নেই। কোন পুরুষ মানুষের অন্য অনেক সম্পত্তির মধ্যে এক বা একাধিক নারীও সম্পত্তি-বিশেষ। আধুনিককালের সমাজে পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গি যে এই প্রকারের তা একটি তত্ত্বের ব্যাপার। তথ্য দিয়ে এই তত্ত্বের সমর্থন করতে হলে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। কিন্তু আমাদের পুরাণ ও মহাকাব্যের যুগে এই ব্যাপারটি কোন তত্ত্বের বিষয়ই ছিল না। নিতান্তই দৈনিক জীবনের অতি সাধারণ সত্য ছিল। যেমন ধরুন মহাভারতের সভাপর্বে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "ধর্মরাজ সমস্ত নিমন্ত্রিত জনগণকে পৃথক পৃথক গো সমূহ, শয্যা, অসংখ্য সুবর্ণ ও দিব্যাভরণভূষিতা রূপযৌবনবতী সর্বাঙ্গসুন্দরী রমণী প্রদান করিলেন"।(১) গো এবং সুবর্ণ যে স্তরের বস্তু রমণীগণকেও ঠিক সেই স্তরের বস্তু হিসাবেই এখানে দেখানো হয়েছে। এটি কোন ব্যতিক্রম নয়। এরম উদাহরণ প্রাচীন সাহিত্যে রাশি রাশি পাওয়া যায়। যেমন কর্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালে ধনঞ্জয় কোথায় আছেন যে দেখিয়ে দেবে তার পুরস্কার হিসাবে ঘোষণা করেন, "ছয় মাতঙ্গ, সুবর্ণনির্মিত রথ ও নিষ্ককণ্ঠ, গীতবাদ্যনিপুণ অজাতপুত্র একশত কামিনী প্রদান করিব"। (২) এখানেও দেখুন, কামিনীদের কি ভাবে মাতঙ্গ ও রথের সমতুল্যভাবে দেখানো হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবৎ-এ কোন বিবাহের যৌতুকের বিবরণে পাই, "চারিশত গজ, সার্দ্ধ অজুত অশ্ব, অষ্টাদশ শত রথ এবং বিবিধ ভূষণে ভূষিত দুই শত সুকুমারী দাসী"। (৩) এরকম আরো উদাহরণ দেওয়ার প্রযোজন নেই। গজ, রথ, গো, সুবর্ণ প্রভৃতি যেরকম সম্পূর্ণভাবে পুরুষের করায়ত্ত সম্পত্তি, যাকে যথেচ্ছ দান করে দেওয়া যায়, রমণীরাও ছিল ঠিক সেইরকমেরই দানের উপযোগী সামগ্রী ও সম্পত্তি।

উপবে যে কয়টি গো, গজ প্রভৃতির সঙ্গে নারীদান করার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে সেখানে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে ঐসব নারীরা ছিল দাসী বা গণিকা শ্রেণীভুক্ত। অনেক জায়গাতেই পরিষ্কার করেই তাদের গণিকা বা বারবণিতা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু সাধারণভাবেই যে কোন রমণীকেই যে পুরুষের সম্পত্তি হিসাবে মনে করা হোত তারও প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। যুধিষ্ঠির যে দ্যূতক্রীড়ায় দ্রৌপদীকে পণ রেখেছিলেন সেখানে কি খুব স্পষ্টভাবেই দ্রৌপদীকে যুধিষ্ঠিরের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবেই দেখানো হয়নি? কৌরব সভার সকলেই বিনা দ্বিধায় এই সম্পর্ক মেনে নিয়ে ছিলেন। দ্রৌপদীকে যখন প্রকাশ্য সভায় চূড়ান্ত অপমান করা হোল তখনও প্রপিতামহ ভীষ্ম, যাঁর মুখ দিয়ে মহাভারতের অধিকাংশ ধর্মকথা বলা হয়েছে, তিনিও মেনে নিলেন যে সম্পত্তি দখল করার পর সেই সম্পত্তির বস্ত্রহরণ করার অধিকার কৌরবপক্ষের আছে। কিন্তু দুর্যোধন, দুঃশাসন, এমন কি যুধিষ্ঠিরও পত্নীর প্রতি আনুগত্যের আদর্শ ছিলেন না। এই আনুগত্যের চূড়ান্ত আদর্শ হয়ে রয়েছেন যে একপত্নীক শ্রীরামচন্দ্র, যাঁর সীতার প্রতি এক-নিষ্ঠতা ও শ্রদ্ধার ভাব নিঃসন্দেহে খুবই উচ্চস্তরের পরিশীলিত মনের পরিচয় দেয়, তিনিই বা কি বলেছিলেন? তিনি বলেছিলেন, "ভরত কর্তৃক প্রার্থিত হইলে আমি নিজেই রাজ্য স্ত্রী প্রিয়জীবন এবং ধন সকলই ভরতকে প্রদান করিতে পারি"। (৪) দেখা যাচ্ছে আদর্শ পতি

শ্রীরামচন্দ্র তাঁর আদর্শ পত্নী সীতাকে ভরতকে দিয়ে দিতে রাজী ছিলেন, ঠিক যেমন ভালবাসার পরাকাষ্ঠা হিসাবে কেউ তার প্রিয়তম বস্তুকে দান করে দিতে পারে। সীতা যে রামের প্রিয় ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। সুতরাং রামচন্দ্রের বাক্যে যা প্রতিপন্ন হয় তা এই যে, সীতা রামের কাছে প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন না, ছিলেন প্রিয় বস্তুবিশেষ। এই ধারণাটা তো এখনও সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হয় নি। হিন্দু বিবাহে এখনও কন্যাকে সম্প্রদানই করা হয়ে থাকে, হিন্দু বিবাহের মন্ত্র এখনও একটি সম্পত্তির হস্তান্তর করার দলিল বিশেষ।

নারী যেহেতু পুরুষের সম্পত্তি বিশেষ সুতরাং নারী যে সম্পূর্ণভাবেই পুরুষের অধীন হবে তা খুব সহজ যুক্তিসূত্রেই প্রতিপন্ন হয়। নারীর এই পুরুষের অধীনতা সম্পর্কে শাস্ত্রকারেরা সংশয়ের কোন অবকাশই রাখেন নি। মহর্ষি অষ্টাবক্রের নিম্নলিখিত উক্তিটি খুবই সুপ্রসিদ্ধ ও সুবিদিত : "ত্রিলোক মধ্যে কোন স্ত্রীরই স্বাধীনতা নেই। দেখ, কুমারাবস্থায় পিতা, যৌবনাবস্থায় ভর্ত্তা ও বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রেরা স্ত্রীজাতীর রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে, সুতরাং স্ত্রীজাতীর কখনও স্বাধীনতা থাকিবার সম্ভাবনা নাই"। (৫) এর সঙ্গে তুলনীয় একই বক্তব্যবাহক উক্তি অজস্র পাওয়া যায়। কিন্তু এই ব্যাপারটি এতই সর্বজনস্বীকৃত যে আর কোন উদ্ধৃতি দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করছি না।

সাধারণভাবে পুরুষের অধীন থাকা এবং বিশেষ করে কুমারী অবস্থায় পিতার অধীন থাকার নির্দেশ থাকলেও সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে স্বামীর অধীন থাকার উপর। "একমাত্র ভর্তার উপভোগের নিমিত্তই স্ত্রীদিগের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহা না হইলে নারী আর কোন কাজে লাগে ?" (৬) শিবপুরাণের এই উক্তির প্রতিধ্বনি প্রাচীন সাহিত্যে সহস্র লক্ষবার পাওয়া যায়। যেমন, "স্বামী ব্যতিরেকে স্ত্রীলোকদের অন্য দেবতা নাই"।(৭) "স্ত্রীজাতির যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ ও উপবাস কিছুই অনুষ্ঠান করিতে হয় না, উঁহাদিগের স্বামী ও শুশ্রূষাই পরম ধর্ম"। (৮) এই শেষ উদ্ধৃতিতে লক্ষণীয় কিভাবে নারীর পরাধীন অবস্থাকে স্বীকার করে নেওয়াকেই তার পরমধর্ম করে দেখানো হয়েছে। অধীনতার প্রসঙ্গটাকে চাপা দিয়ে এই পরমধর্মের উপর জোর দিয়ে বাণী প্রচার করা হয়েছে আরও অন্য অজস্র জায়গায়। যেমন, "স্বামীসেবানুরতা পতিব্রতা স্ত্রীকে ইহলোকে ও পরলোকে পাপ স্পর্শ করিতে পারে না। পতিব্রতা ও ধর্মআচরণরতা কামিনী সকল মঙ্গল লাভ করে তাহাতে সংশয় নাই"। (৯) "পতিপরায়ণা স্ত্রী পতির হিতসাধন করিয়া যাদৃশ ফলপ্রাপ্ত হয় যজ্ঞ, তপ, দান ও নিয়মাদি দ্বারা কদাচ তাদৃশ ফল লাভ করিতে পারে না"। (১০)

পাতিব্রত্যের এই আদর্শ প্রচার এতটা সফল হয়েছিল যে এর প্রচার শুধু পুরুষরা করে যাননি, নারীরাও এই আদর্শকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। রাম যেমন বলেছিলেন, "স্বামী নারীর দেবতা, স্বামীই ঈশ্বর"। (১১) তেমনই সীতাও বলেছিলেন, "সাধ্বী রমণীদিগের গতি পিতা নহে, পুত্র নহে, আত্মা নহে, সুহৃজ্জন নহে, একমাত্র পতিই পরম গতি"। (১২) পাতিব্রত্যের আদর্শ হিসাবে একথাও বলা হয়েছে যে, "পুরুষদিগের বহু বিবাহ দোষাবহ নহে, কিন্তু নারীদিগের পত্যন্তর স্বীকারে মহা অধর্ম জন্মে"। (১৩) কিন্তু এই আদর্শের চূড়ান্ত উদাহরণ হিসাবে প্রাচীন সাহিত্যের বহু স্থানেই সেই নারীর

উপাখ্যান পাওয়া যায় যাঁর স্বামী কুষ্ঠরোগে বীভৎসাকৃতি হওয়া সত্ত্বেও যিনি তাঁকে দেবতার ন্যায় পূজার্চনা করতেন এবং একদা সেই স্বামী বেশ্যাগৃহে গমন করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলে যে পত্নী তাঁকে নিজের স্কন্ধে বহন করে বেশ্যাগৃহে নিয়ে যান। কারণ তিনি "মহাভাগা ও পতিব্রতা ছিলেন এবং সংকুলে জন্মিয়াছিলেন। সুতরাং স্বামীর মনতুষ্টি বিধান করাই একমাত্র কর্তব্য"। (১৪) এই আখ্যানটির ব্যাজ বেশী, ঝাল বেশী, কিন্তু এর মধ্যে সার বক্তব্য যা আছে তাতে একেবারেই অতিশয্য নেই। নারী এতই পরাধীন যে, "যে স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ধর্মচরণ করে, সে তাহার ফল প্রাপ্ত হয় না। প্রত্যুত পাতকিনী হয়"। (১৫) অপরদিকে ঐ একই পরাধীনতার কারণে, "স্ত্রীলোকের কোন বিষয়ে কিছুমাত্র অপরাধ নাই, প্রত্যুত স্ত্রী ব্যভিচার দোষে লিপ্ত হইলে তাহার স্বামীকেই সেই বিষয়ে অপরাধী বলিয়া স্থির করা উচিত। ভর্তা স্ত্রীলোকের পরম দেবতা। স্ত্রীলোক পুরুষেরই একান্ত অধীন বলিয়া সে কোন বিষয়েই অপরাধী হইতে পারে না"। (১৬)

নারীর এই পরাধীনতার বিপরীত কোন ধারণার চিহ্নটুকুও প্রাচীনসাহিত্যে কোথাও পাওয়া যায় না। এর ব্যতিক্রম তখনই মাত্র পাওয়া যায় যখন কোন পুরুষ কোন নারীকে ছলেবলে নিজের ইন্দ্রিয়ভোগে লাগাবার চেষ্টা করছে। যেমন দুষ্মন্ত যখন শকুন্তলাকে বলেন, "তোমার আপন শরীরের প্রতি তোমার সম্পূর্ণ হিতৈষিত্ব ও কর্তৃত্ব আছে। অতএব তুমি স্বয়ংই আমার হস্তে আত্মসমর্পণ করো"। (১৭) তখন তিনি নিতান্তই শাস্ত্রবিরুদ্ধ কথা বলেন। শাস্ত্রে কোথাও নারীকে তার নিজ শরীরের বা আর কিছুর উপর কর্তৃত্ব দেওয়া হয় নি। একই কথা প্রযোজ্য সূর্যদেব সম্বন্ধে যখন তিনি কুন্তীকে বলেন, "তোমার পিতা মাতা বা অন্যান্য গুরুজন তোমার প্রভু নহেন, অবিবাহিতা নারীগণ যাহাকে ইচ্ছা হয় তাহাকেই কামনা করিতে পারে বলিয়া উহাদিগকে কন্যা কহে! হে নিতম্বিনি! কন্যা স্বতন্ত্রা, পরতন্ত্রা নহে, অতএব তুমি এই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলে কদাপি অধর্মাচারণ হইবে না। আর আমি কি নিমিত্তই বা কামপরতন্ত্র হইয়া অধর্মাচারণ করিব? হে ভাবিনি! স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্তি হওয়াই স্বাভাবিক, বৈবাহিকাদি নিয়ম কেবল মানবগণের কল্পনামাত্র, অতএব তুমি অবশঙ্কিত চিত্তে আমার সহিত সঙ্গত হও"। (১৮) দেখুন কত সহজেই এক কথায় বৈবাহিকাদি নিয়মটিয়ম সব উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, কত সহজে কুমারী মেয়েকে কৌমার্যহানিতে দোষ নেই বোঝান হয়েছে, যদিও নারীর সতীত্ব কুমারীর কৌমার্যকেই আমাদের শাস্ত্রের সর্বত্র নারীধর্মের একমাত্র স্তম্ভ হিসাবে ব্যতিক্রমবিহীন ভাবে দেখানো হয়েছে। সূর্যদেবের কথাগুলি কামুক ব্যক্তির নির্লজ্জ ছলচাতুরী ভিন্ন আর কিছুই প্রকাশ করে না। কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে এই কারণে সূর্যদেবের এতটুকুও নিন্দা করা হয়নি।

নারী কেন এত পরাধীন হবে? স্ত্রী কেন হবে স্বামীর এত বশংবদ? এর উত্তর শাস্ত্রকারদের জিভের ডগায় তৈরীই আছে। নারীরা যে অবলা, নারীরা যে দুর্বল। শুধু শরীরে নয়। অনেক বেশী যা গুরুত্বপূর্ণ, তাদের চরিত্র দুর্বল। শ্রীরামচন্দ্র ভরতকে অযোধ্যাবাসীদের কুশল জিজ্ঞাসা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "রমণীগণকে উত্তমরূপে রক্ষা করো তো? তাহাদিগকে বিশ্বাস করো না তো?" (১৯)

কিন্তু নারীদের সাধারণভাবে পুরুষের এবং বিশেষভাবে স্বামীদের অধীন করে রাখাতেই আমাদের প্রাচীন সভ্যতার বৈশিষ্ট্য সূচিত হয় না। নারীরা নানা প্রকার দোষের আকর এই ভাবনাটাও বিভিন্ন যুগের ও দেশের সভ্যতায় বেশ সাধারণ। আমাদের প্রাচীন সভ্যতাকে সত্যিই বৈশিষ্ট্য প্রদান করে যা তা নারীচরিত্র সম্বন্ধে সমাজকর্তাদের এমন এক চূড়ান্ত মাত্রার ঘৃণা যা কিনা সত্যিই তুলনাবিহীন। যেমন ধরুন, মহাভারত থেকে নেওয়া এই উক্তিটি, "তুলাদণ্ডের একদিকে যম, বায়ু মৃত্যু, পাতাল, বাড়বানল, ক্ষুরধার, বিষ, সর্প ও বহ্নি এবং অপরদিকে স্ত্রীজাতিকে সংস্থাপন করিলে স্ত্রীজাতি কখনই ভয়ানকত্বে উহাদের অপেক্ষা ন্যূন হইবে না"। (২০) তেমনি শিবপুরাণে নারীদের দোষের এভাবে ফর্দ করা হয়েছে, "মিথ্যা, সাহস, মায়া, মূর্খত্ব, অত্যন্ত লোভ, অপবিত্রতা, দয়াশূন্যতা এ সাতটি স্ত্রীলোক-দিগের স্বাভাবিক দোষ"। (২১) মহাভারতের শান্তিপর্বে রাজধর্ম আলোচনাকালে বলা হয়েছে রাজা যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে পরামর্শ করবেন তখন নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের উপস্থিতি বর্জনীয়, "বামন, কুব্জ, অন্ধ, খঞ্জ, ক্ষীণকায় ব্যক্তি, নপুংসক, বুদ্ধিহীন ব্যক্তি এবং স্ত্রীলোক"। (২২) স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, নারীদের পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসাবেই গণ্য করা হত না, বিকলাঙ্গদের সঙ্গে এক করে দেখা হত! নারীদের বুদ্ধিবৃত্তিকে এতই হীন চোখে দেখা হত যে মনু বিধান দিয়েছিলেন কোন বিচারে নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

নারীদের চরিত্রের দুর্বলতার যতদিক শাস্ত্রকারেরা আলোচনা করেছেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তাদের কাম ব্যাপারে সংযমের অভাব অথবা তাদের অত্যধিক রতি-প্রিয়তা। এই বিষয়ে শাস্ত্রকারেরা নারীচরিত্রকে এমনই ঘৃণ্যভাবে বর্ণনা করেছেন যে ঐ শাস্ত্রকারদেরই মনের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ না জেগেই পারে না। নিম্নে উদ্ধৃত নারী-চরিত্র বর্ণনাগুলি থেকে পাঠকেরা নিজেরাই বিচার করে দেখুন আমার কথাটা ঠিক কিনা।

"স্ত্রীজাতি স্বভাবত নিরন্তর অভিলাষিণী—কামচারিণী, কামের আধারস্বরূপা ও মনো-হারিণী হইয়া থাকে। তাহারা অন্তরের কামলালসা ছলক্রমে গোপন করে। নারী প্রকাশ্যে অতি লজ্জাশীলা কিন্তু গোপনে কান্তকে পাইলে যেন গ্রাস করিতে উদ্যত হয়। রমণী কোপশীলা, কলহের অঙ্কুর স্বরূপ ও মৈথুনাভাবে সর্বদা মানিনী এবং বহু সম্ভোগে ভীতা ও অল্প সম্ভোগেও অত্যন্ত দুঃখিতা হয়। স্ত্রীজাতি সুমিষ্টান্ন ও সুশীতল জল অপেক্ষাও সুন্দর সুরসিক গুণবাণ ও মনোহর যুবা পুরুষকে সর্বদা মনে মনে ইচ্ছা করে। তাহারা রতিদাতা পুরুষকে স্বীয় পুত্র হইতেও অধিক স্নেহ করে এবং সম্ভোগ পারদর্শী পুরুষই তাহাদের প্রাণাধিক প্রিয়তম"। (২৩)

"স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতই রতিপ্রিয়। পুরুষ সংসর্গ উহাদের যেমন প্রীতিকর, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবতারাও উহাদের তাদৃশ প্রীতিকর নহেন। দেখুন, সমস্ত স্ত্রীলোক মধ্যে কথঞ্চিৎ একটি পতিব্রতা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। যখন উহাদিগের কামপ্রবৃত্তি প্রবুদ্ধ হয়, তৎকালে

উহারা পিতা, মাতা, ভ্রাতা, কর্তা, পুত্র ও দেবরের কিছুমাত্র অপেক্ষা করে না। আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিতেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকে।" (২৪)

"কামিনীগণ সৎকুলসম্ভূত, রূপসম্পন্ন ও সধবা হইলেও স্বধর্ম পরিত্যাগ করে। উহাদের অপেক্ষা পাপপরায়ণ আর কেহই নাই। উহারা সকল দোষের আকর। উহারা অবসর-প্রাপ্ত হইলেই ধনবান ও রূপবান পতিদিগকে পরিত্যাগপূর্বক পরপুরুষ সম্ভোগে প্রবৃত্ত হয়। উহাদের অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ধর্মভয় নাই"। (২৫)

"উহারা অনায়াসে লজ্জা পরিত্যাগপূর্বক পরপুরুষদিগের সহিত সংসর্গ করে। পুরুষ পরস্ত্রী সম্ভোগে অভিলাষী হইয়া তাহার নিকট গমনপূর্বক অল্পমাত্র চাটুবাক্য প্রয়োগ করিলেই সে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি অনুরক্ত হয়।" (২৬)

"কামিনীগণ জলোকার ন্যায় সতত পুরুষের শোণিত পান করিয়া থাকে, তাহা মূর্খেরা বুঝিতে পারে না, কারণ তাহারা রমণীগণের হাবভাবাদি দর্শনে মোহিত হইয়া পড়ে। পুরুষ যাহাকে কান্তা বোধ করে সেই কান্তা সম্ভোগসুখ প্রদানে বীর্য, এবং কুটিল প্রেমালাপে মন ও ধনাদি সর্বস্বই অপহরণ করে, অতএব রমণীর তুল্য তস্কর আর কে আছে? ... রমণীগণ কখনও সুখের নয়, কেবল দুঃখেরই কারণ"। (২৭)

"আপনি কি জানেন না যে, বৃকগণের ন্যায় রমণীগণেরও কাহারও সহিত অকৃত্রিম ভালবাসা হয় না? এজন্য পার্থিবগণের স্ত্রীলোক ও তস্করের প্রতি কদাচ বিশ্বাস করা কর্তব্য নয়।" (২৮)

"রমণীগণ যে পর্যন্ত কোন নির্জন স্থান না পায় এবং যে পর্যন্ত কোন পুরুষের সহিত বিশেষ আলাপ করিতে না পায় সে পর্যন্ত স্ত্রীলোকের সতীত্ব থাকে। সেইহেতু ভদ্রমহিলা-গণের বন্ধুবান্ধবগণ কর্তৃক সর্বদা রক্ষা বিধান করা উচিত।"(২৯)

"সতীগণের মর্যাদা, মৃণাল-সূত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম এবং বুঝি ক্ষণকাল বায়ুর ভারও সহিতে পারে না, তাই অল্প চাঞ্চল্যেই বিনষ্ট হয়"। (৩০)

একটি ব্যাপার বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই যে, এই অবিশ্বাস্য রকমের নোংরা নারীনিন্দার অনেকাংশই করা হয়েছে নারীদেরই মুখ দিয়ে। শেষ দুইটি উদ্ধৃতির বক্তা অরুন্ধতী। অরুন্ধতীকে সর্বত্রই দেখানো হয়েছে সতীত্বের চূড়ান্ত আদর্শ হিসাবে। অনেক উপাখ্যানে দেখা যায় কোন উপায়েই কেউই কখনো তাঁকে সতীত্ব থেকে ভ্রষ্ট করতে পারেনি। অন্য পরে কা কথা, সপ্তর্ষিদের স্ত্রীদের মধ্যে অন্য ছয় জনকেই তাঁর তুলনায় সতীত্বের ব্যাপারে কম শক্তিশালিনী বলে দেখানো হয়েছে। কিন্তু এই অরুন্ধতীকে দিয়েই সতীগণের মর্যাদা সম্বন্ধে কি ধরনের কথা বলানো হয়েছে দেখুন। তেমনি রমণীগণকে বৃকগণের সংগে তুলনা করে যে নিন্দা করা হয়েছে তার বক্তা উর্বশী। যাঁকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে তিনি রাজা পুরুরবা। অন্যান্য উদ্ধৃতিদের মধ্যে কয়েকটির বক্তা অপ্সরা পঞ্চচূড়া। এই অপ্সরাকে একবার নারদ মুনি বলেন, "সুমুখি, আমি তোমার নিকট হইতে স্ত্রীগণের স্বভাব জানিতে বাসনা করি।" 'অপ্সরাশ্রেষ্ঠ পঞ্চচূড়া বলিলেন, "দেবর্ষি, আমি স্ত্রী হইয়া স্ত্রীগণের নিন্দা করিতে পারিব না।" দেবর্ষি তাঁহাকে বলিলেন, "সুমধ্যমে, তুমি সত্য কথা বলো। মিথ্যা

বলিলে পাপ হয়, সত্য কথা বলিলে কোন দোষ হইবে না।" এরপর সুহাস্যময়ী অপ্সরা বলিবার জন্য দৃঢ়নিশ্চয় করতঃ স্ত্রীগণের সত্য স্বাভাবিক দোষসমূহ বর্ণনা করিলেন।' মহাভারতের এই বর্ণনা থেকে দেখা যাচ্ছে পঞ্চচূড়া অপ্সরা হলেও তারও আত্মসম্ভ্রমবোধ ছিল। সহজে সে নারীনিন্দা করতে চায়নি। সে যেসব কথা বলে তা বলতে তাঁকে 'দৃঢ়নিশ্চয়' হতে হয়েছিল। দেবর্ষি নারদ যে ধরণের কথা শুনলে খুশী হবেন অথবা দেবর্ষি নারদ নিজেই নারীচরিত্র সম্বন্ধে যা মনে করেন পঞ্চচূড়া তাঁকে তাই শুনিয়ে খুশি করেছিল।

কাউকে জোর করে পায়ের তলায় চেপে রাখাতেই তার সব চেয়ে বড় পরাজয় হয় না। সেই পরাজয় হয় যখন সে মেনে নেয় সেই পায়ের তলাই তার যোগ্য স্থান। আমাদের সভ্যতার এই এক বৈশিষ্ট্য যে আমাদের সমাজে যাদের পায়ের নীচে চেপে রাখা হয়েছিল যেমন নারীরা বা অস্পৃশ্যরা তারা ঐ পায়ের নীচে পড়ে থাকাকেই তাদের ধর্ম বলে মেনে নিয়েছিল।

নারীনিন্দার বিপরীত বা ব্যতিক্রম হিসাবে নারীর স্তুতির কোন উদাহরণ প্রাচীন সাহিত্যে পাই না। কিন্তু স্থান-বিশেষে গৃহিণীকে বেশ মাথায় তোলা হয়েছে। যেমন মহাভারতে বলা হয়েছে, "ভার্যাই পুরুষের ধর্মার্থ কামসাধন সময়ে একমাত্র সহায় ও বিদেশ গমনকালে একমাত্র বিশ্বাসের আধার হইয়া থাকে। ইহলোকে ভার্যার তুল্য পরম ধন আর কিছুই নাই। বনিতাই পুরুষের লোকযাত্রা সম্পাদন করিয়া থাকে। রোগাভিভূত আর্ত ব্যক্তির ভার্যাই মহৌষধ। ভার্যার তুল্য পরম বন্ধু আর নাই।"(৩১) তেমনি শ্রীমদ্ভাগবতে কাশ্যপমুনি দিতিকে উদ্দেশ করে বলেন, "যাহা হইতে ত্রিবর্গ সিদ্ধি হয় কে তাহার কামনাপূর্ণ না করে? জলযানে যেমন সমুদ্র পার হওয়া যায় সেইরূপ গৃহিণী বিশিষ্ট গৃহী অপর আশ্রমের দুঃখনাশক হয় এবং আত্মআশ্রমে দুঃখজলধি পার হয়।"(৩২)

৪

প্রাচীন সাহিত্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে নারীদের সম্বন্ধে শাস্ত্রকারদের মনোভাবের যে পরিচয় পাওয়া গেল তার প্রসংগে কিছু প্রশ্ন মনে না উঠেই পারে না। প্রথম প্রশ্ন কেন এই প্রচণ্ড স্ত্রীবিদ্বেষ? এর উত্তর দেওয়া সহজ নয়। তবে সাধারণভাবে দেখা যায় যে কোন সমাজেই যদি একগোষ্ঠীর মানুষ অপর কোন এক মানুষের গোষ্ঠীকে অবদমন করে রেখে নিজেরা সুখসুবিধা করে নেয় সেখানেই সেই প্রথম শ্রেণীর মানুষরা দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষদের সম্বন্ধে নানান তত্ত্বের উদ্ভাবন করে, যার দ্বারা প্রতিপাদন করা হয় যে ঐ দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষেরা নানান রকম দোষে দুষ্ট সেই কারণেই তারা বঞ্চিত। আমাদের দেশের নিম্ন বর্ণের মানুষেরা বিশেষ করে অস্পৃশ্যরা যে উচ্চবর্ণের মানুষদের তুলনায় নানানভাবে বঞ্চিত তার কারণ দেখানো হয়েছে এই যে নিম্ন বর্ণের মানুষেরা আগের আগের জন্মে অনেক পাপ করেছিল। উচ্চ বর্ণের মানুষদের সেবা করাকেই তাদের ধর্ম বলে প্রচার

করা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের প্রতি মানুষের যে চূড়ান্ত অপমানকর আচরণ তাকেই তত্ত্ব দিয়ে সাজিয়ে করা হয়েছে ধর্মের অংশীভূত। অর্থনৈতিক শোষণের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা যারা নিম্ন শ্রেণীর লোকেদের শোষণের উপর ভিত্তি করে নিজেদের সমৃদ্ধির সৌধ গড়ে তোলে তারা ঐ নিম্ন শ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যে নানাবিধ দোষের অস্তিত্ব তত্ত্বগতভাবে আবিষ্কার করে। শ্রমিকরা কম খেতে পায় তার কারণ ধনিকদের মতে শ্রমিকেরা অলস, কর্মে বিমুখ, দক্ষতাহীন ইত্যাদি। শ্বেতকায় ব্যক্তিরা যতদিন দুনিয়াময় কৃষ্ণকায় ব্যক্তিদের প্রাণভরে শোষণ করতে পেরেছিল ততদিন প্রচার করেছিল কৃষ্ণকায় ব্যক্তিরা সভ্যতায় অনুন্নত, বুদ্ধিতে খাটো, নিজেদের দেশ শাসন করা, নিজেদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালনা করার যোগ্যতাই তাদের নেই। একইভাবে দুনিয়ার প্রায় সব সমাজেই সভ্যতার আদিকাল থেকে পুরুষেরা স্ত্রীদের উপর কর্তৃত্ব করে গেছে. তাদের অবদমন করে রেখেছে, সামাজিক সুখ-সুবিধার অধিকাংশ থেকে তাদের বঞ্চিত রেখে নিজেরা ভোগ করেছে। এবং একইকালে প্রচার করেছে নারীরা অক্ষম, তাদের চরিত্র দুর্বল, তাদের প্রতিভা নেই ইত্যাদি। অর্থাৎ অন্যান্য শোষক ও শোষিত, শাসক ও শাসিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ককে যেভাবে কুযুক্তির দ্বারা সমর্থন করা হয়ে থাকে এখানেও তাই করা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য যে কোন সমাজ বা সভ্যতার তুলনায় হিন্দু সমাজের ধারায় নারীনিন্দা যে অনেক বেশী উচ্চগ্রামের তার কারণ কি হতে পারে? আমরা দেখেছি যে আমাদের শাস্ত্রকারদের নারীনিন্দার প্রধান সূত্রই হল নারীদের অত্যধিক কামপরায়ণতা। পৌরাণিক সাহিত্যে ও মহাকাব্যে কিন্তু নারীদের এই অত্যধিক কামপরায়ণতার সমর্থনসূচক কাহিনী খুবই কম পাওয়া যায়। কাম সম্পর্কিত অধিকাংশ কাহিনীতেই পুরুষকেই অধিকতর পরিমাণে কামাসক্ত দেখানো হয়েছে। আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয় এ আর কিছু নয়, নিজেদের দুর্বলতাকে স্বীকার করে নেওয়ার সততা নেই—সেই দোষ চাপানোর জন্য কাউকে খুঁজে বার করা। যাকে ইংরেজীতে বলে 'স্কেপ গোট'। যুধিষ্ঠির বলেছেন কোন এক জায়গায় "আমরা শুনিয়াছি যে স্ত্রীরূপিণী প্রজাগণ অতিশয় ধার্মিক হয় যেমন সাবিত্রী প্রভৃতির জীবনে প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে। তথাপি এই স্ত্রীগণ সম্মানিত হউক বা অসম্মানিত হউক সদাই পুরুষের মনে বিকার উৎপন্ন করিয়া থাকে!"(৩৩) যুধিষ্ঠির যেহেতু একটু বোকা ভালমানুষ গোছের ছিলেন তাঁর মুখ দিয়ে সত্য কথাটা ফাঁস হয়ে গেছে। ধার্মিক এবং সম্মানিত মহিলাদের দেখে যদি পুরুষের মনোবিকার দেখা দেয় তো সেই পুরুষের কাছে মনে হয় নারীরা দুষ্টস্বভাবের দ্বারা ঐ বিকার উৎপাদন করছে! বলাই বাহুল্য ঘটনাটা অন্যভাবে দেখা যায়। যার মনে বিকার দেখা দেয় চারিত্রিক দুর্বলতার কথা বলতে হলে তারই কথা বলা উচিত। যাদের উপলক্ষ্য করে ঐ বিকারের জন্য তাদের দায়ী করাটা সম্পূর্ণ যুক্তিহীন। কেউ অন্য কারো মনে বিকার উৎপাদন করতে পারে না। যার মনে বিকার দেখা দেয় তার মনই সেই বিকারের জন্য দায়ী।

আর এক প্রশ্ন যা ওঠে তা এই। এই ব্যাপক নারীনিন্দার মধ্যে মাঝে মাঝে যে ভার্যাদের প্রশংসা পাওয়া গেছে তার কারণ কি হতে পারে? নারীচরিত্র সম্বন্ধে যেখানে এতই বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস সেখানে এই গৃহিণীর গুণকীর্তন শুধুই কি সঙ্গতির অভাব সূচনা করে? না কি আর কোন ব্যাখ্যা থাকতে পারে? থাকতে তো পারেই। একটা ব্যাখ্যা

যা হতে পারে তা এই। একদিকে গৃহিণী না হলে চলে না, সংসার চালাবে কে? রেঁধে খাওয়াবে কে? অসুখ হলে সেবা করবে কে? অপরদিকে নারীদের কামোদ্রেকের ক্ষমতা সম্বন্ধে গুরুতর সন্দেহ। নারী এমনই এক সম্পত্তি যার সম্বন্ধে সবসময়ই হাত ছাড়া হয়ে যাওয়ার ভয়। পাপেদের ফিরিস্তির মধ্যে যে পরিমাণে গুরুপত্নীগমন নামক পাতকের উল্লেখ পাওয়া যায় তা থেকে মনে হয় শাস্ত্ররচয়িতা মুনি-ঋষিরা সবসময়েই ভয়ে ভয়ে থাকতেন যে তাঁদের তরুণী ভার্যারা সুযোগ পেলেই তাঁদের শিষ্যদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করবে, হয়তো বা ঘটনা ফষ্টিনষ্টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, আরও বেশীদূর গড়িয়ে যাবে।

তা ছাড়া শুধু তো সংসারের যাবতীয় কাজ করে দেওয়া নয়, গৃহিণীদের প্রয়োজন বংশ-রক্ষার জন্যেও। এবং বংশের ধারার হিসেব যদি রাখতে হয় তাহলে পুরুষেরা যাই করুক স্ত্রীদের হতে হয় স্বামীদের প্রতি একনিষ্ঠ। কিন্তু বিবাহ প্রথাটাকে পুরুষের সুবিধেমত গড়েপিটে তৈরী করে নিতে বেশ সময় লেগেছিল। মহাভারতের মধ্যেই কতপ্রকার বিবাহ-প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়। দ্রৌপদীর একাধিক পুরুষের পত্নী হওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে যে বিতর্ক হয়েছিল তা থেকেই দেখা যায় যে স্ত্রীদের বহুবিবাহ প্রথা হিসাবে অপেক্ষাকৃত কম প্রচলিত হলেও একেবারে অপ্রচলিত ছিল না! মহাভারতের অধিকাংশ নায়কের জন্মই তো হয়েছিল বিবাহবহির্ভূত সংসর্গের ফলে। পঞ্চপাণ্ডবেরা তো বটেই, ষষ্ঠ কৌন্তেয় কর্ণ তো বটেই, দ্রোণ, কৃপাচার্য এবং মহাভারত-রচয়িতা স্বয়ং ব্যাসদেবও ছিলেন জারজ সন্তান। এই ব্যাপারে শাস্ত্রকারেরা সমাজকে যত বজ্র আঁটনে বাঁধতে গেছেন ততই গেরো হয়েছে ফস্‌কা। আরও প্রাচীনকালে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকারের ইনসেসট যেমন ভ্রাতাভগিনীর বিবাহ (উদাহরণ, যোগ্য ও দক্ষিণা, দম্ভ ও মায়া, পৃথু ও অর্চ্চি) মনে হয় রামায়ণ মহাভারত ও প্রধান পুরাণগুলি রচনার সময়ে অপ্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। স্বামীরা বহুবিবাহ করবেন, যত্রতত্র যেমন তেমন অবস্থায় নারীদের ইন্দ্রিয় ভোগে লাগাবেন, কিন্তু স্ত্রীরা একমাত্র স্বামীর প্রতি আজীবন একনিষ্ঠ থাকবেন এই আদর্শকে রামায়ণ মহাভারতের কালে মনে হয় সমাজে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা অবিরত ছিল। সেই চেষ্টা তখনও সম্পূর্ণ সফল হয়নি। হতে আরও অনেককাল লেগেছিল। এই অবস্থায় একই কালের স্ত্রী চরিত্রের নিন্দা এবং গৃহিণীর ভূমিকার পঞ্চমুখ প্রশংসা বেশ ভালোভাবেই সঙ্গতিপূর্ণ।

আমার তৃতীয় প্রশ্নটি খুবই মোক্ষম ধরনের। এরও উত্তর আমার জানা নেই, উত্তর কি হতে পারে তা নিয়ে অন্ধকারে হাতড়াতে পারি মাত্র। অন্য যে কোন দেশের তুলনায় মনে হয় বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এবং প্রশাসনে নারীরা অধিক গুরুত্বপূর্ণ নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেছেন। সমস্ত ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার অন্তর্গত কোন দেশে প্রথম ১৯৭৯ সালে ইংল্যাণ্ডে একজন নারী প্রধানমন্ত্রী হলেন। তার আগে পর্যন্ত এইসব দেশে প্রধানমন্ত্রী হওয়া দূরে থাকুক কোনপ্রকার উচ্চতর শ্রেণীর দায়িত্বপূর্ণ পদেই নারীদের দেখা যায়নি বলা চলে। কিন্তু ভারতবর্ষে ইন্দিরা গান্ধীই যে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন তা নয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর গভর্নর, মুখ্যমন্ত্রী, বৈদেশিক দূতাবাসের উচ্চপদ, আন্তর্জাতিক সংস্থায় প্রতিনিধিত্ব এই জাতীয় নানান রকম দায়িত্বপূর্ণ পদে নারীরা গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা পালন করে গেছেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগেও জাতীয় আন্দোলনে একাধিক নারী উচ্চতম স্তরের নেত্রীর স্থান অধিকার করেছেন। স্পষ্টতই পাশ্চাত্ত্যদেশের তুলনায় ভারতবর্ষের পুরুষ জনগণ স্ত্রীলোকের নেতৃত্ব অনেক বেশী সহজে বিনা দ্বিধায় বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছে। একদিকে নারীদের সম্বন্ধে চূড়ান্ত অবজ্ঞা, নারীদের বিদ্যা বুদ্ধি ও ক্ষমতা ঘোরতর সন্দেহ। অপরদিকে একইকালে নারীদের নেতৃত্ব মেনে নিতে রাজী হওয়া, এই ব্যাপারটা কি অসঙ্গতিপূর্ণ নয়? এর থেকে একটা কথা যা প্রতিপন্ন হয় তা এই যে হিন্দু পুরুষ নারীকে কখনই নিজের সঙ্গে সমানভাবে দেখতে সক্ষম নয়। হয় সে নারীকে মনে করবে তার চেয়ে অনেক অধম। তা নয়তো সে নারীকে মনে করবে তার চেয়েও অনেক বেশী উত্তম। হিন্দু পরিবারে ছেলের কাছে মায়ের স্থান অনেক সময়েই খুবই উঁচুতে। বয়স্ক ছেলেও মায়ের কথায় ওঠে বসে। এই দৃষ্টান্ত দেখিয়ে আধুনিক অনেক ভারতবাসী প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন যে হিন্দু সমাজে নারীর স্থান নিম্নে এই ধারণাটা ভ্রান্ত। কিন্তু ঐ একই হিন্দুপরিবারে বাড়ির মেয়েদের ও বৌদের স্থান যে খুব উঁচুতে তা তাঁরাও বলবেন না। অর্থাৎ একইকালে জননী বা শাশুড়ী হিসাবে নারী পূজিত হন এবং কন্যা ও বধূ হিসাবে চূড়ান্ত লাঞ্ছনা ভোগ করেন।

নারীদের সম্বন্ধে হিন্দু পুরুষের মনে এই যে দ্বৈতভাব তার উৎপত্তি সম্পর্কে আমার কোন ব্যাখ্যা নেই, কিন্তু একটা আবছা ধারণা আছে। হিন্দুর ধর্মজীবনে দেবীদের যে প্রাধান্য তার সঙ্গে তুলনীয় কোন ভূমিকা অন্য কোন প্রধান ধর্মের কোন নারীদেবতা পালন করেন না। মুসলমানদের আল্লা, ইহুদীদের জেহোভা, খ্রীষ্টানদের ঈশ্বর সকলেই পুরুষ এবং পিতৃস্থানীয়। ঈশ্বরের সন্তান যীশুখ্রীষ্টও পুরুষ। জননী মেরী অবশ্য নারী কিন্তু খ্রীষ্টানদের চোখে তাঁর স্থান কোনক্রমেই হিন্দুদের চোখে দুর্গা, কালী, সরস্বতী প্রভৃতির মত চূড়ান্ত পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ নয়। একদিকে বলা হচ্ছে নারীরা অবলা অপরদিকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অসুরদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য শরণ নিতে হয় চণ্ডীর চামুণ্ডার দুর্গার কালীর। একদিকে বলা হচ্ছে নারীরা বুদ্ধিহীন প্রতিভাহীন। অপরদিকে পণ্ডিতেরা আশীর্বাদ ভিক্ষা করেছেন যে সরস্বতীর কাছে সেই দেবতা নারী। অবশ্য একথা বলা যাবে না যে হিন্দুধর্মে দেবীদের প্রাধান্য থাকাটাই নারীদের সম্বন্ধে হিন্দু পুরুষের দ্বৈত মনোভাবের কারণ। বরং এই দ্বৈতমনোভাবই হিন্দুধর্মে দেবীদের প্রাধান্যকে সম্ভব করেছে।
ধর্মে দেবীদের প্রাধান্য এবং সমাজজীবনে নারীদের সম্বন্ধে দ্বৈতভাব এই দুইটির উন্মেষ ও বিকাশ একই ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে ঘটেছে এই পর্যন্ত দেখা যায়। কোনটি কার্য কোনটি কারণ তা বোধ হয় জোর করে বলা বলা যায় না।

উদ্ধৃতি-নির্দেশক

১। মহাভারত, সভাপর্ব, অধ্যায় ৩২
২। মহাভারত, কর্ণপর্ব, অধ্যায় ৩৯

৩। শ্রীমদ্‌ভাগবত, দশম স্কন্ধ, অধ্যায় ১
৪। রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, সর্গ ১৬

ায় ২১

১১
১২
১৩
১৪ মার্কণ্ডেয় পুরাণ, অধ্যায় ১৬
১৫ শিবপুরাণ, সনৎকুমারসংহিতা, অধ্যায় ২৬
১৬ মহাভারত, শান্তিপর্ব, উত্তরার্ধ, অধ্যায় ৬৬
১৭ মহাভারত, আদিপর্ব, অধ্যায় ৩
১৮ মহাভারত, কর্ণপর্ব, অধ্যায় ৩০৬
১৯ রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, সর্গ ১০৯
২০ মহাভারত, অনুশাসনপর্ব অধ্যায় ৩৮
২১ শিবপুরাণ, ধর্মসংহিতা অধ্যায় ৪৪
২২ মহাভারত, শান্তিপর্ব অধ্যায় ৮৩
২৩ দেবীভাগবত, নবম স্কন্ধ, অধ্যায় ১৮
২৪ মহাভারত, অনুশাসনপর্ব, অধ্যায় ১৯
২৫ মহাভারত, অনুশাসনপর্ব অধ্যায় ৩৮
২৬ মহাভারত, অনুশাসনপর্ব, অধ্যায় ৩৮
২৭ দেবীভাগবত, নবম স্কন্ধ, অধ্যায় ১
২৮। দেবীভাগবত, প্রথম স্কন্ধ, অধ্যায় ১৩
২৯। শিবপুরাণ, ধর্মসংহিতা, অধ্যায় ৪৪
৩০। কালিকাপুরাণ, অধ্যায় ২৩
৩১। মহাভারত, শান্তিপর্ব, পূর্বার্ধ, অধ্যায় ১৪৪
৩২। মহাভারত, অনুশাসনপর্ব, অধ্যায় ১৪
৩৩। মহাভারত, অনুশাসনপর্ব অধ্যায় ৩৮

(এই প্রবন্ধটি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে 'পৌরাণিক মনে স্ত্রী বিদ্বেষ' নামে প্রকাশিত হয়েছিল 'দেশ' পত্রিকায় ১৩৮৭ সনে।)

অষ্টম অধ্যায়

কৃচ্ছ্র ও বরদান

বরকে বলা যেতে পারে শাপের উলটো পিঠ। শাপ দিয়ে করা হত কোন ব্যক্তিবিশেষের ক্ষতি। আর বর দিয়ে করা হত কাউকে লাভবান। শাপ এবং বর, দুই ক্ষেত্রেই প্রায়শই ব্যবহার হত অলৌকিক ক্ষমতার। শাপ দিয়ে যে ক্ষতি করা হত, তা যেমন অনেক সময় হত এত বড় ধরণের যা অলৌকিক ক্ষমতার ব্যবহার ছাড়া করা সম্ভব হত না, তেমনি বরদানের দ্বারা যে-পরিমাণ লাভ আর-একজনের ক'রে দেওয়া সম্ভব হত, তা প্রায়শই লৌকিক উপায়ে করা সম্ভব হত না। শাপ দেওয়ার ঘটনার মধ্যে শাপদাতার যে অবিবেচনা, হঠকারিতা আর নীতিহীনতা প্রায় ব্যতিক্রম-হীনভাবে প্রকাশ পেত, বরদানের ক্ষেত্রেও নীতির দিক থেকে কোন উন্নততর মান লক্ষ্য করা যেত না। শাপদাতারা যেমন ছিলেন এক ধরণের অতিমানব—যাঁরা কারও কাছে কোন নৈতিক জবাবদিহির তোয়াক্কা রাখতেন না—বরদাতারাও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিলেন তা-ই। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী জমিদাররা মাতাল অবস্থায় যেমন মুহূর্তের উত্তেজনায় কারও সর্বনাশ করতেন, আবার কাউকে রাজাবাদশা বানিয়ে দিতেন, বরদান এবং শাপদানের ব্যাপারে ঐ অতিমানবদের ব্যবহার ছিল একই রকমে আতিশয্যদোষে দুষ্ট।

বর কারা দিতে পারতেন? দেবতারা তো বটেনই। বলাই বাহুল্য, অন্য-সব ক্ষমতার মতো বরদানের ক্ষমতাও সব দেবতার সমান পরিমাণে থাকত না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর আর বিভিন্ননামধারিণী শক্তিরূপিণী দেবীর যে ক্ষমতা ছিল, সেই ক্ষমতা নিশ্চয় অন্যান্য কম-ওজনের দেব-দেবীদের ছিল না। এই প্রভেদটা অবশ্য দেবদেবীদের মানুষ এবং অন্যান্য নিম্নস্তর যোনির জীবদের বরদানের ক্ষেত্রে প্রকাশ পেত না। এইসব ক্ষেত্রে বিষ্ণুই হোন আর ইন্দ্রই হোন, দুর্গাই হোন আর লক্ষ্মীই হোন—সকলেই ছিলেন সমপরিমাণে মুক্তহস্ত, দিলদরিয়া। কিন্তু নিম্নবর্গের কোন দেবতা উচ্চবর্গের কোন দেবতাকে কখনও বর দিয়েছেন বলে নজির পাওয়া যায় না। কিন্তু যেসব দেবতাদের নিয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাসকদের মধ্যে রেশারেশি ছিল—যেমন শিব, বিষ্ণু ও দেবী—তাঁদের মধ্যে কখনও একজন আরেক জনের কাছ থেকে বর প্রার্থনা করছেন, আবার অন্যত্র কোথাও তাকেই বরদান করছেন—এমনটা দেখা যায় স্বাভাবিকভাবেই। দেবীপুরাণে ব্রহ্মা আর বিষ্ণু বর গ্রহণ করেন মহাকালীর কাছ থেকে (১)। শিবপুরাণে ঐ দুজনই বর গ্রহণ করেন শিবের কাছ থেকে (২), যদিও মহাভারতে শান্তিপর্বে শিবকে ব্রহ্মার পুত্র বলে বর্ণনা করা হয় এবং বিষ্ণুর তুলনায় ব্রহ্মা আর শিবের লাঘমকে ব্রহ্মার মুখ দিয়ে এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছেঃ "আমি প্রজাগণের আদি ঈশ্বর ব্রহ্মা সেই পরমপুরুষ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছি এবং আমা হইতেই তাহার তোমার উৎপত্তি হইয়াছে; আমা হইতেই এই চরাচর জগৎ ও রহস্যসহ সম্পূর্ণ বেদ উদ্ভূত হইয়াছে। বাসুদেবাদি চার ব্যূহে বিভক্ত সেই পুরুষই যেরূপ ইচ্ছা হয়, সেইরূপে ক্রীড়া করেন।"(৩)

দেবতারা ছাড়া আর যাঁরা বর দিতে পারতেন তাঁরা হলেন বাঘাবাঘা মুনিঋষিরা। কিন্তু

দেবতাও নয়, মুনিঋষিও নয়, এমন সাধারণ ব্যক্তিরাও যেমন কখনও কখনও শাপ দেওয়ার ক্ষমতা রাখতেন, তেমনি তাঁদের কখনও কখনও বরও দিতে দেখা যায়। এইরকম অনেক ক্ষেত্রেই অবশ্য বরদানের মধ্যে কোন অলৌকিক ক্ষমতার প্রকাশ দেখা যায় না। সেইসব ক্ষেত্রে বরদানটা পুরস্কারপ্রদান বা উপহার দেওয়ার নামান্তর মাত্র। এই ধরণের পুরস্কারের উদাহরণ দশরথের কৈকেয়ীকে দেওয়া বর।

কিন্তু অলৌকিক বরও সাধারণ ব্যক্তিরা কখনও কখনও দিতেন। এইরকম বরের একটি উদাহরণ ভীষ্মকে দেওয়া শান্তনুর বর। আরেকটি উদাহরণ—যযাতির পুত্রদের দেওয়া বর। যযাতি তাঁর পুত্র পুরুকে যে বর দান করেন তা নিতান্তই লৌকিক, অন্য পুত্রদের বঞ্চিত করে তিনি তাঁর রাজত্ব পুরুকে দেন, তাঁর জরা গ্রহণ করে যৌবন প্রদান করার পুরস্কার হিসাবে। কিন্তু যদু, তুর্বসু, দ্রুহ্যু আর অনু—এই পুত্রচতুষ্টয়কে যে শাপ তিনি প্রদান করেন তার মধ্যে অলৌকিক ক্ষমতার প্রকাশ ছিল, যদিও সেই ক্ষমতার উৎস কী, সেই বিষয়ে কিছুই জানা যায় না। কারণ, সেই সময়ে যযাতি ছিলেন নিতান্তই ভোগে অতৃপ্ত ভোগী ব্যক্তিবিশেষ। (৪) একই কথা প্রযোজ্য শান্তনু সম্পর্কে। আস্তিককে জনমেজয় যে বরদান করেন, সেটাও ছিল নিতান্তই লৌকিক : আস্তিকের স্তাবকতায় তুষ্ট হয়ে জনমেজয় তাঁর সর্পযজ্ঞ বন্ধ করে দেন। (৫) কশ্যপ যে তাঁর দুই পত্নী বিনতা আর কদ্রুকে বর দান করেন, তার মধ্যে অলৌকিকতার স্পর্শটুকুই আছে মাত্র। তিনি পত্নীদের তাঁদের ইচ্ছানুরূপ সন্তান পাওয়ার বাঞ্ছা পূরণ করেন। কশ্যপ অবশ্য ছিলেন খুব বড়দরের ঋষি। কিন্তু তিনি ছিলেন ঐ দুই রমণীর পতি। তাঁদের গর্ভে তাঁর পক্ষে ইচ্ছানুযায়ী সন্তান উৎপাদন করা তৎকালীন পরিপ্রেক্ষিতে খুব একটা কিছু অলৌকিক ব্যাপার ছিল না। (৬) কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বরদান করতে পারতেন তাঁরাই যাঁরা ছিলেন বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী।

বরদানের ক্ষমতার বিষয়ে যেমন অধিকারভেদ ছিল, বরলাভের ব্যাপারেও তা ছিল। অবশ্য ব্যতিক্রম হিসাবে কেউ কেউ বিশেষ কোন চেষ্টা বা যোগ্যতা ব্যতিরেকেই বরলাভ করেছেন। উদাহরণ হিসাবে নল-দময়ন্তীর বিবাহ-সংক্রান্ত এই বিবরণটি নেওয়া যাক : "দময়ন্তী নিষধরাজ নলকে বরণ করিলে, মহাতেজস্বী দিক্‌পালগণ সকলে হৃষ্টচিত্তে নলকে আটটি বর দান করিলেন। শচীপতি ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া নলকে বর দিলেন যে, "আপনি যজ্ঞের সময়ে আমার প্রত্যক্ষ দর্শন পাইবেন এবং অন্তিমে শুভকর উৎকৃষ্ট স্বর্গলাভ করিবেন।" হুতাশন অগ্নি নলকে এই দুইটি বর দিলেন যে, নল যেখানে ইচ্ছা করিবেন, সেইখানেই অগ্নির আবির্ভাব হইবে ; আর তিনি অন্তিমকালে অগ্নিপ্রভায় স্বর্গলোক লাভ করিবেন। যম নলকে এই দুইটি বর দান করিলেন যে, নল যাহা পাক করিবেন, সেই বস্তুই সুস্বাদু হইবে এবং তিনি চিরকাল ধর্মপথে থাকিবেন। আর জলপতি বরুণ এই বর দিলেন যে, নল যেখানে ইচ্ছা করিবেন, সেইখানেই জলের আবির্ভাব হইবে। তারপর দেবতারা সকলেই এই বর দিলেন যে, আপনাদের একটি কন্যা ও একটি পুত্র হইবে। তাঁহারা পুনরায় নল ও দময়ন্তীকে উত্তমসৌরভযুক্ত এক-এক ছড়া মালা উপহার দিলেন"। (৭) এই বরদান বিবাহের উপলক্ষ্যে যৌতুকপ্রদানের থেকে ভিন্ন আর কিছু নয়।

এ যাবৎ যে বরদানের আলোচনা করেছি তা বরদাতার স্বাধীন ইচ্ছাকে প্রকাশ করে।

কিন্তু আরেক ধরণের বর আছে যা বরদাতার কাছ থেকে প্রায় জোর করে আদায় করে নেওয়া হত। জোর বলতে জবরদস্তি বোঝাচ্ছি না। বোঝাচ্ছি এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হওয়া যে অবস্থায় বরদাতা বর না দিয়েই পারেন না। এ অবস্থাটার সৃষ্টি কিভাবে হত তার মধ্যে খুব বৈচিত্র্য বা অস্পষ্টতা নেই—করা হত তপস্যার মারফত, কৃচ্ছ্রের দ্বারা।

২

বরের আলোচনা করতে গিয়ে আমরা এখন এমন একটি প্রসঙ্গে উপনীত হলাম যা প্রাচীন ভারতীয় ধ্যানধারণার মধ্যে এক কেন্দ্রীয় স্থান অধিকার করে। বরদানের প্রসঙ্গ ব্যতিরেকেও কৃচ্ছ্র এবং তপস্যার ধারণার অন্য কয়েকটি দিকের আলোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু তা করার আগে বরদানের সঙ্গে তপস্যার সম্পর্কটাকে আলোচনা করে নেওয়া যাক।

তপস্যা ছিল বর আদায় করার একটা যান্ত্রিক উপায় বিশেষ। পুরাণপ্রসিদ্ধ অধিকাংশ বরপ্রাপ্তির উপাখ্যানই উগ্র তপস্যার উপাখ্যান। অংশুমান কপিলমুনির কাছ থেকে বর পেয়েছিলেন বিনা তপস্যায়। কিন্তু গঙ্গাকে মর্ত্যে আনয়ন করার জন্য ভগীরথকে প্রথমে তপস্যা করতে হয় গঙ্গাকে সন্তুষ্ট করার জন্য। তারপর তপস্যা করতে হয় মহাদেবকে তাঁর জটায় গঙ্গাকে ধারণ করতে রাজী করানোর জন্য। সগররাজা যে এক পত্নীতে অংশুমান ও অপর পত্নীতে ষাট সহস্র পুত্রের উৎপাদন করতে সমর্থ হয়েছিলেন তাও মহাদেবকে তপস্যায় তুষ্ট করে।

কৃচ্ছ্র বা আত্মনিগ্রহ যত বেশি পরিমাণে করা হবে, ফলপ্রাপ্তিও ঘটবে তত বেশি পরিমাণে। এই নিয়মটা ছিল প্রায় অমোঘ। ফলে, তপস্যার অঙ্গ হিসাবে আত্মনিগ্রহের মাত্রা এবং তার বৈচিত্র্যের মধ্যে যে কল্পনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তা সত্যিই আশ্চর্য। তার কয়েকটি উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। বালখিল্য ঋষিগণ তপস্যা করতেন 'শাখায় অধোমুখে লম্বমান' ও 'সূর্যরশ্মিমাত্র পানকারী' অবস্থায় থেকে। (৮) যযাতি ''বাক্য ও মনকে সংযত করিয়া শুধুমাত্র জলপান করিয়া ত্রিশ বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন। তারপর তিনি বায়ু ভক্ষণ করিয়া এক বৎসর এবং পঞ্চাগ্নির মধ্যে অবস্থান করত এক বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন। অনন্তর এক পায়ে দাঁড়াইয়া বায়ু ভক্ষণে ছয়মাস তপস্যা করিয়াছিলেন।'' (৯) ''তারকাসুর প্রদীপ্ত সূর্যমণ্ডলের উপর দৃষ্টি অর্পিত করিয়া ঊর্ধ্ববাহু ও একপদে দণ্ডায়মান হইয়া তপস্যা করিয়াছিল এবং কেবল পাদাঙ্গুষ্ঠের উপর ভর করিয়া একশত বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিল। সে একশত বৎসর কেবল জলপান করিয়া ও একশত বৎসর কেবল বায়ুপান করিয়া তপস্যা করিয়াছিল। সেই অসুর একশত বৎসর জলে দণ্ডায়মান হইয়া, একশত বৎসর স্থণ্ডিলে অবস্থান করিয়া, একশত বৎসর অগ্নিমধ্যে স্থিতিপূর্ব, শতবৎসর অধোমুখ হইয়া এবং একশত বৎসর হাতের তলার দ্বারা মাটি স্পর্শ করিয়া তপস্যা করিয়াছিল। অহারপর সে একশত বৎসর বৃক্ষের শাখা অবলম্বন করিয়া তপস্যা করে। পরে অধোমুখ

হইয়া তপস্যা করত একশত বৎসর অতীত করে।" (১০) বিদ্যুন্মালী ও তারক নামক দুই দানব "হেমন্তে জলশয্যায় থাকিয়া—গ্রীষ্মে পঞ্চতপা হইয়া—বর্ষায় আকাশতলে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহাদের প্রিয় কলেবর ক্ষয় করিতে লাগিল। ফল, মূল, জল, পুষ্প এইসকল মাত্র তাহাদের ব্যবহার্য হইল। ..তাহাদের কলেবর নির্মাংস, কৃশ ও শিরাব্যাপ্ত হইল।" (১১) জরা-শব্দের অর্থ ক্ষয়, কারু-শব্দের অর্থ দারুণ। "সেই মহর্ষির শরীর সাতিশয় দারুণ ছিল, তিনি কঠোর তপস্যার দ্বারা ক্রমে ক্রমে সেই দারুণ শরীরকে ক্ষীণ করিয়াছিলেন, তন্নিমিত্ত তাঁহার নাম জারৎকারু হইল।" (১২) "মহামুনি মাণ্ডকর্ণি পঞ্চাসুর সরোবর নির্মাণ করিয়া ...জলাশয়ে থাকিয়া বায়ু ভক্ষণ করত দশ হাজার বৎসর কঠোর তপস্যা করেন।" (১৩) "অর্জুন কুশময় কৌপীন পরিধান করিয়া দণ্ড ও মৃগচর্ম ধারণপূর্বক প্রথমে ভূতলে পতিত শুষ্ক পত্রমাত্র ভোজন করিতেন। পরে তিন তিন দিনের পর এক-একটি ফল ভক্ষণ করিয়া একমাস অতিক্রম করিলেন ; তাহার পরে আবার ছয়-ছয় দিনের পর এক-একটি ফল ভোজন করিয়া দ্বিতীয় মাস অতিবাহিত করিলেন। তৃতীয় মাসে পনর-পনর দিনের পর এক-একটি ফল ভোজন করিলেন। তাহার পর যখন চতুর্থ মাস উপস্থিত হইল, তখন ভরতশ্রেষ্ঠ মহাবাহু অর্জুন কেবল বায়ু ভক্ষণ করিয়া রহিলেন। ঐ সময়ে অর্জুন কোন সাহায্য না লইয়াই কেবল চরণাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা ভূতলে দাঁড়াইয়া ঊর্ধ্ববাহু হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন।" (১৪)

অগ্নির মধ্যে বা জলের মধ্যে, বায়ুমাত্র ভক্ষণ করে, দীর্ঘকাল এক পায়ে বা এক অঙ্গুষ্ঠের উপর দাঁড়িয়ে থাকার দ্বারাও যখন অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না, তখন জোর করে বর আদায় করার জন্য কী ধরণের উপায় অবলম্বন করা হত তার উদাহরণ হিসাবে নেওয়া যায় সুন্দ-উপসুন্দের কীর্তিকে। "তাহারা মলিন শরীরে বায়ু ভক্ষণ করিয়া নিজ মাংস অগ্নিতে আহুতি দিয়া পাদাঙ্গুষ্ঠে দণ্ডায়মান হইয়া এবং ঊর্ধ্ববাহু হইয়া একদৃষ্টিতে দীর্ঘকাল তপস্যা করিল।" (১৫) তপস্যাকে জোরদার করার জন্য নিজ শরীরের উক্ত প্রকারের ব্যবহারের আরও অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন, "ভগবান্ ব্রহ্মা একসময় শতমুখ নামে এক অসুরকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই অসুর এক বর্ষের অধিক কাল পর্যন্ত অগ্নিতে নিজেরই মাংস আহুতি দিয়াছিল।" (১৬) বৃকসুরও নিজের শরীরের মাংস আহুতি দিয়ে শিবের তপস্যা করেন। তাতেও ফল না পেয়ে তিনি শিবচ্ছেদ করতে উদ্যত হন। তখন আর শিব আবির্ভূত না হইয়া পারেন না, বর না দিয়েই পারেন না। (১৭) এই জাতীয় আত্মনিগ্রহ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায় শ্রুতাবতী উপাখ্যানে। "বদর-পাচন-নামক শ্রেষ্ঠ তীর্থে এই ভামিনী বহু নিয়ম ধারণ করত সেখানে অত্যন্ত উগ্র তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি নিজের সেই তপস্যার এই উদ্দেশ্য নিশ্চিত করিয়াছিলেন যে, দেবরাজ ইন্দ্র আমার পতি হউন। ...তাঁহার এই আচরণ, তপস্যা ও পরাভক্তিতে ভগবান্ পাকশাসন ইন্দ্র অতিশয় প্রসন্ন হইলেন। এই শক্তিশালী দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মর্ষি মহাত্মা বশিষ্ঠের রূপ ধারণ করত তাঁহার আশ্রমে আসিলেন" এবং তাঁকে পাঁচটি বদর ফল পাক করতে দিলেন। "তারপর সেই মহাব্রতা কুমারী শ্রুতাবতী অতিশয় তৎপরতার সহিত সেই ফলসকল পাক করিতে লাগিলেন। এই ফল সকল পাক করিতে করিতে তাঁহার বহু সময় অতিবাহিত হইল, কিন্তু উহাদের পাক করিতে পারিলেন না। ইহার মধ্যে সেই দিন সমাপ্ত হইয়া যাইল। তিনি যে কাষ্ঠ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন,

তৎসমস্ত অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যাইল। তখন অগ্নিকে কাষ্ঠহীন হইতে দেখিয়া তিনি নিজের দেহকেই দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। দেখিতে মনোহরা সেই কন্যা প্রথমে নিজের দুই পদ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। এই পদ দুইটি যখন দগ্ধ হইয়া যাইল, তখন তিনি পরপর নিজেকেই আরও অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করাইতে লাগিলেন। তিনি নিজের দেহকে জ্বালাইয়া এরূপ প্রসন্ন হইলেন যে, যেন তিনি জলের মধ্যে রহিয়াছেন"। (১৮)

ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের পূর্বে তাঁর পিতা দিলীপও একই চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ব্যর্থ হয়েছিলেন। "তিনি পিতৃগণের নিধনের কথা শ্রবণ করিয়া দুঃখে পরিতপ্ত হইয়া তাঁহাদের সদ্‌গতির কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং গঙ্গাদেবীর অবতরণের জন্য সুমহৎ তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিলেও গঙ্গার অবতরণ হইল না।"(১৯) তপস্যা করে বিফল হওয়ার এই ঘটনা নিতান্তই ব্যতিক্রম। অপ্সরাদের পাঠিয়ে মুনিঋষিদের তপস্যা ভঙ্গ করানো—সে অন্য কথা। তপস্যা ভঙ্গ করানোর জন্য যে এ-জাতীয় উপায় অবলম্বন করতে হত, তাতেই প্রমাণ, তপস্যা সম্পূর্ণ করতে পারলে তা হত ফলপ্রদানে অব্যর্থ। যে দেবতার উদ্দেশে তপস্যা করা হচ্ছে, তিনি অবশ্য এসে বলতেন যে তিনি প্রীত হয়ে নিজেই বর দিতে চান। কিন্তু বস্তুত বর না দেওয়ার কোন উপায়ই তাঁর থাকত না। আগেই বলা হয়েছে, তপস্যাটা ছিল যেন এক যন্ত্রবিশেষ। প্রাচীন মনের প্রকৃতির নিয়ম সম্বন্ধে যে ধরণের ধারণা ছিল, সেই নিয়মের রাজত্বে তপস্যার ফল ফলত প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ করে নয়, নিয়ম অনুসরণ করেই। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁর অনবদ্য প্রবন্ধ "নিয়মের রাজত্বে" দেখিয়েছিলেন যে হাত থেকে ফেলে-দেওয়া প্রস্তরখণ্ড যদি ভূতলে পতিত হয় প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসরণ করে, তো গ্যাসভরা বেলুন যে আকাশের দিকে উড়ে যায়, তা প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ করে নয়—সেই নিয়ম অনুসরণ করেই। এও সেই রকমই। এই ধরণের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে আধুনিক যুগের মানুষের যে ধরণের আস্থা আছে, ঠিক সেই ধরণেরই আস্থা ছিল প্রাচীন কালের ভারতবাসীর তপস্যার যান্ত্রিক ক্ষমতায়। নিম্নলিখিত উক্তিটিতে এই বিশ্বাসটিকে বেশ খোলসা করে প্রকাশ করা হয়েছে: "মনুষ্য যাহা কিছু অসৎকার্যের অনুষ্ঠান করে, তপস্যার দ্বারা তৎসমুদয়ই নিরাকৃত হইয়া থাকে। যে কোন অভিসন্ধিতে তপ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা পূর্ণ হইতে কিছুমাত্র ব্যাঘাত উপস্থিত হয় না। এই জীবলোকে যাহা কিছু দুষ্প্রাপ্য ও দুরতিক্রমণীয় আছে, শাস্ত্রজ্ঞান ও তপঃপ্রভাবে তৎসমুদয়ই উপলব্ধ ও অতিক্রমণীয় হয়, সন্দেহ নাই। তপস্যার বল অতি আশ্চর্য। মদ্যপায়ী, চৌর্যনিরত, ভ্রূণঘাতী ও গুরুতল্পগামী পামরেরাও তপঃপ্রভাবে পাপবিমুক্ত হইয়া উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারে।" (২০) এই দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রকাশ পায় যে নীতিহীনতা, তার আলোচনা পরে করব। আপাতত আমাদের লক্ষ্য তপস্যার প্রাকৃতিক নিয়মের তুল্য অমোঘতা।

শুধু যে ফলপ্রদানেই তপস্যা প্রাকৃতিক নিয়মের মতো অব্যর্থ হত তাই নয়, তপস্যার দ্বারা বিশ্বপ্রকৃতি কিভাবে যে প্রভাবিত হত তারও অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। তারকাসুর তপস্যা করতে গিয়ে কী ধরনের কৃচ্ছ্র পালন করেছিল তা আগেই বলা হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে আরও বলা হয়েছে, "তপস্যা অনুষ্ঠান করিতে করিতে তাহার মস্তক হইতে মহৎ তেজ নিঃসৃত হইয়াছিল। ঐ তেজোদ্বারা দেবগণ দগ্ধপ্রায় হইয়াছিলেন।" (২১) বিদ্যুন্মালী ও তারকের তপস্যার বর্ণনাকালে লেখা হয়েছে, 'তাঁহাদের সেই দারুণ তপঃপ্রভাবে এ জগৎ নিষ্প্রভ ও

চঞ্চল হইয়া মন্দশ্রী ধারণ করিল। সেই তিন তপোনিমগ্ন দানবাগ্নি কর্তৃক এই ত্রিলোক দগ্ধ হইতে থাকিল।" (২২) সুন্দ ও উপসুন্দের তপস্যার সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "বিন্ধ্যাচল তাহাদের অত্যুগ্র তপঃপ্রভাবে তাপিত হইয়া ধূম মোচন করিতে লাগিল।" (২৩)

বরদানের প্রসঙ্গে তপস্যার দ্বারা সৃষ্ট তেজ বা শক্তির দুই প্রকারের প্রকাশ দেখা যায়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তাপিত করে উদ্দিষ্ট দেবতাকে বিচলিত করে তাঁকে দিয়ে বরদান করানোতে এক ধরণের শক্তির প্রকাশ। আর বরদান করানোর জন্য যে অলৌকিক ক্ষমতার প্রয়োজন, তারও উৎস ছিল বরদাতার তপস্যা। কোন ব্যক্তির কোন কাম্য উদ্দেশ্যের সিদ্ধির জন্য তপস্যা করা এক জিনিস। কিন্তু সর্বশক্তিমান দেবতারা অথবা সর্বোচ্চ স্তরের মুনিঋষিরা, যাঁদের কামনা করার কিছুই নেই বরং যাঁরা অন্যদের বরদান করার ক্ষমতা রাখেন, তাঁদেরও অনেক সময়ই ঘোর-তপস্যায় রত অবস্থায় দেখা যায়। মহাদেবও ঘোর তপস্যায় রত হতেন। বিষ্ণুও হতেন। ব্রহ্মা—যাঁর স্থান হরিহরের চেয়ে বেশ খানিকটা নীচে ছিল—তিনি তো হতেনই। এ'রাই তো দেবাদিদেব। এ'রাই তো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, পালনকর্তা এবং ধ্বংসকর্তা। এ'রা কী উদ্দেশ্যে তপস্যা করতেন? "মুনিশ্রেষ্ঠ" বিশ্বামিত্রের চরিত্রে লোভ, ক্রোধ, ঈর্ষা প্রভৃতি শাস্ত্রনিন্দিত সব দোষই খুব বেশি মাত্রায় ছিল। তিনি যে ইন্দ্রত্বলাভের লোভে ঘোর তপস্যায় রত হবেন, তা মেনে নিতে অসুবিধা হয় না। আর মেনকাকে নগ্নাবস্থায় দেখামাত্রই যে তাঁর তপস্যা ভগ্ন হবে, তাও তাঁর চরিত্রের সঙ্গে ভালভাবেই সংগতিপূর্ণ। কিন্তু অন্যান্য অনেক মুনিঋষিকেই ইন্দ্রত্বলাভ বা অন্য কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই তপস্যা করতে দেখা যায়। আপাতদৃষ্টিতে এই যে রহস্য, তার সমাধানের ইঙ্গিত পাওয়া যায় পত্নী লোপামুদ্রার কোন অনুরোধে বিব্রত অগস্ত্যের নিম্নলিখিত উক্তিতে: "উহাতে আমার সঞ্চিত তপস্যার অনেক অংশ ব্যয় করিতে হইবে; যাহাতে আমার কষ্টোপার্জিত তপস্যা ব্যয় না করিতে হয়, এইরূপ উপায় বলিয়া উৎসাহিত কর।"(২৪) তপস্যার দ্বারা এমন শক্তির সৃষ্টি করা সম্ভব হত যাকে সঞ্চয় করে রাখা যেত! এবং যার থেকে আবার প্রয়োজনমত কোন অংশকে ব্যয় করাও যেত! ঠিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মতো। তপস্যা অর্জিত ফলকে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মতো ব্যবহার করার অন্য উদাহরণ পাওয়া যায়। কুনিগর্গনামক মহর্ষির পরম রূপবতী কন্যা পরিণয়ে অসম্মতি প্রকাশ করে কঠোর তপস্যায় জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি পরলোকগমনে মনস্থির করলে নারদ তাঁহাকে বলেন, "তোমার তো এখনও বিবাহ সংস্কার হয় নাই, তুমি এখনও কন্যা; সুতরাং তুমি পুণ্যলোক প্রাপ্ত হইবে কিরূপে?... তুমি অতিশয় কঠোর তপস্যা করিয়াছ; কিন্তু পুণ্য লোকের উপর অধিকার তোমার হয় নাই।...নারদের এই কথা শ্রবণ করত তিনি ঋষিগণের সভায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন—হে সাধুত্তম! আপনাদের মধ্যে যে কেহ আমার পাণিগ্রহণ করিবেন, আমি তাঁহাকে আমার তপস্যার অর্ধভাগ প্রদান করিব।" গালবকুমার মহর্ষি শৃঙ্গবান "বিবাহের পর তোমাকে আমার সহিত একরাত্রি বাস করিতে হইবে"—এই শর্তে বৃদ্ধা কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। "রাত্রিতে তিনি দিব্যবস্ত্রাভরণে বিভূষিতা ও দিব্যগন্ধযুক্ত অঙ্গরাগে অলঙ্কৃতা পরমাসুন্দরী তরুণী হইয়া যাইলেন," এবং দুইজনে একরাত্রি বাস করার পর "সাধ্বী তপস্বিনী দেহত্যাগ করত স্বর্গলোকে গমন করিলেন।"(২৫) শৃঙ্গবানও তাঁর তপস্যার অর্ধাংশ প্রতিগ্রহণ করে তাঁর পত্নীর অনুগমন করলেন। এই যে দেওয়া-নেওয়ার কারবারটা ঘটল, তা যদি তপস্যার ফলের না হয়ে সঞ্চিত অর্থের অর্ধভাগের বিনিময়ে ঘটত তো তা নিশ্চয় খুব অন্যরকম শোনাত না।

বস্তুত, বিশ্বসৃষ্টির মূলে যে শক্তি কাজ করছে তাও তপস্যা-অর্জিত শক্তিই। শুধু যে "আদিত্য, বসু, রুদ্র, অগ্নি, বিশ্বদেব, সাধ্য, পিতৃলোক, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও অশ্বিনী-কুমার প্রভৃতি স্বর্গবাসী দেবগণ একমাত্র তপঃপ্রভাবেই সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইয়াছেন" তাই নয়, "ভগবান প্রজাপতি বিবিধ ব্রত অবলম্বন পূর্বক তপোনুষ্ঠান করিয়াই প্রজাবর্গের সৃষ্টি করিয়াছেন।"(২৬) প্রজাসৃষ্টির জন্য প্রয়োজন যে বিপুল শক্তির তা যখন ব্রহ্মার মতো পরম দেবতা তপস্যার দ্বারা অর্জন করেছিলেন, তখন ইতরস্তরের মানুষ আর দেবতারা যে তপস্যার ফল হিসেবে অনেক নিম্নস্তরের ক্ষমতা অর্জন করতে পারবেন যা প্রায় জাদুবিদ্যার প্রকারান্তর মাত্র, তা সহজবোধ্য। মহাত্মা বেদব্যাস যে "তপঃপ্রভাবে" কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিহত কুরুপাণ্ডবদের একবার তাঁদের জীবিত আত্মীয়দের দৃষ্টিগোচর করিয়েছিলেন তা নিশ্চয় হিপ্‌নোটিজম্ জাতীয় বিদ্যার কেরামতি।

৩

তপস্যা এবং বরের ধারণার সঙ্গে কোন প্রকার নৈতিকতার সম্পর্ক হয় একেবারেই অনুপস্থিত নয়তো সে সম্পর্ক বৈপরীত্যের। অর্থাৎ তপস্যা করার মধ্যে, বর কামনা করার মধ্যে এবং বর প্রদান করার মধ্যে হয় কোন হিতাহিতচিন্তা একেবারেই নেই, নয়তো তার পিছনে যে মানসিকতাকে পাওয়া যায় তার মধ্যে রয়েছে লোভ, হিংসা, দ্বেষ, ইত্যাদি যেসব বৃত্তিকে আমাদের শাস্ত্রে বর্জনীয় বলে প্রচার করা হয়েছে। বিশ্বামিত্র যখন ইন্দ্রত্বলাভের জন্য তপস্যা করেন তখনও তাঁর কৃচ্ছ্রের পিছনে রয়েছে নিছকই লোভ। সেই একই নিছক লোভ কাজ করে যখন তিনি তপস্যা করেন ব্রাহ্মণত্বলাভের জন্য। বশিষ্ঠের তপস্যাজনিত তেজের প্রমাণ পেয়ে বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব অর্জনের জন্য এইভাবে উঠেপড়ে লেগে পড়েন: "মহারাজ বিশ্বামিত্র ব্রহ্মতেজঃসম্ভূত এই সুমহৎ-ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং ক্ষত্রিয়ভাবের প্রতি নিতান্ত বিরাগ প্রদর্শনপূর্বক কহিতে লাগিলেন, 'ক্ষত্রিয়বলে ধিক, ব্রহ্মতেজই যথার্থ বল। বলাবল নির্ণয়স্থলে তপোবলবেই পরমবল বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে হয়।' এইরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি অতি বিস্তীর্ণ রাজ্য, অসামান্য রাজলক্ষ্মী ও কমনীয় বস্তুর ভোগাভিলাষ এককালে পরিত্যাগপূর্বক তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন।"(২৭)

ব্রাহ্মণেরা তাঁদের ব্রাহ্মণত্বকে স্বাভাবিকভাবেই আর সকলের নাগালের বাইরে রাখতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। সুতরাং ঘোরতর তপস্যা করে ইন্দ্রত্বলাভ যদি বা সম্ভব ছিল, ব্রাহ্মণত্বলাভ ঐ বিশ্বামিত্রের ব্যতিক্রমটা বাদ দিলে প্রায় কখনই কারও আয়ত্তের সীমানায় পড়ত না। এই প্রসঙ্গে মতঙ্গের উপাখ্যান স্মরণ করা যেতে পারে। মতঙ্গ ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্মলাভ করলেও চণ্ডাল বলে পরিচিত ছিলেন, কারণ তিনি "যৌবনে মদমত্তা এক ব্রাহ্মণীর উদর হইতে শূদ্রজাতীয় কোন এক নাপিতের দ্বারা জন্মলাভ" করেছিলেন। ব্রাহ্মণত্বলাভের জন্য মতঙ্গ "তপস্যায় নিরত থাকিয়া দেবগণকে সন্তাপিত করিয়া দিলেন।" কিন্তু ইন্দ্র তাঁকে এসে বললেন, তুমি যে ব্রাহ্মণত্ব প্রার্থনা করিতেছ, তাহা তোমার পক্ষে দুর্লভ।... দুর্বুদ্ধে! তুমি ব্রাহ্মণত্ব প্রার্থনা করিতে করিতে মরিয়া যাইবে, তথাপি তাহা লাভ করিতে সমর্থ হইবে না।"(২৮)

উমার কঠোর তপস্যার উদ্দেশ্য ছিল খোদ মহাদেবকে পতি হিসাবে লাভ করা। সমর্থও তিনি হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ঐ কঠোর প্রচেষ্টার মধ্যে কোন পরার্থপরতা নিশ্চয়ই ছিল না। শুধু যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তপস্যার উদ্দেশ্য কোন স্বার্থসিদ্ধি ছিল তাই নয়, অনেক সময়ই অপর কোন ব্যাক্তির ক্ষতিসাধন করার জন্যও তপস্যা করা হত। যেমন অম্বা তপস্যা করেছিলেন ভীষ্মের বিনাশের জন্য। "সে ভোজন ত্যাগ করায় অত্যন্ত ক্ষীণ ও রুক্ষ হইয়া পড়িল এবং তাহার মস্তকে জটা দেখা যাইল এবং দেহে মল ও পঙ্ক জন্মিল। সেই তপোধনা কন্যা ছয়মাস কেবল বায়ুপান করত শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর এক বৎসর যমুনার জলে প্রবেশ করিয়া ভোজন পরিত্যাগ করত সেই ভাবিনী রাজকন্যা জলেই বাস করিয়া তপস্যা করিতে লাগিল। তদনন্তর তীব্র কোপাবিষ্টা হইয়া অম্বা পদের অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলির সাহায্যে দাঁড়াইয়া স্বতঃই পতিত শুষ্কপত্র ভক্ষণ করত এক বর্ষ অতিবাহিত করিল। এইরূপে বারবৎসর কঠোর তপস্যায় সংলগ্ন থাকিয়া অম্বা পৃথিবী ও আকাশকে সন্তপ্ত করিতে লাগিল।"(২৯)

আরেকটি উদাহরণ দলভ্‌পুত্র বকঋষির তপস্যার দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যক্ষয় ঘটানো। বকঋষি ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গিয়ে যজ্ঞের দক্ষিণা হিসাবে কিছু পশু যাচ্‌ঞা করেন। ধৃতরাষ্ট্র খামকা অত্যন্ত কুপিত হয়ে এইপ্রকার বাক্য বলেন: "অরে নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ! তুমি যদি পশু প্রার্থনা কর, তবে এই নিহত পশুদিগকে শীঘ্র লইয়া যাও"। তারপর "রোষাবিষ্ট হইয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ দাল্‌ভ্য রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বিনাশের জন্য মনঃস্থির করিলেন। সরস্বতী 'অবকীর্ণ' তীর্থে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া মহাতপস্বী দলভ্‌পুত্র বক উত্তম নিয়ম অবলম্বন করত সেই মৃত পশুগণের মাংসের দ্বারা তাঁহার রাষ্ট্রের হোম করিতে থাকিলেন। এই ভয়ঙ্কর যজ্ঞ যখন হইতে বিধি অনুসারে আরম্ভ হইল, তখন হইতেই ধৃতরাষ্ট্রের রাষ্ট্র ক্ষীণ হইয়া যাইতে লাগিল"। (৩০)

স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত না হয়ে তপস্যা করার উদাহরণ প্রাচীন সাহিত্যে প্রায় পাওয়া যায় না বললেই চলে। একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম—অরুন্ধতী। সব বিষয়েই তাবৎ দেবদেবী, ঋষি আর ঋষিপত্নীদের তুলনায় এই মহীয়সী নারীকে আশ্চর্য রকমের দৃঢ় এবং নির্মল চরিত্রের অধিকারিণীরূপে দেখানো হয়েছে। তাঁর দ্বারা অনুষ্ঠিত দুটি নিঃস্বার্থ তপস্যার কথা প্রচারিত আছে। "পূর্বে ব্রহ্মা নিজ তনয়া সন্ধ্যাকে দেখিয়া সকামচিত্ত হন। পরে কন্যা বলিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করেন। ব্রহ্মার মানসপুত্র মহাত্মা ঋষিগণের সমক্ষে সন্ধ্যারও স্মর-শর-বিলোড়িত চিত্তচঞ্চল হইয়াছিল। সন্ধ্যা এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে চিন্তা করিলেন। এবং চন্দ্রভাগা নদীর উৎপাদক চন্দ্রভাগ নামক গিরিবরে গমন করিলেন"। (৩১) সেখানে "বশিষ্ঠমুনি সন্ধ্যাকে ন্যায্যমত তপশ্চর্যা শিক্ষা দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। এইরূপে নারায়ণগত চিত্তে তাঁহার চারিযুগ কাটিয়া গেল। জগৎপতি বিষ্ণু, সন্ধ্যা যেরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন, অন্তরে বাহিরে এবং জীবাত্মাকে সেইরূপ দেখাইয়া তাঁহার প্রত্যক্ষগোচর হইলেন"। বিষ্ণুর কাছ থেকে সন্ধ্যা নিম্নলিখিত বর দুইটি চেয়ে নেন। এক. "পৃথিবীতলে প্রাণিগণ উৎপন্ন হইবামাত্র যেন সকাম না হয়, কিন্তু কালক্রমে যেন সকাম হয়।" আর "আমি যেন ত্রিজগতে পতিব্রতা বলিয়া বিখ্যাত হই"। (৩২)

অরুন্ধতীর তপস্যা সম্পর্কে দ্বিতীয় উপাখ্যানটি এইরকম: "এক সময় সপ্তর্ষিগণ এই

মঙ্গলময় শ্রেষ্ঠতীর্থে অরুন্ধতীকে পরিত্যাগ করিয়া হিমালয় পর্বতে গিয়াছিলেন। জীবিকার ইচ্ছায় তাঁহারা যখন হিমালয়ের বনে বাস করিতেছিলেন, তখন বার বর্ষকাল এই দেশে বৃষ্টি হয় নাই। সেই তপস্বী মুনিগণ সেখানে আশ্রম নির্মাণ করত বাস করিতে লাগিলেন। সেই সময় কল্যাণী অরুন্ধতীও প্রতিদিন তপস্যায় নিরতা ছিলেন। তারপর মহাযশস্বী মহাদেব ব্রাহ্মণের রূপধারণ করত তাঁহার নিকটে যাইয়া বলিলেন—শুভে! আমি ভিক্ষা চাইতেছি। তুমি এই বদরসকল পাক করিয়া দাও। তিনি এইরূপ আদেশ দান করিলে পর যশস্বিনী অরুন্ধতী ব্রাহ্মণের প্রিয় করিবার ইচ্ছায় সেই বদরফলসকল প্রজ্বলিত অগ্নিতে স্থাপিত করিয়া পাক করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার মধ্যেই সেই বার বৎসরের ভয়ঙ্কর অনাবৃষ্টি শেষ হইয়া যাইল। ইহার পর ভগবান শঙ্কর পুনরায় অরুন্ধতীকে বলিলেন—"কল্যাণি! তোমার মনে যে অভিলাষ রহিয়াছে, তদনুসারে বর প্রার্থনা কর।" তখন বিশাল ও অরুণ-নেত্রযুক্ত অরুন্ধতী সপ্তর্ষিগণের সভায় মহাদেবকে বলিলেন—"ভগবন্! যদি আপনি আমার উপর প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই স্থান 'বদরপাচন' নামে প্রসিদ্ধ হইয়া সিদ্ধ ও দেবর্ষিগণের প্রিয় এবং অদ্ভুত এক তীর্থে পরিণত হউক।" (৩৩)

এই অরুন্ধতীর ব্যতিক্রম বাদ দিলে তপশ্চর্যার সঙ্গে স্বার্থান্বেষণের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। এই ঘনিষ্ঠতা যদি তপস্যাসম্পর্কিত নীতিহীনতার একদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে, তো ঐ নীতিহীনতার অপর একদিকে প্রকাশ লাভ করে বরদাতাদের মনোভাব। তপস্যার দ্বারা সৃষ্ট ক্ষমতাকে যদি অনপনেয় বলে মনে করা হয় তো বরদাতাদের মধ্যে আপাত দর্শনে যাকে চাটুপ্রিয়তা বলে মনে হতে পারে সেই দোষের মাত্রা কমে যায়। কিন্তু তপস্যাকারীকে বর দিতেই হবে—এইকথা মেনে নিলেও, বর দেওয়ার সময় দেবতা বা ঋষিগণ যে অবিমৃষ্য-কারিতার পরিচয় দেন তাকে কোনভাবেই ক্ষমার চোখে দেখা যায় না। তাঁদের বরদানের মধ্যে প্রায়শই প্রকাশ পেত যে মনোভাব তা যুক্তিহীন, বুদ্ধিহীন, উন্মাদসদৃশ, অপরিচ্ছন্ন, কিম্ভূতকিমাকার। উদাহরণ হিসাবে নেওয়া যাক সগর রাজার বরপ্রাপ্তির উপাখ্যানটি। "সেই রাজা পুত্রকামনায় পত্নীদ্বয়ের সহিত হিমালয় পর্বতকে আশ্রয় করিয়া তীব্র তপস্যা করিতে লাগিলেন। যোগ অবলম্বন করিয়া দুশ্চর তপস্যার দ্বারা ত্রিলোচন পিণাকপাণি ত্রিপুরারিকে সন্তুষ্ট করিলে তিনি তাঁহাকে দর্শন দিলেন। তিনি ভার্যাদ্বয়ের সহিত তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পুত্রলাভের জন্য বর প্রার্থনা করিলেন। তখন উমাপতি ভার্যার সহিত রাজাকে বলিলেন, 'তোমার ষাট হাজার পুত্র একই পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে'। তাঁহার দুই পত্নী বৈদর্ভী ও শৈব্যাই যথাকালে গর্ভধারণ করিলেন; কিন্তু বৈদর্ভী যথাসময়ে অলাবু (লাউ) প্রসব করিলেন। তখন আকাশ হইতে মেঘগম্ভীর স্বরে কথিতা বাণী শুনিতে পাইলেন। "ঐ অলাবু হইতে বীজগুলি বাহির করিয়া ঘৃতপূর্ণ পাত্রে রক্ষা করত সযত্নে উহাদের পাহারা দাও" ইত্যাদি। (৩৪)

এই-জাতীয় অদ্ভুত রস বরদানের উপাখ্যানে যথেষ্ট পাওয়া গেলেও যা অনেক বেশি প্রাধান্য লাভ করে তা হল ভয়ঙ্কর রস। যে বরলাভের ফলে কোন দুষ্কৃতিকারী অসুর বা দানব সমস্ত সংসারকে লণ্ডভণ্ড করে দেয়, সমস্ত শান্তিপ্রিয় জীবেদের চূড়ান্ত নিগ্রহ ঘটায়, সেইরকম বরকে নিশ্চয় ভয়ঙ্কর বলা যায়। এই ধরণের বরদানের উপাখ্যান পৌরাণিক সাহিত্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। কাহিনীগুলির সবকটিই একেবারে একই ছাঁচে

ঢালা। ছাঁচটি এই প্রকার। কোন দুষ্কৃতিকারী অসুর বা দানব কোন ক্ষমতাশালী দেবতাকে স্মরণ করে আত্মনিগ্রহ করতে শুরু করে। জলকে ১০০ ডিগ্রী পর্যন্ত উত্তপ্ত করলে জল যেমন বাষ্প হয়ে যাবে ঠিক তেমনি অমোঘ নিয়মে আত্মনিগ্রহ কোন একটা মাত্রা অর্জন করার পর সেই দেবতা আবির্ভূত হয়ে বলেন, 'বৎস, প্রীত হয়েছি, বর প্রার্থনা কর।' দুষ্কৃতিকারী অসুর বা দানব এমন বর প্রার্থনা করে যার দ্বারা তারা সাধারণ যে-কোন প্রতি-পক্ষের সঙ্গে সংগ্রামে অজেয় হতে পারে। বিন্দুমাত্র অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে সেই দেবতা 'তথাস্তু' বলে বর দিয়ে দেন। তারপর শুরু হয়ে যায় তুলতামাল। অত্যাচারে অনাচারে বিশ্বসংসারের অন্তিমদশা উপস্থিত হয়। তারপর শান্তির পুনঃস্থাপনের জন্য সেই দেবতাকেই তাঁরই দেওয়া বরের মধ্যে নিহিত কোন ছিদ্রের মধ্য দিয়ে সেই অসুর বা দানবের বিনাশের উপায় করে দিতে হয়। এইখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বিশ্ব-সংসারের অধিবাসী জীবসকলকে কোন কারণে শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ায় যে তাদের এই নিগ্রহ পেতে হয় তা নয়। তাদের নিগৃহীত হতে হয় বরদাতা দেবতার হিতাহিতজ্ঞানশূন্য খামখেয়ালের দরুণ। রাবণের বরপ্রাপ্তি, সুন্দ-উপসুন্দের দ্বারা বিশ্ব-সংসার ছারখার হওয়া, তারকাসুরের অত্যাচারে সংসারের বিপর্যস্ত হওয়া—এসবই ঐ একই ছাঁচের উপাখ্যান।

দেবতাদের নীতিহীনতাকে যে কত সহজ আর স্বাভাবিক ভাবে মেনে নিয়ে তাদের কীর্তিকলাপ প্রচার করা হত তার উদাহরণ হিসাবে সুন্দ-উপসুন্দের কাহিনী থেকে সামান্য খানিকটা উদ্ধৃত করা যাক: "ত্রৈলোক্যকে জয় করিবার জন্য উভয়ে একমত হইয়া তপস্যায় দীক্ষা গ্রহণ করত বিন্ধ্যাচলে উগ্র তপস্যা করিতে গেল। অনন্তর দেবগণ তাহাদের উগ্র তপস্যা দর্শনে উদ্বিগ্ন হইয়া তপোবিঘ্ন সম্পাদনের জন্য চেষ্টা করিলেন। স্ত্রী ও রত্নসমূহ প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে প্রলোভিত করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু মহাব্রতধারী তাহারা দুইজনে মোটেই বিচলিত হইল না। সকল লোকের হিতকারী পিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং তাহাদের নিকট আবির্ভূত হইয়া বর দিতে চাহিলেন। সুন্দ ও উপসুন্দ বলিল—'হে পিতামহ! এই তিনলোকে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক যত প্রাণী আছে, আমরা উভয়ে যেন তাহাদের কাহারও দ্বারা বধ্য না হই: কেবল আমাদের উভয়ের মধ্যে কলহ হইলেই যেন আমরা বধ্য হই।' অনন্তর পিতামহ তাহাদিগকে বরপ্রদান করত তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করিয়া স্বধাম ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর বর লাভ করিয়া দৈত্যরাজ ভ্রাতৃদ্বয় সকল প্রাণীর অবধ্য হইয়া নিজ গৃহে গমন করিলেন। তখন তাহারা জটা পরিত্যাগ করত মস্তকে মুকুট, সর্বাঙ্গে আভরণ এবং পরিধানে পরিচ্ছন্ন বস্ত্র ধারণ করত সর্বদা সুহৃদগণে পরিবৃত হইয়া আনন্দোৎসবে মত্ত হইল। উৎসব নিবৃত্ত হইলে সুন্দ ও উপসুন্দ উভয়ে ত্রৈলোক্য বিজয়ের আকাঙ্ক্ষায় মন্ত্রণাপূর্বক সেনাবাহিনীকে সজ্জিত হইতে আজ্ঞা করিল। চারণগণ বিজয়-সূচক মঙ্গলময় স্তুতি করিতে লাগিল। এইরূপে স্তুতিগান শুনিতে শুনিতে তাহারা উভয়ে আনন্দে ত্রৈলোক্য বিজয়ে বাহির হইল। তীব্র পরাক্রমী তাহারা উভয়ে ইন্দ্রলোক জয় করিয়া যক্ষ, রাক্ষস ও খেচর প্রাণিগণের দিকে ধাবিত হইয়া তাহাদিগকে পীড়ন করিতে লাগিল। যে-সকল দ্বিজ যজ্ঞ করেন এবং অন্যের দ্বারা যজ্ঞ করান, তাহাদিগকে বলপূর্বক হত্যা করিয়া মহাবলী দুইজনে অগ্রসর হইতে লাগিল। আশ্রমে প্রবেশ করিয়া শুদ্ধাত্মা মুনিগণের অগ্নিহোত্রের

উপকরণসমূহ সৈনিকগণ নির্ভয়ে জলে ফেলিয়া দিতে লাগিল। রাজা ও ব্রাহ্মণগণ বিনষ্ট হওয়াতে সমস্ত পৃথিবীতে যজ্ঞ ও বেদাধ্যয়ন লুপ্ত হইল এবং জনসমুদায়মধ্যে যজ্ঞাদি উৎসব বন্ধ হইল। ভূতলে মনুষ্যগণ ভয়ার্ত হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল, হাটে বাজারে কেনা-বেচা বন্ধ হইল, দেবকার্য নিবৃত্ত হইল এবং পুণ্য বিবাহ-উৎসব বর্জিত হইল। কৃষি ও গোপালন বন্ধ হইল, নগর ও আশ্রমসমূহ বিধ্বস্ত হইল, অস্থি ও কঙ্কালসমূহে পৃথিবী ছাইয়া গেল; ফলে পৃথিবী দেখিতে অতি ভয়ানক হইল। অনন্তর দেবর্ষি, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ জগতের এইরূপ ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। সেই-সকল জিতক্রোধ, জিতেন্দ্রিয় ও জিতাত্মা মহর্ষিগণ জগজ্জনের প্রতি কৃপাপরায়ণ হইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। সুন্দ ও উপসুন্দ যাহা যাহা করিয়াছে, তৎসমুদায় আনু-পূর্বিক যথাবৎ বর্ণনা করিলেন। তাহাদের কথা শুনিয়া পিতামহ ক্ষণকাল চিন্তা করত যথাকর্তব্য নিশ্চয় করিয়া তাহাদের বধের জন্য বিশ্বকর্মাকে ডাকিলেন"। (৩৫) বিশ্বকর্মার দ্বারা তিলোত্তমার সৃষ্টি এবং ব্রহ্মার আদেশে তিলোত্তমার দ্বারা ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে কামের উদ্রেক ঘটিয়ে পরস্পরের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি করা এবং পরস্পরের হাতে তাদের নিহত হওয়ার উপাখ্যান সকলেরই বিদিত। উপাখ্যানটি মনোহর সন্দেহ নেই, কিন্তু মনে প্রশ্ন না উঠেই পারে না। সুন্দ-উপসুন্দকে না হয় শেষ পর্যন্ত বিনাশ করে ব্রহ্মা বিশ্বসংসারের পুনরুদ্ধার ঘটালেন। কিন্তু তার আগে বিশ্বসংসারের অধিবাসীদের যে চরম দুর্গতি হল তার কারণও তো সেই ব্রহ্মা নিজেই। আমাদের উদ্ধৃত অংশের কোন এক জায়গায় ব্রহ্মাকে "সকল লোকের হিতকারী" বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু বর্ণনাটি কি সঠিক? হিতাহিত সম্বন্ধে কোন প্রকার সচেতনতার চিহ্নই তো তাঁর ব্যবহারে পাওয়া যায় না। একবার দুষ্কৃতি-কারীর স্তাবকতায় প্রীত হয়ে তার দুষ্কর্ম করার ক্ষমতাকে সীমাহীনভাবে বাড়িয়ে তুললেন। তারপর আবার দেবতাদের স্তাবকতায় তুষ্ট হয়ে সেই দুষ্কৃতিকারীর নিধনের ব্যবস্থা করে দিলেন। এর মধ্যে নিতান্তই আত্মম্ভরিতা ছাড়া আর কোনো গুণের প্রকাশ পায় কি?

ঐ একই স্তাবকতাপ্রীতির প্রকাশ রাবণের বরপ্রাপ্তির মধ্যে। "দশানন রাবণ দশহাজার বৎসর উপবাসী থাকিয়া তপস্যা করিয়াছিল। সহস্র বর্ষ পূর্ণ হইলেই নিজ এক-একটি মস্তক কাটিয়া অগ্নিতে আহুতি দিত। এইরূপে নয় হাজার বৎসর রাবণের গত হইল। এবং অগ্নিতে নয়টি মস্তক আহুতি দেওয়া হইয়া গেল। তারপর পুনরায় একহাজার বৎসর পূর্ণ হইলে দশগ্রীব যখন নিজ দশম মস্তক কাটিতে উদ্যত হইল তখন পিতামহ ব্রহ্মা তথায় উপস্থিত হইলেন। পিতামহ ব্রহ্মা অত্যন্ত প্রসন্নচিত্তে দেবতাগণের সহিত রাবণসমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"হে দশগ্রীব! আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছি। তোমার মনে যে বরলাভের ইচ্ছা আছে, উহা শীঘ্র প্রার্থনা কর।" (৬) ব্রহ্মার বরে ক্ষমতাশালী হয়ে রাবণ কিভাবে ত্রিভুবনকে অত্যাচারের দ্বারা সন্তাপিত করে তোলে, যে অত্যাচারের প্রতি-বিধানের জন্য বিষ্ণুকে নররূপে অবতীর্ণ হতে হয়, সে কাহিনী সুপরিচিত। কিন্তু বিশ্ব-সংসারকে সন্তাপিত হতে হত না, সীতাকে নির্যাতিত হতে হত না, রাম-রাবণের যুদ্ধও ঘটত না যদি না ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করার যান্ত্রিক উপায় সকলের জানা থাকত এবং যদি না প্রসন্ন হওয়ার মানেই হত একেবারে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়া।

চূড়ান্ত রকমের গুরুত্বপূর্ণ অত্যন্ত সামান্য-সংখ্যক মূল কয়েকটি নীতিকে বাদ দিলে আর

সবকিছুর ব্যাপারেই স্ববিরোধিতা আর অসংগতি আমাদের শাস্ত্রীয় বিচারের একটি প্রধান লক্ষণ। যে কোন কথাই শাস্ত্রে এক জায়গায় বলা হয়েছে, তার সম্পূর্ণ বিপরীত কোন কথাকে শাস্ত্রে কোথাও না কোথাও আবিষ্কার করা যাবেই। তপস্যা সম্পর্কে যে মনোভাবের কথা এযাবৎ আলোচনা করলাম, ঠিক তার বিপরীত মনোভাব দু-এক জায়গায় না পাওয়া গেলে ব্যাপারটা আশ্চর্যের হত। এবং দুই-একটি জায়গায় যে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ দেখা যায় তা বেশ উচ্চমার্গের। উদাহরণ হিসাবে নেওয়া যাক নিম্নলিখিত বক্তব্যটিকেঃ "যাহারা প্রকৃত ভক্ত, তাহাদের বনে গিয়া তপস্যা করিবার প্রয়োজন নাই। সকাম হইয়া দেবীর আরাধনা করিলেও যখন সিদ্ধিলাভ হয়, তখন নিষ্কাম হইয়া কার্য করিলে আর তাহাকে স্বতন্ত্র বনে গিয়া তপস্যা করিতে হইবে কেন।" (৩৭) আরও উচ্চতর মার্গের চিন্তার পরিচয় পাই নিম্নলিখিত উক্তিতেঃ "অহিংসা, সত্যকথন, কোমলতা, সংযম ও সর্বভূতে দয়া,—জ্ঞানীরা এইগুলিকে তপস্যা বলিয়া মনে করেন, কেবলমাত্র শরীরশোষণকে তপস্যা বলেন না।" (৩৮) কিন্তু এ নিতান্তই ব্যতিক্রম।

অপর একটি উল্লেখযোগ্য চিন্তা এই প্রকারঃ "তপস্যা সর্বসাধারণের ধর্ম। দয়াদাক্ষিণ্য-বিহীন শূদ্রাদি হীনবর্ণের উহাতে অধিকার আছে।" (৩৯) উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সমপরিমাণ অধিকারের উদাহরণ আমাদের শাস্ত্রে বিরল।

৪

আধুনিক ভারতীয় মনে কৃচ্ছ্রের সঙ্গে মহত্ত্বের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখা যায় তার উৎসে আছে তপস্যাসম্পর্কিত প্রাচীন মনের ধারণা একথা মনে করা যুক্তিসংগত। আজকের দিনের ভারতবর্ষেও যেসব সাধক ব্যক্তিদের সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা আর ভক্তি নিবেদন করা হয়, তাঁদের অধিকাংশেরই গৌরবের ভিত্তি সমাজ-সংস্কার সম্পর্কে তাঁদের কোন হিতকারী কার্যকলাপ বা মনোভাব নয়। সেই ভিত্তিতে রয়েছে তাঁদের সাধনার কঠোরতা ও বীভৎসতা।

কিন্তু এইসব সনাতনপন্থী সাধক-সন্ন্যাসীদের চেয়ে দেশ আর কালের উপর অনেক বেশী প্রভাব বিস্তার করেছেন যিনি, সেই গান্ধীর ভাবনাতে কৃচ্ছ্রের প্রতি মূল্য আরোপ খুবই স্পষ্ট। তাঁর চরকা, কুটির ও গ্রামশিল্প প্রভৃতি সংক্রান্ত গোঁড়া মতবাদের সপক্ষে জোড়াতালি-দেওয়া সামাজিক এবং অর্থনৈতিক যত ধরণের যুক্তিই উপস্থাপিত করা হয়ে থাকুক না কেন, শরীরকে কষ্ট দেওয়ার মধ্যেই একটা মহৎ কিছু আছে—এই ধারণা তাঁর মনস্তত্ত্বে খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করত, একথা অস্বীকার করা যায় না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে কিছু কিছু বিচিত্র উপায় তিনি উদ্ভাবন করেছিলেন, তাদের সঙ্গে তপস্যার দ্বারা জবরদস্তি করে বর আদায় করার সাদৃশ্য চমকপ্রদ। তাঁর দ্বারা প্রবর্তিত অনশন ধর্মঘটের পদ্ধতিকে যে আধুনিক ভারতবর্ষীয় জনগণ বিপুল শ্রদ্ধা আর সমর্থন জানিয়েছিল তাতেই প্রমাণ, তপস্যার উপর আধুনিক ভারতীয় মনের কতখানি আস্থা রয়েছে। আর জনগণ যে শুধু গান্ধীর উপবাসব্রতকে সমর্থন জানিয়েছে, তাই নয়। জনগণও এই পদ্ধতিটির মধ্যে বেশ এক সুবিধাজনক অস্ত্র আবিষ্কার করেছে। কথায় কথায় অনশন ধর্মঘট করে দাবি আদায় করে নেওয়ার রেওয়াজ বেড়েই চলেছে।

বরদান এবং তপস্যার আলোচনা থেকে প্রাচীন ভারতীয় ধ্যানধারণা, যা আধুনিক যুগের ভারতবাসীদের মনকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করে তাদের সম্বন্ধে আমরা যা জানলাম সূত্রাকারে তা এইভাবে রাখা যায়। এক, মানুষের সমাজে কিছু-সংখ্যক অতিমানবদের উপস্থিতি, যে অতিমানবেরা সম্পূর্ণ নীতিচেতনাহীন। দুই, ঐ অতিমানবেরা তাঁদের অতি-মানবিক ক্ষমতাকে অর্জন করেন এক যান্ত্রিক উপায়ে,—কৃচ্ছ্রসাধনার দ্বারা। তিন, অতি-মানবত্ব অর্জন না করেও বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা বা সুবিধা যে কোন ব্যক্তিই বরের আকারে আদায় করে নিতে পারতেন ঐ একই যান্ত্রিক উপায়ের দ্বারা অর্থাৎ কৃচ্ছ্রসাধনার দ্বারা।

কৃচ্ছ্রের উপর এই-জাতীয় আস্থা ও নীতিহীন অতিমানবদের অস্তিত্ব এবং অধিকার স্বীকার করে নেওয়া এই উভয়ের মধ্যে যে মনোভাবের প্রকাশ তা মানবিকতাবিরোধী।

উদ্ধৃতি-নির্দেশক

১। দেবীপুরাণ, অধ্যায় ৬
২। শিবপুরাণ, ধর্মসংহিতা, অধ্যায় ৫০
৩। শান্তিপর্ব, অধ্যায় ৩৫১
৪। আদিপর্ব, অধ্যায় ৮৪
৫। আদিপর্ব, অধ্যায় ৫৬
৬। আদিপর্ব, অধ্যায় ১৬
৭। বনপর্ব, অধ্যায় ৫৭
৮। আদিপর্ব, অধ্যায় ৩০
৯। আদিপর্ব, অধ্যায় ৮৬
১০। শিবপুরাণ, জ্ঞানসংহিতা, অধ্যায় ৯
১১। মৎস্যপুরাণ, অধ্যায় ১২৯
১২। আদিপর্ব, অধ্যায় ৪০
১৩। আদিপর্ব, অধ্যায় ১১
১৪। বনপর্ব, অধ্যায় ৩৮
১৫। আদিপর্ব, অধ্যায় ২০৮
১৬। অনুশাসনপর্ব, অধ্যায় ১৪
১৭। শ্রীমদ্‌ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ, অধ্যায় ৮৮
১৮। শল্যপর্ব, অধ্যায় ৪৮
১৯। বনপর্ব, অধ্যায় ১০৭
২০। অনুশাসনপর্ব, অধ্যায় ১১২
২১। শিবপুরাণ, জ্ঞানসংহিতা, অধ্যায় ৯
২২। মৎস্যপুরাণ, অধ্যায় ১২৯
২৩। আদিপর্ব, অধ্যায় ২০৯
২৪। বনপর্ব, অধ্যায় ৯৭
২৫। শল্যপর্ব, অধ্যায় ৫২
২৬। শান্তিপর্ব, উত্তরার্ধ, অধ্যায় ২৯৬

২৭ আদিপর্ব, অধ্যায় ১৭৫
২৮ অনুশাসনপর্ব, অধ্যায় ২৭
২৯ উদ্যোগপর্ব, অধ্যায় ১৮৬
৩০ শল্যপর্ব, অধ্যায় ৪১
৩১ কালিকাপুরাণ, অধ্যায় ১৯
৩২ কালিকাপুরাণ, অধ্যায় ২২
৩৩ শল্যপর্ব, অধ্যায় ৪৮
৩৪ বনপর্ব, অধ্যায় ১০৬
৩৫ আদিপর্ব, অধ্যায়, ২০৮, ২০৯, ২১০
৩৬ রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, অধ্যায় ১৬
৩৭ দেবীপুরাণ, অধ্যায় ৮০
৩৮। শান্তিপর্ব, অধ্যায় ৭৯
৩৯। শান্তিপর্ব, উত্তরার্ধ, অধ্যায় ২৯৬

এই প্রবন্ধটি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে "তপস্যা ও বরদান" নামে প্রকাশিত হয়েছিল "চতুরঙ্গ" পত্রিকায় ১৩৮৭ সালে।

নবম অধ্যায়

ব্রাহ্মণ্য পুরুষাদর্শ—রাম ও কৃষ্ণ

রাম কৃষ্ণ ভারতবর্ষের ধর্মীয় চিন্তার এক চূড়ান্ত বিস্ময়। রাম ও কৃষ্ণ এই দুই চরিত্রকেই যে বিষ্ণুর অবতার জ্ঞানে ভজনা করা হয় এই অত্যাশ্চর্য বিষয়টি নিয়ে আমাদের ধর্মীয় চিন্তায় যে কখনও কোন আন্দোলন হয়নি তাতেই প্রকাশ হিন্দু ধর্ম চিন্তা কি পরিমাণ অন্তর্দ্বন্দ্বে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে জীর্ণতা দশা প্রাপ্ত হয়ে ধর্মের যা কাজ, অর্থাৎ ব্যক্তি জীবন ও সমাজ জীবনকে ধারণ করা, তা করতে ব্যর্থ হয়েছে। খ্রীষ্টীয় ধর্ম চিন্তায় একটি anti-Christ-এর ধারণা আছে। Christ বা খ্রীষ্ট যে সব ধর্মের স্থাপনের জন্য অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাদের ধ্বংস করার জন্যই অবতীর্ণ হবেন কোন এক যুগান্তকারী পুরুষ যাকে anti-Christ আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। আমাদের দেশের পৌরাণিক চিন্তায় কল্কি অবতারের ধারণা আছে, যিনি কলি-যুগের অবসানে পাপে পরিপূর্ণ সৃষ্টিকে সংহার করবেন। কলি যুগের অবসানের কল্কি অবতারের এই ভূমিকার সঙ্গে দ্বাপর যুগের কৃষ্ণের ভূমিকার কোন তুলনাই সম্ভব নয়। গীতায় কৃষ্ণ বলেছেন, "ধর্মসংস্থাপনার্থায়" তাঁর আগমন। ধর্মের বিনাশের জন্য নয়। কিন্তু রামায়ণ মহাভারত হরিবংশ ভাগবত পুরাণ এবং আর যেখানে যেখানে রাম ও কৃষ্ণের উল্লেখ পাওয়া যায় সেই সব জায়গাতেই কৃষ্ণকে এমন এক চরিত্রের পুরুষ হিসেবে পাওয়া যায় যাঁকে রাম যে ধর্মের ধারক ছিলেন তার বিনাশক না মনে করার কোন উপায়ই নেই। কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম চিন্তায় রাম ও কৃষ্ণ উভয়কেই সমতুল্য স্থান দিয়ে একটি একক ধর্ম গড়ে তোলা হয়েছে। সীতারামের যিনি ভজনা করেন তিনি রাধাকৃষ্ণেরও ভজনা করেন। বৃন্দাবনের কৃষ্ণ এবং কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণের মধ্যে যে অনেক বিষয়ে প্রচুর বৈষম্য আছে তার দিকে অনেকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই দুই কৃষ্ণ যে উৎসে এক চরিত্র ছিল না, দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন লোককথার ধারাকে কোন এক সময়ে জোড়া দিয়ে মিশিয়ে একটি কৃষ্ণ-কাহিনীতে পরিণত করা হয়েছে, এই জাতীয় তত্ত্বচিন্তাও কেউ কেউ করেছেন। কিন্তু বৃন্দাবনের কৃষ্ণই হোক আর কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণই হোক, এই উভয় কৃষ্ণের সঙ্গেই শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রের যে আকাশ-পাতাল তফাত সেটাকে কি করে গুলে হজম করে ফেলা হল তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। তেমনি সীতাকে যিনি ভজনা করেন তিনি কি করে রাধাকেও শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারেন, এ প্রশ্ন না জাগাই অস্বাভাবিক। কৃষ্ণ যদি অ্যান্টি-রাম হয়ে থাকেন তো রাধাও অ্যান্টি-সীতা। সীতা যদি সতীত্বের চূড়ান্ত আদর্শ হয়ে থাকেন তো রাধাও পরকীয়া চর্চার প্রান্ত-বিন্দুতে অবস্থিত। কিন্তু রাধা ও সীতার চারিত্রিক বৈষম্য নিয়ে আমরা বিশেষ আলোচনা করব না। কেননা, কৃষ্ণ ও রাম চরিত্রের মধ্যে যে দুস্তর অলঙ্ঘ্য ব্যবধান, সীতা ও রাধার মধ্যের ব্যবধান তারই প্রতিবিম্বস্বরূপ।

যুগ যুগ ধরে ভারতীয় মন রাম চরিত্রে তিনটি বিশেষ গুণ আরোপ করে এসেছে। এই তিনটি হল সত্যপরায়ণতা, এক-পত্নীতে আনুগত্য, এবং বীরত্ব। রাম আদর্শ পতি, আদর্শ রাজা এবং আদর্শ মানুষ। বিশদভাবে আলোচনা করলে দেখা যায় যে, রাম চরিত্রে এই

তিনটি গুণ নিশ্ছিদ্র সাধুতার প্রকাশরূপে বর্তমান ছিল না। তা সত্ত্বেও এ কথা অনস্বীকার্য যে, রাম চরিত্র এই তিনটি গুণে গুণান্বিত হয়ে গরিমা অর্জন করেছিল। অপর দিকে কৃষ্ণ চরিত্র এই তিন বিষয়েই চূড়ান্ত কলঙ্কে কলঙ্কিত। নানান রকম জটিল কাঁচের ভিতর দিয়ে দর্শন না করে সাদা চোখে দেখলে মহাভারত ও পুরাণে কৃষ্ণের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়, "ইনি বাল্যে চোর—ননী মাখন চুরি করিয়া খাইতেন, কৈশোরে পরদারিক—অসংখ্য গোপনারীকে পাতিব্রত্য ধর্ম হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছিলেন; পরিণত বয়সে বঞ্চক ও শঠ—বঞ্চনার দ্বারা দ্রোণাদির প্রাণহরণ করিয়াছিলেন।" (১) আক্ষেপ করে তিনি বলেন, "আমরা জানি, তিনি লম্পট, ননী মাখন চোর, কুচক্রী মিথ্যাবাদী রিপুবশীভূত এবং অন্যান্য দোষযুক্ত"। বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তিগুলি নিয়েছি তার 'কৃষ্ণ চরিত্র' প্রবন্ধ থেকে। বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছিলেন যে, "যথার্থ হিন্দু আদর্শ শ্রীকৃষ্ণ... রামচন্দ্রাদি ক্ষত্রিয়গণ সেই আদর্শ প্রতিমার নিকটবর্তী।" কিন্তু কৃষ্ণই যথার্থ মনুষ্যত্বের আদর্শ—খ্রীষ্ট প্রভৃতিতে সেরূপ আদর্শের সম্পূর্ণতা পাইবার সম্ভাবনা নাই।" কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণ চরিত্র' প্রবন্ধ লেখার উদ্দেশ্যই ছিল প্রচার করা যে, "কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় যে সকল পাপোপাখ্যান জনসমাজে প্রচলিত আছে, তাহা সকলই অমূলক বলিয়া জানিতে পারিয়াছি।" অর্থাৎ কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় উপাখ্যানগুলির অধিকাংশই কৃষ্ণভক্ত বঙ্কিমচন্দ্র 'পাপোপাখ্যান' বলে মনে করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করতে এক মূল মহাভারতের কথা কল্পনা করে নেন, যাতে কৃষ্ণ চরিত্র এমন যা তাঁর আদর্শসম্মতও বটে, ঐতিহাসিকভাবে সত্যও বটে। বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রচেষ্টার সমালোচনা আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্যের বহির্ভূত। সেই রকম কোন মূল মহাভারত কোন কালে থেকে থাকলেও সাধারণ ভারতবাসী তার কথা জানে না। বিভিন্ন স্তরের যত জন কবির হস্তক্ষেপই মহাভারতে ঘটে থাকুক এবং এই সব কবিদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র রাগ করে যাদের 'গর্দভ' ইত্যাদি আখ্যা দিয়েছেন তাদের হাত থেকে থাকলেও এবং কাশীরাম দাস ও কথক ঠাকুরদের সম্বন্ধে তিনি যতই অবজ্ঞা প্রকাশ করুন না কেন, কৃষ্ণকে এখন সংস্কৃত মহাভারতে পাওয়া যায়, বাংলায় কাশীরাম দাসে যেভাবে পাওয়া যায়, কথকঠাকুরদের কথকথায় যেভাবে পাওয়া যায়, জয়দেবে ও অন্যান্য বৈষ্ণব কাব্যে যে ভাবে পাওয়া যায় সেই কৃষ্ণ চরিত্রকেই যুগ যুগ ধরে ভারতীয় মন জেনে এসেছে এবং তার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছে। একই কালে সেই কৃষ্ণ চরিত্রের ক্রমবিবর্তনকেও রূপ দিয়ে এসেছে ঐ একই ভারতীয় মন। রাম চরিত্রও অনুরূপভাবে বিবর্তিত হয়েছে এবং রামের ক্ষেত্রেও বাল্মীকী রামায়ণ এখন যেভাবে পাওয়া যায়, কৃত্তিবাস তুলসীদাস প্রমুখ কবিদের রামায়ণে রামকে যেভাবে পাওয়া যায় সেই চরিত্রই ভারতীয় মনকে যুগ যুগ ধরে প্রভাবান্বিত করে এসেছে। সেই চরিত্রই যুগ যুগ ধরে ভারতীয় মনের দ্বারা রূপায়িত হয়ে এসেছে। এই কৃষ্ণ চরিত্র ও এই রাম চরিত্রই আমাদের আলোচ্য বস্তু। মূল কোন রামায়ণে মূল কোন মহাভারতে রাম ও কৃষ্ণ চরিত্র কি রকম ছিল তা নিয়ে আমরা মোটেই মাথা ঘামাব না। এই দুই চরিত্রের মধ্যে যে বিরোধ সেটাই আলোচনা করব।

এই রাম যেখানে সত্যপরায়ণ, কৃষ্ণ সেখানে কপট চূড়ামণি। রামের মধ্যে পাই প্রেম। কৃষ্ণে শুধুমাত্র কাম নিয়ে ক্রীড়া। বালী বধের ঘটনায় রাম ক্ষত্রধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন।

সন্দেহ নেই ; কিন্তু রাবণ ও অন্যান্য রাক্ষসবীরদের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি যথার্থ বীরের মতই আচরণ করেছিলেন। অপরদিকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষকে পদে পদে ক্ষত্রধর্ম থেকে বিচ্যুত করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব কৃষ্ণের।

রাম ও কৃষ্ণ চরিত্রের মধ্যে প্রথমেই যে প্রভেদের কথা আলোচনা করে নেওয়া দরকার তা এই যে, রাম পুরোপুরিভাবেই একজন রক্ত-মাংসের মানুষ। সমগ্র রামায়ণে প্রায় কোথাও তাঁকে কোন অলৌকিক শক্তি ব্যবহার করতে দেখা যায় না। তিনি যে বিষ্ণুর অবতার সেটা একটা তত্ত্বকথা মাত্র। রামায়ণের উপাখ্যানে রামের বিষ্ণুত্বের কোন ভূমিকাই নেই। কিন্তু মহাভারতের কৃষ্ণ বা গোকুলের কৃষ্ণ কোনটিই বিশ্বাসযোগ্য মনুষ্য চরিত্র হিসাবে আমাদের মনে দাগ কাটে না। গোকুলে এবং কুরুক্ষেত্রে উভয় স্থানেই আখ্যানের প্রতিপদেই কৃষ্ণের অতিমানবিক ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য কৃষ্ণকে তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা বাদ দিয়ে একটি মানব চরিত্র হিসাবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। যেখানেই কৃষ্ণের কোন অলৌকিক চরিত্রের ব্যবহার সে অংশকেই তিনি প্রক্ষিপ্ত বলে বর্জন করেছেন। ফলে অবশ্য মহাভারত ও হরিবংশের প্রায় কিছুই বাকি থাকে নি। ভীষ্ম বধ, দ্রোণ বধ প্রভৃতি ঘটনাকে এবং দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গের পর তৎকর্তৃক কৃষ্ণ নিন্দাকে, গোটা মৌষল পর্বকে এবং আরও কয়েকটি পর্বের অধিকাংশ কেটে বাদ দেওয়ার পর যা বাকি থাকে তার সঙ্গে ভারতবাসীর জানা কোন মহাভারতেরই কোন মিল নেই। তার মধ্যে কৃষ্ণের যে চেহারা পাওয়া যায় তার মধ্যে কোন বিশ্বাসযোগ্য মানব চরিত্রের আভাস পাওয়া যায় না।

অনেক বাঙালী পাঠককে এই কথা বলতে শুনেছি যে, কাব্য হিসাবে সাহিত্য হিসাবে মহাভারত তাঁদের কাছে রামায়ণের চেয়ে অনেক বেশী চিত্তাকর্ষক। রামায়ণের চরিত্রগুলি নাকি অতিশয় পরিমাণে আদর্শগুণের ধারক হওয়ার দরুণ পুতুলের দশাপ্রাপ্ত. তাদের ব্যবহার রক্ত-মাংসের মানুষের মত নয়। অপরদিকে মহাভারতের চরিত্রগুলি নাকি খুবই জীবন্ত। এই কথাটি আমার কাছে অত্যন্ত বিস্ময়কর লাগে। মহাভারতের অনেক চরিত্রই নিতান্ত দোষেগুণে মনুষ্যত্ব যুক্ত, যেমন যুধিষ্ঠির, যেমন দ্রৌপদী, যেমন ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, দুর্যোধন, কর্ণ। কিন্তু মহাভারতের অনেক প্রধান চরিত্রে, বিশেষ করে কৃষ্ণে, এমন অতিমানবিক গুণ আরোপ করা হয়েছে যে, তাদের বিশ্বাসযোগ্য মনুষ্য চরিত্র হিসাবে গ্রহণ করতে অসুবিধা হয়। অপরদিকে রামায়ণের চরিত্রদের মধ্যে আদর্শ হিসাবে দেখানোর চেষ্টা সবচেয়ে বেশী করা হয়েছে যাঁর সম্বন্ধে সেই রামচন্দ্রের চরিত্র সম্পর্কে শ্রীদীনেশচন্দ্র সেনের নিম্নলিখিত মন্তব্যটি আমার কাছে অত্যন্ত চমৎকার এবং একই কালে নির্ভুল বলে মনে হয়। "বাল্মীকি অঙ্কিত রামচরিত্র অতিমাত্রায় জীবন্ত—এ চিত্রে সূচিকাবিদ্ধ করিলে তাহা হইতে যেন রক্তবিন্দু ক্ষরিত হয়—এই চরিত্র ছায়া কিংবা ধূমবিগ্রহে পরিণত হইয়া পুস্তকান্তর্গত আদর্শ হইয়া পড়ে নাই।" (২)

২

রামায়ণে রামের চারিত্রিক গুণের মধ্যে সবচেয়ে বেশী কীর্তিত হয়েছে যা তা তাঁর সত্য-

পরায়ণতা, তাঁর চরিত্রের গুণকীর্তনে যত বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে তাদের অধিকাংশই সত্যসংশ্লিষ্ট। যথা—সত্যনিষ্ঠ, সত্যপ্রতিজ্ঞ, সত্যে আবদ্ধ, সত্যে অবহিত, সত্যবাদী, সত্যপাশে বদ্ধ, সত্যবাক্, সত্যজ্ঞ, সত্যসন্ধ। পূর্ববর্তী এক পরিচ্ছেদে আমরা দেখেছি যে "সত্যরক্ষা" বাক্যটি আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে দুইটি সংশ্লিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এক, মিথ্যা কথা না বলা। দুই, অঙ্গীকার রক্ষা করা। এও মন্তব্য করেছি যে, মিথ্যা কথা না বলার অর্থে সত্যপরায়ণতাকে আমাদের ধর্মশাস্ত্রে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অপরদিকে অঙ্গীকার রক্ষা করার অর্থে সত্যরক্ষাকে দেওয়া হয়েছে সব প্রকার ধর্মের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান।

মিথ্যা কথা না বলা এবং অঙ্গকার রক্ষা করা এই উভয় অর্থেই রাম ছিলেন সত্য-পরায়ণতায় লৌহদৃঢ়। সীতা যখন রাম সম্বন্ধে বলেন, "তিনি সত্যই বলিয়া থাকেন জীবন-রক্ষার প্রয়োজনেও তিনি কখনো মিথ্যা বলেন না।"(৪) অথবা রাম যখন নিজের সম্বন্ধে বলেন, "আকাশ পতিত হইতে পারে, পৃথিবী বিদীর্ণ হইতে পারে, সমুদ্র শুষ্ক হইতে পারে কিন্তু আমি কোন সময়ে পরিহাসালাপেও মিথ্যা বলিতে পারি না।"(৫) তখন মিথ্যা কথা না বলার অর্থে সত্যের কথা বোঝান হয়েছে। অপরদিকে রামচন্দ্র যখন বলেন, "চন্দ্রের শোভা অপনীত হইতে পারে, হিমালয় হিম ত্যাগ করিতে পারেন, সাগর তাহার বেলা অতিক্রম করিতে পারে, কিন্তু পিতার প্রতিজ্ঞা আমি লঙ্ঘন করিতে পারিব না।"(৬) তখন তিনি অঙ্গীকার পালনের অর্থে সত্যরক্ষা বুঝিয়েছেন। সত্যের এই দ্বিবিধ সংজ্ঞা সম্বন্ধেই কিন্তু কৃষ্ণের ধারণা ও আচরণ ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। এই সম্পর্কে কৃষ্ণের মনোভাব কি জাতীয় ছিল তা সবচেয়ে পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পেয়েছে মহাভারতের একটি উপাখ্যানে যা এখন আলোচনা করব।

কর্ণ পর্বে অর্জুন, যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণকে নিয়ে এই ঘটনার যে বিবরণ পাওয়া যায় তা এই প্রকার: "কর্ণের বাণসমূহে সন্তপ্ত অমিত তেজস্বী কুন্তীকুমার রাজা যুধিষ্ঠির অধিক বলশালী কর্ণকে কুশলে থাকিতে শুনিয়া অর্জুনের উপর ক্রোধ করত" তাকে একপ্রস্থ চূড়ান্ত নিন্দাবাদ করে বলেন, "ধিক্, তোমার এই গাণ্ডীব ধনুক, ধিক তোমার বাহুদ্বয়ের বলকে, ধিক্ তোমার এই অসংখ্য বাণকে, ধিক্ তোমার কেশরীর পুত্র হনুমান কর্তৃক প্রদত্ত এই রথকে।" এবং এও বলেন, "যদি তুমি আজ রণভূমিতে বিচরণকারী এই ভয়ানক বীর রাধাপুত্র কর্ণের সম্মুখীন হইতে না পার, তবে এখন এই গাণ্ডীব ধনু অন্য কোন এরূপ রাজাকে প্রদান কর, যিনি তোমা অপেক্ষা অস্ত্রবলে অধিক বলীয়ান। (৭).. যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে পর শ্বেতবাহন কুন্তীনন্দন অর্জুনের অতিশয় ক্রোধ হইল। তিনি ভরত শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে বধ করিবার ইচ্ছায় তরবারি গ্রহণ করিলেন।" (৮) কৃষ্ণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে অর্জুন বললেন, "যে ব্যক্তি আমাকে বলিবে যে, তুমি তোমার গাণ্ডীব ধনু অন্যকে প্রদান কর, আমি তাহার শিরশ্ছেদ করিব। আমি মনে মনে এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া রাখিয়াছি। আমি যুধিষ্ঠিরকে বধ করত সেই প্রতিজ্ঞার পালনে ঋণ মুক্ত হইব।" (৯) কৃষ্ণ এই কথা শুনে অর্জুনকে নানাবিধ তিরস্কার করে বলেন, "তুমি অবোধ বালকের ন্যায় পূর্বে কোন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, সেই জন্য তুমি মূর্খতাবশত অধর্মযুক্ত এই কার্য করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছ।" এবং তৎক্ষণাৎ এক বুড়ি অভিনব ধর্ম সম্পর্কিত জ্ঞান দান করে বসেন। এই অভিনব

ধর্মের দুইটি সূত্র। প্রথম সূত্র, "আমার বিচারে প্রাণীহিংসা না করাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম। যদি কাহারও প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য মিথ্যা কথা বলিতে হয়, তবে তাহাও বলিবে, তথাপি কোনরূপে তাহাকে হিংসা করিবে না।" (১০) দ্বিতীয় সূত্র, "যেখানে মিথ্যা কথা বলার পরিণাম সত্য কথা বলারই ন্যায় মঙ্গলকারক হয় অথবা যেখানে সত্য কথা বলার পরিণাম মিথ্যা ভাষণেরই ন্যায় অনিষ্টকর হইয়া থাকে, সেখানে সত্য কথা বলা উচিত নহে। সে স্থলে অসত্য কথা বলাই উচিত হইবে।" (১১) অর্জুন কৃষ্ণের বাক্যের স্রোতের সামনে দাঁড়াতে পারেন না। তিনি কৃষ্ণকে বলেন, "সংসারের সকল লোকের বোধে যেভাবে আমার এই প্রতিজ্ঞা সত্য বলিয়া স্বীকৃত হয় এবং যাহাতে পাণ্ডুপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির ও আমি—এই দুইজনেই জীবিত থাকিতে পারি, সেরূপ কোন পরামর্শ আপনি আমাকে কৃপা করিয়া প্রদান করুন।" (১২) কৃষ্ণের পক্ষে তো এ কোন সমস্যাই নয়। মুহূর্ত মধ্যে তিনি সমাধান আবিষ্কার করে ফেলেন। "তোমাকে অবশ্যই প্রতিজ্ঞা পালন করিতে হইবে" বলে তিনি যে পথ বাতলে দেন তা অতিশয় চিত্তচমৎকারী। তা হল এই, "তুমি যুধিষ্ঠিরকে সর্বদা আপনি বলিয়া থাক, এখন তুমি তাঁহাকে 'তুমি' বলিয়া দাও। ভারত! যদি কোন গুরুজন ব্যক্তিকে 'তুমি' বলা হয়, তবে উহা সৎপুরুষগণের দৃষ্টিতে তাঁহার বধই হইয়া থাকে।" (১৩) কৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে, 'যৎকিঞ্চিৎ' অপমানকর কথা বলেন। কিন্তু অর্জুন যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের মত ধর্মের প্রবক্তা ছিলেন না, ধর্মভীরু ক্ষত্রিয় ছিলেন মাত্র, সেহেতু তাঁর খুব অনুতাপ হল, "আমি যাহার দ্বারা হঠকারিতা-পূর্বক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের অপমানরূপ অহিতকর কার্য করিয়াছি, নিজের সেই দেহকেই এখন নষ্ট করিয়া দিব।" (১৪) এই বলে পুনরায় অসি নিষ্কাশিত করলেন। কৃষ্ণ আবার তাঁকে "ধর্মের স্বরূপ সূক্ষ্ম। তাহাকে জানা ও বোঝা অতিশয় কঠিন।"—ইত্যাদি বলে যাদুকরের মত আরও একটি চমৎকার সহজ উপায় বার করে দিলেন। "তুমি বর্তমানে নিজেই নিজের গুণাবলী বর্ণনা কর। এরূপ করিলে তুমি নিজেই নিজের আত্মহত্যা করিলে—ইহাই পরিগণিত হইবে।" (১৫) বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় "অর্জুন তখন অনেক আত্মশ্লাঘা করিলেন। তখন সব গোল মিটিয়া গেল।" (১৬)

ঠিকই তো। কত সহজেই গোল মিটিয়ে দেওয়া গেল। কত সহজেই কৃষ্ণ অর্জুনকে দিয়ে সত্যরক্ষা করালেন। রাম নিজে বিষ্ণুর অবতার হয়েও তাঁর কৃষ্ণের মত অত প্রখর ধর্মবুদ্ধি ছিল না। তা যদি থাকত তো তিনিও বোধ হয় চৌদ্দ বৎসর বনবাসের বিকল্প হিসাবে তুচ্ছ কিছু একটা করণীয় বার করতে পারতেন যা করে বনেও যেতে হত না সত্য-রক্ষাও হত। যেমন তিনি চৌদ্দ দিনের জন্য কোন উপবন থেকে প্রমোদ ভ্রমণ শেষ করে ফিরতে পারতেন এবং তাতেই তাঁর চৌদ্দ বৎসর বনবাস করার সত্যরক্ষা ঘটত।

এই জাতীয় নীতি চিন্তা অনুসরণ করলে ভীষ্মকে আজীবন ব্রহ্মচারী থাকতে হত না, রামচন্দ্রকে বনবাসে যেতে হত না, পঞ্চপাণ্ডবদেরও বনবাসে যেতে হত না, ভীমকে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ বা দুঃশাসনের রক্ত পান করতে হত না। সত্যরক্ষা ব্যাপারটাই অবান্তর হয়ে পড়ত। একথা অবশ্য ঠিক যে অবস্থা বিশেষে সত্য কথা বলা বা সত্যরক্ষার চেয়ে মিথ্যা বলা বা সত্যভঙ্গ করা অধিকতর ধর্মসংগত এই তত্ত্বটি একা কৃষ্ণই শুধু এই বিশেষ স্থানে দেননি, মহাভারতে ও পুরাণে অন্যত্র আরও অনেক প্রবক্তা এর সমর্থন করেছেন। 'সত্যরক্ষা'

বন্ধে আমি তার কিছু উদাহরণ দিয়েছি। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে, পুরাণ প্রসিদ্ধ কোন ব্যক্তিই সত্য ধর্মের থেকে বিচ্যুত হওয়ার জন্য এই escape clause-এর সাহায্য গ্রহণ করেন নি।

এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণ সত্য সম্বন্ধে যে অভিনব তত্ত্বজ্ঞান দেন তা নিয়ে আরও খানিকটা আলোচনা করার আছে। যেমন তাঁর মতে, "সত্য কথা বলা অতি উত্তম। সত্য হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য আর কিছুই নাই; কিন্তু সৎপুরুষগণের আচরিত সত্যের যথার্থ স্বরূপ জ্ঞান অত্যন্ত কঠিন। যেখানে মিথ্যা কথা বলার পরিণাম সত্য কথা বলারই ন্যায় মঙ্গলকারক হয় অথবা যেখানে সত্য কথা বলার পরিণাম মিথ্যা ভাষণেরই ন্যায় অনিষ্টকর হইয়া থাকে, সেখানে সত্য কথা বলা উচিত নহে। সে স্থলে অসত্য কথা বলাই উচিত হইবে।" (১৭) কোন কোন অবস্থায় মিথ্যা কথা বলা ন্যায়সঙ্গত এই বিষয়ে, তিনি যে শাস্ত্রবাক্যের প্রমাণ উপস্থিত করেন তা অতিশয় মনোহর। "বিবাহকালে, রতিক্রীড়ায়, কাহারও প্রাণসঙ্কটকালে, সর্বস্ব অপহরণ হইবার সময় এবং ব্রাহ্মণের জন্য যদি প্রয়োজন হয়, তবে অসত্য কথা বলিবে। কারণ, এই পঞ্চ স্থলে অসত্য ভাষণে কোন পাপ হয় না।"(১৮) এই শাস্ত্র বাক্য অনুসরণ করলে খুব কম অবস্থার কথাই ভাবা যায় যেখানে মিথ্যা কথা বললে দোষ হবে।

রাম ও কৃষ্ণের সত্য সম্পর্কে মনোভাবের পরিচায়ক যে উক্তি উপরে উদ্ধৃত করেছি তা থেকেই কৃষ্ণ যে "অ্যান্টি-রাম" আমার এই প্রতিপাদ্য প্রতিষ্ঠিত হয় বলে মনে করি। কৃষ্ণের মিথ্যাকে সত্য হিসেবে দেখানোর প্রচেষ্টাকে গুলে হজম করার জন্য ভারতীয় মনকে যে কসরত করতে হয়েছে, তার একটি অত্যন্ত উপাদেয় উদাহরণ পাওয়া যায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণ চরিত্র' প্রবন্ধে এই ঘটনার বিশদ আলোচনায়। অপর অভিনবত্ব অহিংসার গুণগান।

এই বিশেষ ক্ষেত্রে কৃষ্ণ যে প্রাণী-হিংসা না করাকে সত্য ধর্মের উপরে এবং আর সব ধর্মের উপরে স্থান দিয়ে বসলেন তা নিতান্তই এক ব্যতিক্রম—শুধু সমগ্র ব্রাহ্মণ শাস্ত্রে নয়, কৃষ্ণ প্রচারিত বাণীর মধ্যেও। কৃষ্ণের মুখে অহিংসার গুণগান আশ্চর্য শোনায় বইকি! ইনিই কি সেই কৃষ্ণ যিনি কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গণে দাঁড়িয়ে স্বজন বিনাশে বিমুখ অর্জুনকে যুদ্ধে প্ররোচিত করার জন্য যুদ্ধসজ্জা ও যুদ্ধারম্ভ এই সময়টুকুর মধ্যে সম্পূর্ণ শ্রীমদ্ভগবত গীতা আউড়ে ফেলেন? অর্জুন যখন বলেন, "হায় মহাকষ্ট, আমরা ভীষণ পাপ করিতে উদ্যত হইয়াছি। যেহেতু রাজ্যসুখলাভে আত্মীয়সমূহকে বিনাশ করিতে সমুদ্যত হইয়াছি। যাহাদের জন্য রাজ্যভোগ ও সুখসমুদয় আকাঙ্ক্ষিত, সেই আচার্য, পিতৃব্য পুত্র ও পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক ও সম্বন্ধি সকল...ইঁহাদের বিনাশ করিতে ইচ্ছা করি না।" (১৯) তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তিরস্কার করে বলেন, "এরূপ বিপদ সময়ে কি জন্য তোমার অনার্য্য আচরিত স্বর্গ প্রতিবন্ধক অযশস্কর মোহ উপস্থিত হইল?"(২০) এবং বোঝান "পণ্ডিতসমূহ মৃত অথবা জীবিত কাহারও জন্য শোক করেন না।"(২১) কেননা, "জীবাত্মা জন্ম গ্রহণ করেন না অথবা মরেন না।"(২২) ইত্যাদি, ইত্যাদি সমগ্র সাংখ্যযোগ, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ। গীতার মধ্যে দার্শনিক তত্ত্বের গভীরতা অনেক আছে সন্দেহ নেই; কিন্তু অহিংসার মাহাত্ম্যের প্রচার ছিটেফোঁটাও নেই।

এত সব করে ফল কথা যা অর্জুনের মাথায় প্রবেশ করানো হল তা এই—"তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত"—"ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম যুদ্ধ—অতএব যুদ্ধ কর।"(২৩) বেচারী অর্জুন আগাগোড়াই

কৃষ্ণের দ্বারা নির্বোধ বলে তিরস্কৃত হয়ে আসছেন। ভীষ্ম পর্বে তিনি তিরস্কৃত হলেন নির্বোধ বলে, কেননা তিনি স্বজন বধে বিমুখ ছিলেন। কিন্তু কর্ণ পর্বে যখন তিনি সত্যরক্ষা করার জন্য যুধিষ্ঠিরকে বধ করতে উদ্যত হলেন তখন তিনি তিরস্কৃত হচ্ছেন এইরূপ বাক্যে, "তুমি একজন সাধারণ গ্রাম্য মনুষ্যের ন্যায় নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধর্মজ্ঞ নরপতিকে কিরূপে বধ করিবে (২৪).. তুমি অজ্ঞানবশত নিজেকে ধর্মজ্ঞ মনে করিয়া যে ধর্ম রক্ষা করিতে যাইতেছ, তাহাতে প্রাণীহিংসার পাপ রহিয়াছে।"(২৫) দেখা যাচ্ছে, কৃষ্ণের মতানুসারে ভীষ্ম, দ্রোণ এবং অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের বিনাশে অধর্ম তো নেইই বরং তা ধর্ম সঙ্গত এবং এই প্রসঙ্গে অহিংসার কথাও ওঠে না। অপরদিকে যুধিষ্ঠিরকে বধ করা হত অন্যায়, কেননা তাতে অহিংসা ধর্ম ভঙ্গ করা হত!

অর্জুনকে কৃষ্ণ বলেন, "কর্তব্য ও অকর্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞান কোনরূপেই অনায়াসে জনা যায় না। এই সমস্ত শাস্ত্র হইতে জানা যায় এবং তুমি উহা জানিতে পারিতেছ না।"(২৬) সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? শুধু অর্জুন নন কৃষ্ণের প্রচারিত বাণী এমনই কুটিল যে, তার দ্বারা প্রভাবান্বিত ভারতবর্ষীয় মন কর্তব্য ও অকর্তব্যের মধ্যে প্রভেদ প্রায় কখনই করে উঠতে পারে নি। উদাহরণতঃ এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের কসরতের সামান্য একটু অংশ দেখা যাক। তিনি লিখেছেন, "কৃষ্ণের কথার ফল এই যে, যদি এমন অবস্থা কাহারও ঘটে যে, হয় তাহাকে মিথ্যা কথা বলিতে হইবে নয় নরহত্যা করিতে হইবে, তবে সে বরং মিথ্যা কথা বলিবে, তথাপি নরহত্যা করিবে না। যদি এরূপ ধর্মাত্মা নীতিজ্ঞ কেহ থাকেন যে, বলেন যে, বরং নরহত্যা করিবে, তথাপি মিথ্যা কথা বলিবে না, তবে আমাদের উত্তর এই যে, তাঁহার ধর্ম তাঁহাতেই থাক, এ নারকী ধর্ম যেন ভারতবর্ষে বিরল প্রচার হয়।"(২৭) কিন্তু দুর্যোধনকে অন্যায় যুদ্ধে ভূপাতিত করায় ক্রুদ্ধ বলরামকে এই কৃষ্ণই বলেছিলেন, ভীমকে এ কাজ করতে হয়েছিল; কেননা, তা না করলে ভীমের সত্যভঙ্গ হত। দুঃশাসনের রক্ত পানের মত নারকীয় কাজের সমর্থনেও ভীম গান্ধারীকে একই যুক্তি দেখান। লোকহিত এবং সত্যরক্ষা এই দুইয়ের মধ্যে সংঘাত যখনই হয়েছে তখনই লোকহিতকে ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া যদি ধর্মসঙ্গত মনে করা হত তো পুরাণ ও মহাকাব্যে সত্যরক্ষা সম্পর্কে যত কাহিনী আছে তার সবই অধর্মের কাহিনীতে পরিণত হত। রাম পিতৃ-আজ্ঞা রক্ষা করতে—বস্তুত পিতৃ আজ্ঞা নয়, কৈকেয়ীর আজ্ঞা—রক্ষা করতে বনে গিয়ে কার হিত করেছিলেন? নিজে তো পরম কষ্ট ভোগ করেই ছিলেন, পিতার মৃত্যুর কারণ হয়েছিলেন, মাতাকে অশেষ যন্ত্রণা দিয়েছিলেন এবং সীতার পরম লাঞ্ছনা ঘটিয়েছিলেন। হরিশ্চন্দ্রকে দিয়ে সত্যরক্ষা করানোর নামে বিশ্বামিত্র তাঁকে ও তাঁর পরিবারের সকলকে যে চূড়ান্ত নির্যাতন করেছিলেন তাতে কার কি হিত করা হয়েছিল? পতির সত্য রক্ষার খাতিরে গুণবতী যে অনিচ্ছায় অপরিচিত আগন্তুক ব্রাহ্মণের কাম প্রবৃত্তি মেটাতে নিজের শরীরকে প্রদান করেছিলেন তাতে কার কি হিত করা হয়েছিল? (এ জাতীয় অনেক কাহিনী 'সত্যরক্ষা' প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে) সত্য রক্ষার খাতিরে নিজ পুত্রকে বলি দেওয়ার উদাহরণও একাধিক পাওয়া যায়। এ সমস্ত উপাখ্যানের কোনটিতেই লোকহিতের প্রসঙ্গই তোলা হয়নি। (একমাত্র ব্যতিক্রম—রামের বনবাসে যাওয়ার উপলক্ষ্যে তাঁকে ভরত, লক্ষ্মণ, কৌশল্যা ইত্যাদি যে বিভিন্ন বিপরীত ধর্মের কথা শোনান।)

মহাভারতের যে উপাখ্যানটির বিশদ আলোচনা উপরে করেছি তাতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে

দিয়ে সত্যভঙ্গ করিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সরাসরি নিজেও সত্যভঙ্গ করেছিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অস্ত্র গ্রহণ করবেন না। কিন্তু দুই-দুইবার তিনি রথ থেকে নেমে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করতে এগিয়ে যান। দুইবারই ধর্ম বিষয়ে নির্বোধ বলে বরাবরই তিরস্কৃত অর্জুন বেচারীই তাঁর পা জড়িয়ে ধরে তাঁকে নিরস্ত্র করে তাঁর সত্যরক্ষা করেন।

রাম, ভীষ্ম, হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি পুরাণপ্রসিদ্ধ সত্যপরায়ণ ব্যক্তিরা যেভাবে সত্য ধর্মকে বুঝেছিলেন এবং অনুসরণ করেছিলেন তা কতটা মনুষ্যসমাজের পক্ষে কল্যাণকর সেই আলোচনা আপাতত করব না। আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল, সত্যধর্মের বিষয়ে রাম ও কৃষ্ণ সম্পূর্ণ বিপরীত, একজন যদি উত্তর মেরুতে অবস্থিত হন তো অপরজন দক্ষিণ মেরুতে। সেই আলোচনা এতক্ষন করেছি। প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে ক্ষত্রধর্ম এবং প্রেম ও কামের ব্যাপারেও এই দুই চরিত্র যে সম্পূর্ণ বিপরীত তার আলোচনা করব।

৩

সূত্রপাতেই বলেছি, এক বালী-বধের ব্যতিক্রম বাদ দিলে অন্য কখনও রামচন্দ্র ক্ষত্রধর্ম থেকে বিচ্যুত হন নি। এর সমর্থনে রাবণের সঙ্গে রামের যুদ্ধের বৃত্তান্ত থেকে একাধিক উদাহরণ দেওয়া যায়। রাম ও রাবণের যুদ্ধ যখন তুঙ্গে উঠেছে, রাম ও লক্ষ্মণ যখন বারবার রাক্ষসসেনাদের দ্বারা বিনষ্ট হতে হতে কোন মতে বেঁচে গেছেন, এমন অবস্থাতেও রাম রাবণকে বলেছেন, "রাবণ! তুমি আজ অতিশয় ভয়ানক কর্ম করিয়াছ, আমার সেনা মধ্যে প্রধান প্রধান বীরগণকে নিহত করিয়াছ। সেইহেতু পরিশ্রান্ত—ইহা বুঝিয়া শরপ্রহারে তোমাকে যমের অধীন করিব না। নিশাচরপতি! তুমি সমরে পীড়িত বলিয়া জানিতেছি। অতএব প্রয়াণ কর; লঙ্কায় প্রবেশ পূর্বক আশ্বস্ত হইয়া রথ, ধন, সেনাসহ আসিয়া আমার বল দর্শন করিবে।"(২৮) এবং এই একবার মাত্র নয়। তিনি এবং তাঁর পক্ষের অন্যান্য যোদ্ধারা অনেকেই একই আদর্শের অনুসরণ করেছেন। যেমন কুম্ভের সঙ্গে যুদ্ধকালে সুগ্রীব তাঁকে বলেন, "লোকনিন্দা ভয়ে এক্ষণই তোমাকে বধ করিতেছি না : তুমি যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইয়াছ; এখন বিশ্রাম করিয়া আমার শক্তি অবলোকন কর।"(২৯) রাবণের সঙ্গে যুদ্ধকালে হনুমান বলেন, "রাক্ষস! তুমি অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছ, এই হেতু তোমাকে আক্রমণ করা উচিত নয়।"(৩০) এর সঙ্গে তুলনা করে দেখা যাক, তুলনীয় অবস্থায় কৃষ্ণের মনোভাব। কর্ণার্জুনের অন্তিম যুদ্ধের এক পর্যায়ে "অত্যন্ত আহত হইয়া পড়ায় সূতপুত্র কর্ণ তূণীর ও ইন্দ্রধনুতুল্য বিশাল ধনু পরিত্যাগকরত রথের উপরেই স্খলিত হইতে হইতে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। সেই সময় তাঁহার মুষ্টিও শিথিল হইয়া গিয়াছিল। অর্জুন সৎপুরুষগণের ব্রতে অবস্থিত শ্রেষ্ঠ পুরুষ; অতএব তিনি এই সঙ্কটকালে কর্ণকে বিনাশ করিবার ইচ্ছা করিলেন না! তখন ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তীব্রবেগে কহিলেন, "পাণ্ডুনন্দন! তুমি কি প্রমাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছ? বিদ্বান্ ব্যক্তি দুর্বল হইতেও দুর্বল শত্রুকে নষ্ট করিবার জন্য কখনও সময়ের প্রতীক্ষা করেন না। বিশেষত সঙ্কটে পতিত শত্রুদিগকে বিনাশ করিয়া বুদ্ধিমান পুরুষ ধর্ম ও যশোভাগী হইয়া থাকেন।" (৩১) এর পর মেদিনী যখন কর্ণের

রথচক্র গ্রাস করে তখন রথচক্র উত্তোলনের প্রচেষ্টারত কর্ণকে অর্জুন কিভাবে বধ করেন তা সকলেরই জানা। এ দুষ্কর্মও অর্জুন করতেন না যদি না কৃষ্ণ কর্ণকে ব্যঙ্গ করে ক্ষত্রধর্মকে অবান্তর বলে উড়িয়ে দিতেন। এই কর্ণের শক্তিমত্তা সম্বন্ধে কৃষ্ণের যে কিরূপ উচ্চ ধারণা ছিল, তার প্রকাশ পাওয়া যায় নিম্নলিখিত উক্তিতে: "এই সংসারে এরূপ কোন পুরুষ আছে, যে যুদ্ধস্থলে কার্তিকেয়তুল্য শক্তিশালী কর্ণের সম্মুখে থাকিতে সমর্থ হইবে ?.. যদি তুমি গাণ্ডীব ধনু উত্তোলিত করিয়া এবং আমি সুদর্শনচক্রকে ধারণ করিয়া উভয়ে একত্রে গমন করিয়াও থাকি, তথাপি আমরা কবচ-কুণ্ডলযুক্ত নরশ্রেষ্ঠ কর্ণকে জয় করিতে সমর্থ হইতাম না। তোমার হিতের জন্য ইন্দ্র শত্রুনগর জয়ী কর্ণের দুইটি কুণ্ডল মায়াবলে অপহরণ করিয়াছেন এবং তাহাকে কবচ হইতে বঞ্চিত করিয়া দিয়াছেন।...যে সময় হইতে মহাত্মা ইন্দ্র কর্ণকে তাহার দিব্য কবচ ও কুণ্ডলদ্বয়ের পরিবর্তে স্বীয় শক্তি অস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন. যেরূপ সে ঘটোৎকচের উপর ঐ শক্তিকে প্রয়োগ করিয়াছে সেইরূপ এই শক্তিকে লাভ করিয়া অবধি ধর্মাত্মা কর্ণ সর্বদা তোমাকে রণাঙ্গনে নিহত বলিয়াই মনে করিতেছিল.. বর্ণ কবচ ও কুণ্ডলহীন হইয়া এবং ইন্দ্র-প্রদত্ত শক্তি-অস্ত্র হইতে রহিত হইয়া এখন একজন সাধারণ মানুষের ন্যায় হইয়া গিয়াছে। তথাপি ইহার বধের একটি মাত্র উপায় আছে। কোন ছিদ্র পাইলে যখন সে অসাবধান হইয়া থাকিবে, তোমার সহিত যুদ্ধ চলিবার সময় যখন কর্ণের রথের চক্র ধরাতলে প্রবিষ্ট হইবে এবং সে সঙ্কটে পতিত হইবে, সেই সময়েই তুমি পূর্ণ সাবধানতার সহিত আমার সঙ্কেত বিবেচনাপূর্ব উহাকে পূর্বেই বধ করিবে। অন্যথা সে যখন যুদ্ধের জন্য অস্ত্র উত্তোলিত করিবে সেই সময় এই অজেয় বীর কর্ণকে ত্রিলোকের একমাত্র বীর বজ্রধারী ইন্দ্রও নিহত করিতে সমর্থ হইবেন না।" (৩২)

ভূরিশ্রবাকে অধর্ম যুদ্ধে হত্যা করার পিছনেও ছিল কৃষ্ণের প্ররোচনা। সাত্যকি ও ভূরিশ্রবাতে যুদ্ধ চলছিল। সাত্যকির পরাজিত ও নিহত হওয়ার সম্ভাবনা দেখে কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন "দেখ বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশের এই সিংহতুল্য পরাক্রমী বীর ভূরিশ্রবার বশীভূত হইয়া পড়িয়াছে।...পার্থ! পরাক্রম মিথ্যা, যাহার আশ্রয় লইয়াও বৃষ্ণিবংশীয় সত্য পরাক্রমী বীর সাত্যকি হইতেও ভূরিশ্রবা অধিক বলশালী হইয়া গিয়াছে।" (৩৩) এই কথার পর অর্জুন কিভাবে ভূরিশ্রবার দক্ষিণ বাহু ছেদন করেন এবং কিভাবে পরে যোগাসনে উপবিষ্ট ভূরিশ্রবার মস্তক সাত্যকি ছেদন করেন তা মহাভারত-পাঠকের কাছে পরিচিত। কিন্তু এই ঘটনার দায়িত্ব ভূরিশ্রবা যেভাবে অর্জুনের উপর ন্যস্ত না করে কৃষ্ণের উপর করেছিলেন তা শিক্ষাপ্রদ। তিনি বলেন, "তুমি সাত্যকিকে বাঁচাইবার জন্য আজ যে অত্যন্ত নীচ কর্ম করিলে, ইহা নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের অভিমত, কারণ, তোমার মধ্যে এরূপ নীচ চিন্তা সম্ভব নয়। এরূপ কোন মানুষ আছে যে অন্যের সহিত যুদ্ধরত অসাবধান যোদ্ধাকে এতাদৃশ সঙ্কটদান করিতে পারে? যে শ্রীকৃষ্ণের মিত্র নয়, তাহার পক্ষে এরূপ কর্ম করা সম্ভব নহে!"(৩৪).

জয়দ্রথকে কিভাবে বধ করা হয়েছিল? কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন, "এই সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ প্রাণরক্ষা করিবার ইচ্ছায় ভীত হইয়া অবস্থান করিতেছে এবং তাহাকে ছয়জন মহারথী বীর মধ্যভাগে রাখিয়া দিয়াছে। রণাঙ্গনে এই ছয় মহারথী বীরকে পরাজিত করিতে না পারিলে বিনা মায়ায় সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে বধ করিতে পারিবে না। অতএব আমি এখানে সূর্যদেবকে আবৃত করিবার জন্য কোন এক যুক্তি অবলম্বন করিব, যাহাতে একাকী সিন্ধুরাজই সূর্যদেবকে স্পষ্টরূপে অস্ত যাইতে দেখিতে পায়। এই দুরাচারী তখন নিজের জীবনের অভিলাষী

হইয়া হর্ষ সহকারে তোমার বিনাশের জন্য উৎকণ্ঠিত চিত্তে কোনরূপে আর নিজেকে লুকাইয়া রাখিবে না। এরূপ এক সুযোগ আসিলে পর তোমাকে অবশ্যই তাহার উপর প্রহার করিতে হইবে।"(৩৫) এর পর "যোগী, যোগযুক্ত এবং যোগীশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সূর্যদেবকে গোপন করিবার জন্য অন্ধকারের সৃষ্টি করিলেন।"(৩৬) এবং পুত্তলিকাবত অর্জুনকে দিয়ে কাজ করানোর জন্য বললেন. "দেখ, এই বীর সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ এখন তোমার ভয় পরিহার করিয়া সূর্যদেবের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে। এই দুরাত্মাকে বধ করিবার ইহাই পূর্ণ সুযোগ, তুমি শীঘ্র ইহার মস্তক ছেদন কর এবং স্বীয় প্রতিজ্ঞা সফল কর।"(৩৭)

দ্রোণবধের প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে, "কুন্তীদেবীর অন্য পুত্রদিগকে দ্রোণাচার্যের বাণসমূহে পীড়িত ও ভয়ভীত দেখিয়া তাঁহাদের কল্যাণে-নিরত বুদ্ধিমান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই কথা বলিলেন, "পার্থ! এই দ্রোণাচার্য সমস্ত ধনুর্দ্ধারী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যতক্ষণ ইঁহার হস্তে ধনু থাকিবে, ততক্ষণ ইঁহাকে যুদ্ধে ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবগণও কোনরূপে জয় করিতে সমর্থ হইবেন না। ...আমার বিশ্বাস—অশ্বত্থামা নিহত হইলে পর ইনি আর যুদ্ধ করিতে পারিবেন না। সেই জন্য যে কেহ তাঁহার নিকটে গিয়া বলুক যে, অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছে।" (৩৮) এর পর যা ঘটেছিল তা সর্বজনবিদিত এবং সর্বকালনিন্দিত।

বাস্তবিকপক্ষে কৃষ্ণ যে পাণ্ডবদের দিয়ে পদে পদে ক্ষত্রধর্ম লঙ্ঘন করিযে নীচ কাজ করিয়েছিলেন তা এতই স্বপ্রকাশ যে তার জন্য অনেক যুক্তি প্রয়োগ করার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে "ক্ষত্রধর্ম" নামক প্রবন্ধে (৩৯) দুর্যোধন কর্তৃক এবং গান্ধারী কর্তৃক কৃষ্ণকে যে তিরস্কার করা হয়েছিল তার বিশদ আলোচনা করেছিলাম। কিন্তু সেই প্রমাণেরও দরকার নেই। নানান অপকৌশল অবলম্বন করে কৃষ্ণ যে পাণ্ডবপক্ষদের জয়ী করিয়েছিলেন তা. তিনি নিজ মুখেই সগর্বে প্রচার করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ নেওয়া যাক নিম্নলিখিত ঘটনাটি। ইন্দ্রের প্রদত্ত শক্তি দ্বারা ঘটোৎকচের বধ হওয়ার পর পাণ্ডবগণ শোকে মগ্ন হন। কিন্তু কৃষ্ণ "অতিশয় হৃষ্ট হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ...তিনি তীব্র স্বরে গর্জন করিতে করিতে অশ্বগণের রশ্মি সংযত করিয়া বায়ু কম্পিত বৃক্ষের ন্যায় হর্ষান্বিত হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন।" (৪০) অর্জুন কর্তৃক হর্ষের কারণ জিজ্ঞাসিত হয়ে কৃষ্ণ বলেন, "ইন্দ্রের দ্বারা প্রদত্ত শক্তি-অস্ত্র ঘটোৎকচ কর্তৃক কর্ণের হাত হইতে অপসৃত হওয়ায় এখন তুমি যুদ্ধে কর্ণকে শীঘ্রই নিহত হইতে হইবে বলিয়া মনে কর।... মগধরাজ জরাসন্ধ, মহাত্মা চেদিরাজ শিশুপাল ও নিষাদজাতীয় মহাবাহু বীর একলব্য—ইহাদের সকলকেই আমি তোমার হিতের জন্য নানাবিধ উপায়সমূহে এক এক করিয়া নিহত করিয়াছি। .. ভয়ঙ্কর কর্মকারী বেগশালী ঘটোৎকচও তোমার হিতের জন্য নিহত হইয়াছে।"(৪১)

কৃষ্ণ আরও বলেন, "অর্জুন! জরাসন্ধ, শিশুপাল ও মহাবল একলব্য যদি পূর্বেই নিহত না হইত, তবে এখন তাহারা অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিত। .... সূতপুত্র কর্ণ, জরাসন্ধ, চেদিরাজ, শিশুপাল ও নিষাদনন্দন একলব্য—এই চার বীর মিলিত হইয়া যদি দুর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিত, তবে এই পৃথিবীকে অবশ্যই জয় করিয়া লইত। .... কোন উপায় উদ্‌ভাবন না করিলে তো ইহাদিগকে যুদ্ধে দেবগণও জয় করিতে সমর্থ হইবেন না।"(৪২) এর পর তিনি নিজেই "ইহারা যে সকল উপায়ে নিহত হইয়াছে, আমি তৎসমুদয় তোমাকে

বলিতেছি" বলে জরাসন্ধ, একলব্য ও শিশুপাল বধ যে ছলপূর্বক করা হয়েছিল তা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন। যেমন "যদি প্রতাপশালী জরাসন্ধের হাতে সেই গদা থাকিত, তবে ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবগণও উহাকে যুদ্ধে বধ করিতে সমর্থ হইতেন না। তোমার হিতের জন্যই দ্রোণাচার্য সত্যপরাক্রমী একলব্যের আচার্যত্ব করিয়া ছলপূর্বক তাহার অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি ছেদন করিয়া দিলেন। ঘটোৎকচকেও আমি উপায় অবলম্বন করিয়া কর্ণের শক্তির দ্বারা বিনাশ করাইয়াছি।" (৪৩)

রাম ও কৃষ্ণের মধ্যে ক্ষত্রধর্মের বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গীর যে প্রভেদ তার চেয়ে অধিকতর প্রভেদ কি কল্পনা করা সম্ভব?

৪

সত্যধর্ম ও ক্ষত্রধর্মের আলোচনার পর এবার আমরা কাম ও প্রেমের বিষয়ে রাম ও কৃষ্ণের যে বৈপরীত্য তার আলোচনা করব। বৃন্দাবনের কৃষ্ণের মধ্যে প্রেমের কোন ছিটেফোঁটাও ছিল না। হরিবংশে, শ্রীমদ্‌ভাগবদ্‌-এ এবং পরবর্তী যুগের বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণের লীলার যে বিবরণ পাওয়া যায়, তার বিষয়বস্তু নির্জলা কাম। অবশ্য এ ব্যাপারে শুধুই রাধা ও কৃষ্ণকে এইভাবে চিহ্নিত করা ন্যায়সঙ্গত হয় না। কারণ, প্রাচীন সাহিত্যে প্রায় কোথাও আমরা আজকাল প্রেম বলতে যা বুঝি তার বিশেষ চিহ্ন পাওয়া যায় না। সংস্কৃত কাব্যে প্রেম যে কতটা সঙ্কীর্ণভাবে দেহনির্ভর তার খানিকটা আলোচনা আমার পূর্বের একটি অধ্যায়ে "পৌরাণিক মনে কাম" (৪৪) প্রবন্ধে করেছি। পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। দেহনির্ভর প্রেম বা নির্জলা কাম জিনিসটা ভাল না মন্দ তা আপাতত আমার আলোচ্য বিষয় নয়। সর্বদেশে সর্বযুগেই কাব্য ও কলায় কাম চূড়ান্ত গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। খুব শুচিবায়ুগ্রস্ত মন না হলে কামের উপস্থিতির দরুণ কাব্য বা কলার মূল্য রসিক ব্যক্তির মনে হ্রাস পেতেই পারে না। যে সব কাব্য ও কলায় কাম প্রাধান্য পেয়েছে তাদের বাদ দিলে মানব সভ্যতা যে অতিশয় দরিদ্র হয়ে পড়বে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই এবং এই বক্তব্য শুধুমাত্র অতল গভীর প্রেমের সম্পর্ক সম্বন্ধেই প্রযোজ্য নয়। যৌন ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা তামাশা রসিকতা মানব মনের এক মৌল প্রবণতা, এ কথা বললে বোধ হয় ভুল বলা হবে না। যৌনতা নিয়ে স্থূল কল্পনা ও আলোচনারও একটা চিরকালীন ও সার্বজনীন মূল্য আছে তা অস্বীকার করা যায় কি করে?

এই সব কথা মেনে নেওয়ার পরও কৃষ্ণ রাধা ও অন্য গোপীদের নিয়ে যে ভূরি পরিমাণ কাব্যকাহিনী রচনা করা হয়েছে তার সম্বন্ধে আধুনিক মনে দ্বিবিধ আপত্তি উঠতে বাধ্য। প্রথম আপত্তি এই যে, কৃষ্ণ ও গোপীদের লীলা বর্ণনায় এমন একটা আতিশয্য আছে যা অসুস্থ মনের চিহ্ন বহন করে। যে কোন দুইজন সাধারণ নরনারীর যৌন মিলনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণে যে রস পাওয়া যায় বৃন্দাবনলীলায় সে রস অনুপস্থিত। অন্য সব বিষয়ের মত কামক্রীড়াতেও কৃষ্ণ অতি মানবিক। এক্ষেত্রেও তাঁর কীর্তিকলাপ এমনই যা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। কোন সত্যিকারের ভোজন রসিকদের ভোজনের বিবরণের সঙ্গে

কোন বুভুক্ষু মানুষের স্বপ্নে দেখা অসম্ভব আতিশয্য যুক্ত ভোজনের মায়াদৃশ্যে যে প্রভেদ এখানেও সেই প্রভেদ। মিঠাইমণ্ডার পর্বত, দধির সাগর, পায়সের নদী দর্শনে যেমন প্রকৃত ভোজন রসিকের বিবমিষা হওয়ার কথা অষ্ট সহস্র গোপী নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাও যথার্থ কামবিলাসীকে একইভাবে বিকর্ষণ করে।

দ্বিতীয়, এই লীলা বর্ণনায় এক চূড়ান্ত অসততা অবলম্বন করা হয়েছে। কামকে কাম বলে, যৌন ক্রীড়াকে যৌন ক্রীড়া বলে মেনে নেওয়া হয়নি। সবটাকেই একেবারে তুরীয় দার্শনিক তত্ত্ব হিসাবে চালানোর চেষ্টা করা হয়েছে। আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে সম্পর্ক প্রদর্শন করাই নাকি এই কাব্যকাহিনীর মূল বক্তব্য। স্নানরতা গোপীদের বস্ত্র হরণ করে কদম্ব বৃক্ষে চড়ে বসা কৃষ্ণের মধ্যে নির্গুণ ব্রহ্মকে দেখতে পাওয়া, নগ্নাবস্থায় গোপীদের দেখতে পাওয়ার জন্য তাঁর লালসার মধ্যে দ্বৈতাদ্বৈতের দ্বন্দ্ব-মিলন খুঁজে পাওয়ার জন্য এক অদ্ভুত মানসিকতার প্রয়োজন হয় বইকি।

বস্তুত, এই জাতীয় লীলার মধ্যে কোন বয়ঃপ্রাপ্ত প্রেমিক মানুষের মনোভাবই পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায়, তা সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত কোন বাপে-খেদান-মায়ে-তাড়ানো ছেলের মনোভাব। নৌকাবিলাস নামে যে কাহিনীটি এই কাব্যসাহিত্যে প্রচলিত তার উদাহরণ দিয়ে ভারতীয়রা দাবি করতে পারেন যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয়দের অনেক সহস্র বৎসর পূর্বে এই দেশে স্ট্রিপ-টীজ নামক যৌন ক্রীড়াটি উদ্ভাবিত হয়েছিল। পাশ্চাত্ত্য দেশে ভ্রমণকারীরা জানেন যে, সে সব দেশের নাইট ক্লাব জাতীয় প্রমোদাগারে পরিবেশিত নানা-প্রকার যৌন প্রমোদের অন্যতম এই স্ট্রিপ-টীজ। কপট লজ্জার অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক লাস্যময় ভঙ্গি সহকারে সুন্দর দেহবিশিষ্টা কোন নারী একের পর এক বস্ত্র মোচন করে করে শেষ পর্য্যন্ত দর্শকদের সামনে একেবারে বিবস্ত্রা হয়ে যাবে—এই হল ক্রীড়াটির বিষয়। এই জাতীয় প্রমোদ কারও কারও রুচি অনুসারে দূষণীয় হলেও কোন ধর্মের বিচারেই এর উপর সাংঘাতিক গুরুত্ব দেওয়ার কিছু নিশ্চয়ই নেই। কৃষ্ণের বস্ত্রহরণ বা নৌকাবিলাসকে যদি যৌন প্রমোদ হিসাবে গ্রহণ করা হত তো তাতেও দোষ দেওয়ার কিছু থাকত না। বোকাচ্চিওর ডিক্যামেরন-এ, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে, সঙ্কোচহীন ও কৌতুক মিশ্রিতভাবে অনেক দুষ্ট নায়ক ও সাহসিকা নায়িকাদের বহুবিধ যৌন ক্রীড়া বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলাও তাদেরই পাশে স্থান নিতে পারত। কিন্তু তা পারে না। কারণ, এই কাহিনীর নায়ক ও নায়িকাদের সমগ্র আচরণ এবং প্রত্যেকটি বিশেষ যৌন ক্রিয়াকেই একেবারে বেদান্তের তুরীয় মার্গে নিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে রচনাকারেরা প্রকাশ করে দিয়েছেন তাঁদের মন যৌনতা বিষয়ে একেবারেই নির্মল নয়, পরন্তু অতি পরিমাণে পাপ-চেতনায় আক্রান্ত। এই পাপচেতনায় আক্রান্ত হওয়ার আগে বৃন্দাবনলীলা হয়তো সাধারণ গ্রাম্য মানুষের যৌনতা নিয়ে কৌতুক ও ঔৎসুক্যের প্রকাশক লোকগাথাই ছিল। কিন্তু এখন যে অবস্থায় পাওয়া যায়, সেই বৃন্দাবনলীলার বর্ণনায় এক সাংঘাতিক রকমের দ্বিধাবিভক্ত মনের পরিচয় পাওয়া যায়। একদিকে কামকে মনে করা হচ্ছে বর্জনীয়, বলা হচ্ছে কৃষ্ণের ও রাধার মধ্যে কামের গন্ধটুকুও নেই। অপরদিকে কৃষ্ণ ও রাধার মধ্যে—এবং রাধাকে হাতের কাছে না পেলে তার প্রেরিত যে কোন দূতীর সঙ্গেই—কৃষ্ণের লীলার বর্ণনা যে চূড়ান্ত উৎসাহ সহকারে দেওয়া হয়েছে তাতে সুস্থ ও স্বাভাবিক কাম প্রবৃত্তি সম্পন্ন মানুষের মনকে হাঁপিয়ে পড়তে হয়। একদিকে পাতিব্রত্যই নারীর পরম ধর্ম এই কথা সব শাস্ত্রে, সব কাব্যে,

সব পুরাণে অক্লান্তভাবে প্রচার করা হয়েছে। অপরদিকে কৃষ্ণের সঙ্গে আদি রসের জোয়ারে ভেসে গেল যে রমণীকূল তারা সকলেই বিবাহিত এবং সকলেই কৃষ্ণের জননী হওয়ার তুল্য-বয়স্কা। এই কাব্য কাহিনীকে না নেওয়া যায়, বৈদান্তিক ধর্মরহস্যের ব্যাখ্যা হিসাবে না উপভোগ করা যায় ডন জুয়ান বা ক্যাসানোভা জাতীয় কোন দুর্ধর্ষ পুরুষের নারী বিজয়ের কৌতুককর কাহিনী হিসাবে।

কৃষ্ণ সম্বন্ধে এইটুকু বললেই অবশ্য সব বলা হয় না, ন্যায়সঙ্গতও হয় না। কারণ, মহাভারতের কৃষ্ণ ও বৃন্দাবনের কৃষ্ণে এই ব্যাপারে আকাশ পাতাল তফাত। নারীদের সম্বন্ধে মহাভারতের কৃষ্ণের মনোভাবে নিন্দনীয় কিছুই পাওয়া যায় না। শুধু তাই না। দ্রৌপদীর সম্বন্ধে যে মনোভাব কৃষ্ণ আগাগোড়া দেখিয়েছেন সেটা শুধুই যে পরম শ্রদ্ধার যোগ্য তাই নয় তার মধ্যে এমন একটি সূক্ষ্মতা আছে, আছে এমন একটি সংযতা, যা প্রাচীন সাহিত্যে বিরল এবং যা আশ্চর্য প্রকারের আধুনিক। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা পরবর্তী এক অধ্যায়ে "শ্রীকৃষ্ণ" প্রবন্ধে করা হয়েছে।

প্রাচীন সাহিত্যে যে প্রেম বিরল বলে আগে বলেছি শ্রীরামচন্দ্র তার এক অতি সুন্দর ব্যতিক্রম। সীতার সম্বন্ধে রামের যে মনোভাব তা বহুলাংশেই আমরা আজকাল যাকে প্রেম বলি তাই। এবং এই প্রেম সম্পূর্ণই রক্ত-মাংসের মানুষের প্রেম। এ একেবারেই কাম-বিরহিত নয়। অপরদিকে কামসর্বস্বও নয়। সীতার প্রতি রাম যে অনেক অন্যায় অবিচার করেছিলেন তা সর্বজনবিদিত। কিন্তু তাঁর মানবিক দুর্বলতা প্রসূত এই সব দুর্ব্যবহার সত্ত্বেও সীতার প্রতি রামের অনুরাগ যে প্রবল ও গভীর ছিল তার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় সীতা হরণের পর রামের বিলাপে। রামায়ণের এই অংশটুকু অত্যন্ত সুন্দর রকমের কাব্যগুণে মণ্ডিত। এই কাব্যে প্রেমের যে সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি পাওয়া যায় তা অন্তত আমার রস ও রুচির বিচারে কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার কোন কাব্যিক রচনাতেই পাওয়া যায় না। এই মহৎ কাব্যাংশ থেকে খানিকটা উদ্ধৃতি দেওয়ার লোভ সামলাতে পারছি না :

"ওহে কদম্ব! তুমি আমার প্রেয়সী মনোহরবেদনা সীতার প্রিয়, তুমি তাঁহাকে দেখিয়াছ কি? যদি তুমি তাঁহার সন্ধান কিছু জানিয়া থাক, তবে আমাকে বল। বিল্ব! যাঁহার অঙ্গ মনোহর পল্লব সদৃশ কোমল, যিনি পীতবর্ণ কৌশেয়-বসন পরিধান করিয়া আছেন, সেই সীতার স্তন তোমার ফলের সদৃশ; যদি তুমি তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাক, তবে বল। ওহে অর্জুন! তুমি আমার প্রেয়সী কৃশাঙ্গী জনকদুহিতা সীতার প্রিয়; অধুনা তিনি জীবিতা আছেন কিনা; ইহা তুমি আমার নিকটে কীর্তন কর। ঐ কুটজ বৃক্ষ লতা, পল্লব ও পুষ্পসমূহে পরিবৃত হইয়া অত্যন্ত শোভা পাইতেছে। হে কুটজ! তুমি বৃক্ষদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং আমার প্রিয়ার ঊরুদেশ তোমার মত। ভৃঙ্গনিচয় তোমাতে বসিয়া ঝঙ্কার করিতেছে; তুমি আমার প্রিয়ার সংবাদ নিশ্চয়ই জান। এই তিলক বৃক্ষ নিশ্চয়ই সীতাকে অবগত আছে। কারণ, তিলক সীতার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। ওহে অশোক! তুমি শোক নাশ করিয়া থাক। আমি এখন সীতার শোকে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি। তুমি সত্বর আমার প্রিয়াকে দর্শন করাইয়া তোমার নাম যে অশোক অর্থাৎ শোকহীন, তাহাই আমাকে কর। ওহে তাল! যাঁহার স্তন তোমার পক্ক ফলের সদৃশ, যদি তুমি সেই সুন্দরী সীতাকে

দর্শন করিয়া থাক এবং যদি তোমার আমার প্রতি দয়া হয়, তবে আমার নিকট তাঁহার বৃত্তান্ত বর্ণনা কর।"(৪৫)

রামের উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থার অন্য এক পর্যায়ে তিনি মরীচিকা দেখতে শুরু করেন, "...হে সুন্দরি! তুমি দাঁড়াও, দাঁড়াও, তোমার কি আমার প্রতি দয়া নাই? অয়ি চারুহাসিনি! কি জন্য আমাকে উপেক্ষা করিতেছ? অত্যধিক পরিহাস করা তো তোমার স্বভাব নহে।...না, এ তো সেই চারুহাসিনী সীতা নহেন, কেননা, তিনি এইরূপ ক্লেশের সময়ে কখনই আমাকে উপেক্ষা করিতেন না।" (৪৬)

এই উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থা অতিক্রান্ত হওয়ার পর রামের মন অনেক শান্ত হওয়ার পরও তার মধ্যে শোক, প্রেম ও কাম যেভাবে মিশে থাকে তার অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত বিবরণ পাওয়া যায় নিম্নলিখিত উক্তিতেঃ "...লক্ষ্মণ ঐ দেখ, গিরিসানুমধ্যে ময়ূরী কামার্তা হইয়া নৃত্যরঙ্গে ময়ূরের নিকটে নৃত্য করিতেছে ; ময়ূরও মনোহর পক্ষ বিস্তারপূর্বক ধ্বনি করিয়া যেন আমাকে উপহাস করত প্রেয়সীর নিকট গমন করিতেছে। ঐ ময়ূরের প্রেয়সীকে নিশ্চয় কোন রাক্ষস হরণ করে নাই।.. হে লক্ষ্মণ! এখন পক্ষি প্রভৃতি তির্যক জাতিরও মদানুরাগ জন্মিয়া থাকে, দেখ—ময়ূরীও কামার্তা হইয়া ময়ূরের নিকটে গমন করিতেছে। যদি বিশাল নয়না জনক-দুহিতা সীতা হৃতা না হইতেন, তবে তিনিও কামবশীভূতা হইয়া এইরূপে আমার অনুগমন করিতেন।" (৪৭)

খুবই আক্ষেপের বিষয় এই যে, রাম ও সীতার এই অতি সুন্দর প্রণয় কাহিনী ভারতবাসীর চিত্তে প্রায় কোন স্থানই অধিকার করেনি। বৈষ্ণব সাহিত্যে রাম ও সীতার প্রণয় কীর্তিত হয়নি, হয়েছে কেবলমাত্র রাধাকৃষ্ণ ও অন্য গোপীদের কামক্রীড়া, যাকে বঙ্কিমচন্দ্র সঠিক ভাবেই "ইন্দ্রিয়পরতাময়" বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর আক্ষেপ, "যাহা ভাগবতে নিগূঢ় ভক্তিতত্ত্ব জয়দেব গোস্বামীর হাতে তাহা মদন ধর্মোৎসব।" (৪৮) এই মদন উৎসবে কৃষ্ণের ক্রিয় কলাপ এতই সর্বজন পরিচিত যে, তার থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া বাহুল্য হবে। শুধু এইটুকু উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে নারীদের নিয়ে উৎসবে রত কৃষ্ণকে যে বিভিন্ন বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে তাতে বিলাসী, কামুক, শঠ, ধূর্ত, চতুর, কপট ইত্যাদির প্রাচুর্য পাওয়া যায়। যাঁকে ঈশ্বর বলে ভজনা করা হচ্ছে, তাঁকেই এই জাতীয় দোষসূচক বিশেষণে ভূষিত করার মধ্যে যে মনোভাব প্রকাশ পায় তা আর যাই হোক, খুব সরল নয়।

শুধু যে রাধা-কৃষ্ণ লীলাই রাম-সীতার প্রণয় কাহিনীর থেকে অনেক বেশী গুরুত্ব পেয়ে এসেছে তাই নয়। সমগ্রভাবেই রামের চেয়ে কৃষ্ণের প্রভাবই ভারতবাসীর মনে গভীরতর ও ব্যাপকতর হয়ে এসেছে। শুধু যদি রামকে দেবতা হিসাবে গ্রহণ করা হত তো তা একটা সঙ্গতিপূর্ণ ধর্মের ভিত্তি হতে পারত। কিন্তু রামের সঙ্গে কৃষ্ণকেও দেবতার স্থান দেওয়ায় যা হয়েছে তা হল, "ধর্মলোপ"। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় "যিনি ধর্মের চরমাদর্শ বলিয়া প্রাচীন গ্রন্থে পরিচিত, তাঁহাকে যে জাতি এ পদে অবনত করিয়াছে, সে জাতির মধ্যে যে ধর্মলোপ হইবে, বিচিত্র কি?" (৪৯)

আমরা এই প্রবন্ধে রাম ও কৃষ্ণের তুলনামূলক আলোচনা করেছি। কিন্তু এই দুই চরিত্রের স্বতন্ত্র আলোচনাতেও আমাদের শিক্ষণীয় অনেক কিছু আছে। এইরূপ আলোচনা পরবর্তী দুইটি অধ্যায়ে করা হয়েছে।

উদ্ধৃতি-নির্দেশক

১। বঙ্কিমচন্দ্র, 'কৃষ্ণ চরিত্র'
২। দীনেশচন্দ্র সেন, 'রামায়ণী কথা'
৩। চতুরঙ্গ, বর্ষ ৩৭, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮২
৪। সুন্দর কাণ্ড, সর্গ ৩৩
৫। অযোধ্যাকাণ্ড, সর্গ ১৫
৬। অযোধ্যাকাণ্ড, সর্গ ১১২
৭। কর্ণ পর্ব, অধ্যায় ৬৮
৮। কর্ণ পর্ব, অধ্যায় ৬৯
৯। ঐ
১০। ঐ
১১। ঐ
১২। ঐ
১৩। ঐ
১৪। কর্ণ পর্ব, অধ্যায় ৭০
১৫। ঐ
১৬। বঙ্কিমচন্দ্র, 'কৃষ্ণ চরিত্র'
১৭। কর্ণ পর্ব, অধ্যায় ৬৯
১৮। ঐ
১৯। ভীষ্ম পর্ব, অধ্যায় ২৫
২০। ভীষ্ম পর্ব, অধ্যায় ২৬
২১। ভীষ্ম পর্ব, অধ্যায় ২৬
২২। ঐ
২৩। ঐ
২৪। কর্ণ পর্ব, অধ্যায় ৬৯
২৫। ঐ
২৬। ঐ
২৭। বঙ্কিমচন্দ্র. 'কৃষ্ণ চরিত্র'
২৮। যুদ্ধ কাণ্ড, সর্গ ৫৯
২৯। যুদ্ধ কাণ্ড, সর্গ ৭৬
৩০। যুদ্ধ কাণ্ড, সর্গ ৫৯
৩১। কর্ণ পর্ব, অধ্যায় ৯০
৩২। দ্রোণ পর্ব, অধ্যায় ১৮১
৩৩। দ্রোণ পর্ব, অধ্যায় ১৪২
৩৪। দ্রোণ পর্ব, অধ্যায় ১৪৩
৩৫। দ্রোণ পর্ব, অধ্যায় ১৪৬
৩৬। ঐ
৩৭। ঐ
৩৮। দ্রোণ পর্ব, অধ্যায় ১৯০
৩৯। 'ক্ষত্রধর্ম', দেশ ১২ জানুয়ারী, ১৯৮০
৪০। দ্রোণ পর্ব, অধ্যায় ১৮০
৪১। ঐ

৪২। দ্রোণ পর্ব, অধ্যায় ১৮১

৪৩। ঐ

৪৪। 'পৌরাণিক মনে কাম', দেশ, ১৪ এপ্রিল ১৯৭৯

৪৫। অরণ্যকাণ্ড, সর্গ ৬০

৪৬। ঐ

৪৭। কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড, সর্গ ১

৪৮। বঙ্কিমচন্দ্র, 'কৃষ্ণচরিত্র'

৪৯। ঐ

এই প্রবন্ধটি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে 'রামকৃষ্ণ' নামে দুই ভাগে প্রকাশিত হয়েছিল 'দেশ' পত্রিকায় ১৩৮৭ সালে।

দশম অধ্যায়

ব্রাহ্মণ্য পুরুষাদর্শ—শ্রীরামচন্দ্র

১

অযোধ্যাকাণ্ডের প্রথম স্বর্গে রামের একটি বিস্তারিত গুণ বর্ণনা পাওয়া যায়। তার থেকে খানিক উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু করা সঙ্গত হবে। "মহাবীর রাম পরম সৌন্দর্যবান অসূয়ারহিত ছিলেন। সর্বদা শান্ত স্বভাব রাম মৃদুভাবে কথা বলিতেন। কেহ যদি তাঁহার প্রতি কটু বাক্য প্রয়োগ করিত, তিনি নিরুত্তর থাকিতেন। কেহ যদি কখনও কিঞ্চিৎ উপকার করিত, তাহা হইলে ঐ একটি মাত্র উপকারের দ্বারাই চিরকাল সন্তুষ্ট থাকিতেন। কিন্তু কেহ যদি শত শত অপকার করিত, তাহা হইলেও তিনি উদারতাবশত তার অপকারের কথা মনে রাখিতেন না। শ্রীমান রাম অস্ত্রবিদ্যাভ্যাসে রত থাকিলেও অবসর সময়ে সৎস্বভাবসম্পন্ন, জ্ঞান বৃদ্ধ ও সজ্জন বয়োবৃদ্ধব্যক্তিগণের সহিত মিলিত হইয়া সর্বদা নানা বিষয় আলাপ করিতেন। বুদ্ধিমান রাম মধুরভাবে হিতকর বাক্য বলিতেন। সাধারণ ব্যক্তির সহিত ব্যবহারেও তিনি প্রথমেই কথা বলিতেন। তিনি মহাবীর ছিলেন, কিন্তু বীরত্বের জন্য গর্বিত ছিলেন না। বিদ্বান রাম কখনও মিথ্যা কথা বলিতেন না। সর্বদা বয়োজ্যেষ্ঠগণের সম্মান করিতেন। তিনি প্রজাগণের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। সকলের প্রতি সদয় থাকিলেও দীনজনের প্রতি সর্বদা তাঁহার দয়াদৃষ্টি ছিল। পরম পবিত্র রাম ক্রোধশূন্য, ব্রাহ্মণপূজাকারী, ধর্মপরায়ণ ও অধর্মের নিগ্রহকারী ছিলেন। তিনি বংশানুরূপ বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া ক্ষত্রিয় ধর্মকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন এবং ঐ ক্ষত্রিয়ধর্ম পালন করিলেই শ্রেষ্ঠ কীর্তি ও মহৎ স্বর্গফল লাভ হয়, ইহাও মনে করিতেন। তিনি অমঙ্গলজনক কর্মে প্রবৃত্ত হইতেন না। ধর্ম বিরুদ্ধ আলাপে রুচিহীন ছিলেন। বিবাদ সময়ে তিনি বৃহস্পতির ন্যায় ক্রমশ বিবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিতেন। শ্রীমান রাম বিনীত হইলেও তাঁহার অভিপ্রায় অতি নিগূঢ় ছিল, তিনি মন্ত্রণাদি বিষয় গোপনে রাখিতে পারিতেন এবং বহু সহায়যুক্ত হইয়া থাকিতেন। তাঁহার ক্রোধ ও হর্ষ নিষ্ফল ছিল না। তিনি অর্থের ব্যয় ও উপার্জনের বিধি সম্যগ্‌রূপে জানিতেন। গুরুজনের প্রতি অতিশয় ভক্তিমান এবং দৃঢ় সংকল্প রাম কখনও অসদ্‌বস্তু গ্রহণ করিতেন না এবং দুর্বাক্য বলিতেন না। তিনি সর্বদা আলস্যহীন ও প্রমাদ শূন্য থাকিতেন। নিজের ও অপরের দোষ জানিবার শক্তি তাঁহার ছিল। তিনি ছিলেন শাস্ত্রবিৎ কৃতজ্ঞ ও অন্যের মনোভাব বুঝিতে সমর্থ। বিধান অনুসারে নিগ্রহ করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল। তিনি সজ্জনগণের সংগ্রহে ও পালনে এবং দুষ্টগণের দমনে দেশ ও কালের অনুরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। ভ্রমর যেমন পুষ্পকে পীড়িত না করিয়া মধু আহরণ করে, সেইরূপ রামও প্রজাগণকে পীড়িত না করিয়া রাজস্ব গ্রহণ করিতে পটু ছিলেন। যেমন অর্থ উপার্জনের সকল উপায় জানিতেন, তেমনই নিয়মানুসারে অর্থ ব্যয় করিতেও জানিতেন, তাঁহার নানা শাস্ত্রে ও বিবিধ ভাষায় লিখিত নাটক প্রভৃতিতে শ্রেষ্ঠতা

ছিল। বিলাসিতার জন্য প্রয়োজনীয় নানাবিধ সঙ্গীতাদি শিল্পবিদ্যায় তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। হস্তী ও অশ্বের শিক্ষাদানে ও আরোহণে তাঁহার বিশেষ নৈপুণ্য ছিল। ধনুর্বেদনিপুণ ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়া রাম সংসারে অতিরথ বলিয়া বিখ্যাত হইয়া ছিলেন।...দর্প ও মাৎসর্য তাঁহার ছিল না। শ্রীমান রাম কাহারও অবজ্ঞার পাত্র ছিলেন না এবং কালের বশীভূত ছিলেন না।"(১)

কিন্তু রামায়ণ মহাকাব্য হত না। বাল্মীকি মহাকবি হতেন না যদি রামকে সত্যি এই রকম একটি নিশ্ছিদ্র রকমের দোষহীন চরিত্র হিসাবে দেখান হত। রামায়ণের রাম উপরিউক্ত চরিত্র বর্ণনা থেকে প্রায়ই পদে পদেই বিচ্যুত হয়ে একটি রক্ত মাংসের মানুষ হয়ে উঠেছেন। তাঁর কার্যাবলীর মধ্যে তাঁর যে চারিত্রিক দোষত্রুটি ফুটে উঠেছে তার আলোচনা করার আগে বাল্মীকি যেভাবে বিভিন্ন চরিত্রের মুখ দিয়ে রামের দোষ কীর্তন করেছেন তার কিছু উদাহরণ দেব। এই প্রসঙ্গে সর্বপ্রথমে মনে পড়ে মৃত্যুমুখী বালীর কৃত রাম নিন্দার কথা। রামকে বালী বলেন, "আমি পূর্বে তোমাকে পাপাচারী, ধার্মিক বেশধারী, তৃণাবৃত কূপের ন্যায় গুপ্তভাবে অনিষ্টকারী বলিয়া জানিতে পারি নাই। এখন জানিতে পারিলাম যে, তুমি বাস্তবিক অধার্মিক, ধার্মিক চিহ্নমাত্রধারী, পাপকর্মপরায়ণ, সাধুদিগের প্রাণঘাতক এবং ভস্মসমাচ্ছন্ন অগ্নির ন্যায় গুপ্তভাবে অনিষ্টকারী। আমি তোমাকে অবজ্ঞাও করি নাই, আর তোমার রাজ্যে বা নগরে অল্পমাত্রও পাপাচারণ করি নাই এবং তোমার সহিত যুদ্ধ করিতেও প্রবৃত্ত হই নাই; অন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিলাম, তবে তুমি বিনা অপরাধে কেন আমায় হিংসা করিলে?" (২)

কিন্তু বালী যখন এই নিন্দা করেছিলেন তখন তো তাঁর রামের উপর সংগত কারণেই প্রচণ্ড আক্রোশ হয়েছিল। বালী রামকে অন্তরঙ্গভাবে চিনতেনও না। রামকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসত যে দুজন ব্যক্তি সেই লক্ষ্মণ ও সীতার মুখ দিয়ে যে নিন্দা করা হয়েছে তার মধ্যে অনেক বেশী সূক্ষ্মতার সন্ধান পাওয়া যায়। এই দুইজনের মধ্যেও আবার সীতারই মনে হয় রামের চারিত্রিক দুর্বলতাগুলি সম্বন্ধে খুব পরিষ্কার জ্ঞান ও বোধ ছিল। রামায়ণের নানান অংশেই সীতার এই তীক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। সীতা সাবিত্রী বলতে আমাদের মনে ভেসে ওঠে এমন এক নারীর চিত্র যে পতিদেবতার কোন দোষই দেখতে পায় না, অন্ধভক্তিতে সর্বদা গদগদ হয়ে থাকে। কিন্তু সীতার মোটেই রামের প্রতি এই রকম অন্ধভক্তি ছিল না। তিনি যেভাবে রামকে কখনও উপহাস করেছেন, কখনও উপদেশ দিয়েছেন, কখনও তিরস্কার করেছেন তা পড়ে বিস্ময় ও পুলকে রোমাঞ্চিত হতে হয়। উপহাসের উদাহরণ—রাম যখন সীতাকে তাঁর সঙ্গে বনে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত করার জন্য বনবাস কত কষ্টের বলে ভয় দেখাতে চেষ্টা করেন তখন সীতা এই প্রকার বাক্য বলে বিদ্রূপ করেন: "তুমি এইরূপ লঘু ও অসার কথা বলিতেছ কেন? তোমার কথা শুনিয়া আমার হাস্য সংবরণ করা সম্ভব হইতেছে না। এমন কথা তুমি বলিলে, যাহা শাস্ত্র ও অস্ত্রে নিপুণ বীর্যবান রাজপুত্রগণের পক্ষে সর্বথা অযোগ্য ও অকীর্তিকর। অতএব তাহা শুনিবার যোগ্যই নয়।" (৩) শুধু তাই না, তিনি আরও বলেন, "তুমি পুরুষের আকৃতি বিশিষ্ট স্ত্রীলোক ইহা জানিয়াই কি আমার পিতৃদেব মিথিলাপতি জনক তোমাকে জামাতা হইবার যোগ্য মনে করিয়াছিলেন?" (৪)

উপদেশের উদাহরণ—দণ্ডকারণ্যে রাম যখন বেপরোয়া ভাবে রাক্ষস বধ করে চলেছেন এবং মাঝে মাঝেই রাক্ষসদের দ্বারা নিগৃহীত হচ্ছেন তখন গম্ভীরভাবে সীতা রামকে তাঁর চরিত্র বিষয়ে এইভাবে উপদেশ দেন ঃ "অতি সূক্ষ্মবিচার করিয়া দেখিলে তুমি মহাত্মা হইয়াও অধর্ম সঞ্চয় করিতেছ। কিন্তু তুমি যদি কামজন্য ব্যসন হইতে নিবৃত্ত হও, তবে সমস্ত অধর্ম হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। ইহলোকে কামজন্য বাসন ত্রিবিধ। প্রথম—মিথ্যা-বাক্য, দ্বিতীয়—পরস্ত্রীগমন, তৃতীয়—শত্রুতা ব্যতিরেকে প্রাণিহনন।...তুমি কোন কারণেই মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ কর নাই এবং ভবিষ্যতেও করিবে না। ...তোমার ধর্মনাশক পরস্ত্রী-গমনের অভিলাষ নাই, কারণ তাহা পূর্বেও ছিল না, পরেও হইবে না। ...কিন্তু শত্রুতা-ভিন্ন মোহগ্রস্ত হইয়া পরপ্রাণ হিংসারূপ যে অতি ভয়ানক তৃতীয় ব্যসন, এখন তোমার তাহাই উপস্থিত হইয়াছে। ...তুমি কখনও শত্রুতা ব্যতিরেকে ধনুর্ধারণ করিয়া দণ্ডকারণ্যবাসী রাক্ষসদিগকে বধ করিতে যাইও না। কেন না, কোন ব্যক্তি কাহাকেও বিনা অপরাধে বধ করা যুক্তিযুক্ত মনে করে না।"(৫)

আর সীতা কর্তৃক রামকে তিরস্কারের উদাহরণ—লঙ্কা জয়ের পর রাম যখন সীতাকে প্রথম সম্ভাষণেই সর্বসমক্ষে চূড়ান্ত রকমে অপমান করেন। তখন সীতা অপূর্ব মর্যাদা ও গরিমার সঙ্গে বলেন ঃ "প্রাকৃত ব্যক্তি প্রাকৃত মহিলাকে যেরূপ বলিয়া থাকেন, তদ্রূপ আপনি আমাকে এরূপ কঠোর, অনুচিত ও কর্কট্ বাক্য শ্রবণ করাইতেছেন কেন?"(৬) দেখা যাচ্ছে যে সীতা যতই সতীসাধ্বী হউন না কেন পতিদেবতার ইতরতাকে সর্বসমক্ষে ইতরতা বলেই বর্ণনা করার মত তেজ তাঁর ছিল।

এই কয়েকটি উদ্ধৃতি দিলাম দেখাতে যে রামায়ণে রামকে মোটেই কোন অতি মানবিক দোষস্পর্শহীন পুত্তলিকাবৎ চিত্রিত করা হয়নি। বাল্মীকি তাঁর বিভিন্ন গুণের কথা যেমন বলেছেন তেমনি নিজেই তাঁর মানবিক দোষের কথায় বলেছেন। কিন্তু বাল্মীকি যা বলেন নি, অন্য কোন চরিত্রের মুখ দিয়ে যা প্রকাশ করা হয়নি রামের এমন অনেক দোষগুণের পরিচয় রামায়ণের কাহিনী বিশ্লেষণ করে পাওয়া যায়।

২

সত্যপরায়ণতার জন্য শ্রীরামচন্দ্র ভুবন বিখ্যাত। কিন্তু ভাল করে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় রামচন্দ্রের বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যদি কোন একটিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতে হয় তো সেই বৈশিষ্ট্যটি সত্যপরায়ণতা নয় তা একটি দোষ, যাকে চলতি বাংলায় বলা হয় "গোঁয়ারতুমি"। বস্তুত, সত্যরক্ষা ব্যাপারটা পুরাণ প্রসিদ্ধ সত্যরক্ষক ব্যক্তিদের অনেক ক্ষেত্রেই—এই প্রসংগে বেশী করে মনে পড়ে ভীষ্মের নাম—গোঁয়ারতুমি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। রামায়ণের কাহিনীটাই একেবারে অন্য রকম হত, হয়তো কোন কাহিনীই হত না, যদি না রাম বনবাসে যেতেন। বনবাসে না গেলে সীতা হরণ হত না, রাবণের সংগে যুদ্ধও হত না, সোনার লংকা পুড়ে ছারখার হত না, সীতাকে পুনর্বার বনবাসে প্রেরণ করা হত না, কিছুই হত না।

রামের বনবাসে যাওয়ার সপক্ষে ও বিপক্ষে যে জাতীয় বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী যুক্তি নাটকের কুশীলবরা অযোধ্যা কাণ্ডে উত্থাপন করেন তার দ্বারা এমন একটি ধর্মসঙ্কটের সৃষ্টি হয় যা অত্যন্ত চিত্তচমৎকারী, যা আশ্চর্য রকমের আধুনিক মনের চিহ্নবহনকারী, যে মনকে বিংশ শতাব্দীর মন বলেও ভুল করা যেতে পারে। রামায়ণের এই অংশটির বিশদ আলোচনা থেকে অনেক কিছুই শিক্ষা পাওয়া যায় এবং এই নাটকীয় পরিস্থিতিতে বিভিন্ন চরিত্রগুলি নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে অত্যন্ত অল্প পরিসরে যেমনভাবে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার নজির বিশ্ব সাহিত্যে দুর্লভ। আমরা এই পর্য্যায়ের আলোচনা করে দেখব রামের সত্য-রক্ষার ব্যাপারটা কতটা ছিল আসলে নিছক গোঁয়ারতুমি।

দশরথ কৈকেয়ীকে বর দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন বইকি। কিন্তু কৈকেয়ী যে বর চাইলেন তা দশরথ দিতে অস্বীকার করেন। ফলে সত্যরক্ষার দৃষ্টিভংগি থেকে দেখলে বলা যেতে পারে যে, দশরথ সত্যভঙ্গ করেছিলেন। কৈকেয়ীর বর প্রার্থনা শুনে দশরথ বারবার মূর্ছিত হয়ে পড়েন এবং যখন তিনি কথা বলতে পারেন তখন তিনি কৈকেয়ীকে চূড়ান্তভাবে তিরস্কার করেন এইভাবে :—"ব্যাধ যেমন গীত শব্দের দ্বারা হরিণকে আকৃষ্ট করিয়া বধ করে তুমিও সেইরূপ প্রিয়বাক্যে আমাকে আকৃষ্ট করিয়া বধ করিতে উদ্যত হইয়াছ। আমি অতিশয় মূর্খ। সেই জন্য কণ্ঠসংলগ্ন মৃত্যুরজ্জুর ন্যায় তোমাকে অজ্ঞানবশত এতদিন রক্ষা করিয়া আসিতেছি। আমি তোমার সহিত বিহার করিয়াছি, কিন্তু তুমি যে আমার মৃত্যুরূপিণী ইহা বুঝিতে পারি নাই। বালক যেমন নির্জন স্থানে হস্তের দ্বারা মৃত্যুস্বরূপ কৃষ্ণসর্পকে স্পর্শ করে, আমিও সেইরূপেই তোমাকে স্পর্শ করিয়াছি" ইত্যাদি। আরও বলেন, "আমি অগ্নির সম্মুখে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক তোমার যে হস্ত ধারণ করিয়াছিলাম তাহা পরিত্যাগ করিলাম এবং আমার ঔরসজাত তোমার পুত্রকে তোমার সহিত পরিত্যাগ করিলাম!"(৭) দশরথ যে কৈকেয়ীর কথা একেবারেই মানেন নি সে বিষয়ে কোন অস্পষ্টতা রাখা হয়নি। যেমন তিনি বলেন, "আমি কৌশল্যা, সুমিত্রা এবং রাজলক্ষ্মীকে ত্যাগ করিতে পারি, এমনকি স্বয়ং প্রাণ পরিত্যাগ করিতেও পারি কিন্তু পিতৃবৎসল রামকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না।" আরও বলেন, "তুমি গ্লানিতে মগ্নই হও কিংবা অগ্নিতে প্রজ্জ্বলিতই হও অথবা বিনাশ প্রাপ্ত হও কিংবা সহস্রবার নিজ শরীরে আঘাত করিয়া ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হও, তথাপি তোমার অতি দারুণ বাক্যানুসারে কার্য করিব না, যেহেতু তাহা আমার অতীব অহিতকর।"(৮) রামকে বনে প্রেরণ করাকে দশরথ যে মোটেই ধর্মসঙ্গত মনে করেন নি, তার প্রমাণ নিম্নলিখিত বাক্যগুলি : "আমি যদি পুত্রের পরিবর্তে তোমার প্রীতি সাধন করি, তাহা হইলে আর্যগণ যেমন মদ্যপায়ী ব্রাহ্মণকে অনার্য বলিয়া নিন্দা করেন, সেইরূপ আমাকেও পথে গমন করিতে দেখিলে অনার্য বলিয়া নিন্দা করিবেন"(৯) এবং এও বলেন "ইহাতে সকল মনুষ্য অবশ্যই আমার নিন্দা করিয়া বলিবে যে, রাজা দশরথ বুদ্ধিহীন ও অতিশয় কামুক। এই জন্যই তিনি স্ত্রীর কথায় প্রিয়তম পুত্রকে বনে প্রেরণ করিলেন।"(১০) দেখা যাচ্ছে, শুধু তাঁর নিজের চোখে নয়, দশরথের মতে, সাধারণ লোকের চোখেও রামকে বনে প্রেরণ করাটা অধর্মরূপে পরিগণিত হত।

সমস্ত রাত্রি কৈকেয়ী ও দশরথের মধ্যে বাগযুদ্ধ চলে। সকাল বেলা দশরথ, সুমন্ত্রকে দিয়ে রামকে ডেকে পাঠান এবং রাম উপস্থিত হলে "দৈন্যযুক্ত মহারাজ 'রাম' এই কথা

বলিয়া আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না।" (১১) কৈকেয়ী রামকে বলেন, "তুমি অতিশয় প্রিয়, এই জন্য তোমাকে অপ্রিয় বাক্য বলিতে ইঁহার রসনা প্রবৃত্ত হইতেছে না। কিন্তু ইনি আমার নিকটে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন তাহা পালন করা তোমার অবশ্য কর্তব্য।" (১২) এর পর কৈকেয়ী রামকে খুলে দশরথের তাঁকে বর দেওয়ার কথা বলেন। এবং তিনি কি বর চেয়েছেন তাও জানান। রাম বলেন, "কিন্তু এই মনদুঃখে আমার অন্তর দগ্ধ হইতেছে, মহারাজ স্বয়ং আমাকে ভরতের অভিষেকের কথা বলিলেন না।" (১৩) কৈকেয়ী বলেন, "মহারাজ লজ্জিত হইয়াছেন বলিয়াই নিজে তোমাকে কিছু বলিতে পারিতেছেন না। ইহা অতি সামান্য ব্যাপার, ধর্তব্যই নয়।"(১৪) কৈকেয়ীর এই মিথ্যা বাক্য শুনে দশরথ "দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে 'উঃ কি কষ্ট! আমাকে ধিক্!' এইরূপ বলার সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণপালঙ্কে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।"(১৫) পরে রাম যখন সীতা ও লক্ষ্মণকে সংগে নিয়ে দশরথের কাছে বিদায় নিতে আসেন তখনও দশরথ বারবার মূর্ছিত হয়ে পড়েন। কৈকেয়ীর বর বিষয়ে শুধু এইটুকুই বলেন, "আমি কৈকেয়ীর বরদান বিষয়ে অতিশয় মোহগ্রস্ত হইয়াছি। তুমি আমাকে নিবৃত্ত করিয়া নিজেই এই অযোধ্যায় রাজা হও"। (১৬) সুতরাং দেখা যাচ্ছে, দশরথ রামকে বনে যেতে আজ্ঞাও দেননি, কৈকেয়ীকেও সেই রকম কোন বরই দেননি। রাম যে দশরথের কথায় নয়, কৈকেয়ীর কথায় বনে গিয়েছিলেন তা তাঁর নিজের উক্তি থেকে প্রমাণ হয়। "পিতৃদেব না বলিলেও আমি আপনার কথা অনুসারে চতুর্দশ বৎসর নির্জন বনে বাস করিব।"(১৭)

রামের বনবাসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত একেবারেই তাঁর নিজস্ব। কৌশল্যা, লক্ষ্মণ ও ভরত তাঁর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যে সব যুক্তি দেন তার উত্তরে রাম কোন যুক্তিই দিতে পারেন না। শুধু এক কথা বলে চলেন যে, তাঁর পিতার সত্যকে রক্ষা করতেই হবে "নাস্তি শক্তিঃ পিতৃর্বাক্যং সমতিক্রমিতং মম"। (১৮) [পিতার বাক্য লঙ্ঘন করিবার সামর্থ্য আমার নাই।]

কৌশল্যা বলেছিলেন, "পিতা দশরথ তোমার যেরূপ পূজণীয়, আমিও মাতৃরূপে সেই রূপেই পূজা পাইবার যোগ্য। আমি তোমাকে বনে যাইতে অনুমতি দিতেছি না, অতএব তোমার বনে যাওয়া উচিত নয়।" (১৯) এবং ভয় দেখান এই বলে "তুমিও মাতার মৃত্যু কারণ হইয়া সর্বলোকপ্রসিদ্ধ নরকদুঃখ প্রাপ্ত হইবে।"(২০) রাম কৌশল্যার যুক্তি এড়িয়ে যেতে পিতার আজ্ঞায় পরশুরাম কুঠারের দ্বারা নিজ মাতার মস্তক ছেদন করেছিলেন এ জাতীয় কিছু গৌরবময় উদাহরণের উল্লেখ করেন।

লক্ষ্মণের সংগে রামের যে বাগ্‌বিতণ্ডা হয় তাতে লক্ষ্মণও রামকে বেশ কিছু সাফ্ কথা শুনিয়ে দেন। যেমন তিনি বলেন, "যে ধর্মের দ্বারা আপনার বুদ্ধি বিপর্যয় হইয়াছে যাহার দ্বারা আপনার মোহাবেশ হইয়াছে, আমি সেই ধর্মকে বিদ্বেষ করি।.. আপনার রাজ্যাভিষেকে কপটতার দ্বারা ব্যাঘাত সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহা আপনি বুঝিতেছেন না অপরন্তু ঐ গর্হিত কার্যকে ধর্ম বলিয়া বুঝিতেছেন।...আপনার এইরূপ কার্যে ধর্মভাব আরোপ করা সর্বলোক নিন্দিত"(২১) এবং শৌর্যবীর্যের জন্য বিখ্যাত রামকে পুরুষকারের অভাবের জন্য ধিক্কার দিয়ে লক্ষ্মণ বলেন "পিতামাতার এতাদৃশী বুদ্ধি দৈবের দ্বারা হইয়াছে ইহাই যদি আপনার ধারণা হইয়া থাকে, তাহা হইলেও বলিতেছি যে, আপনার

রণার প্রতি উপেক্ষা করা উচিত, যেহেতু আমি দৈবকে পছন্দ করি না। যে ব্যক্তি শয় কাতর ও দুর্বল, সেই ব্যক্তিই দৈবের অনুগমন করে। যাহারা বীর ও সংসারে বলিয়া সম্মানিত, তাহারা কখনও দৈবের উপাসনা করেন না। যিনি নিজ পুরুষকারের দৈবকে বাধিত করিতে সমর্থ, তিনি দৈবের জন্য কদাচিৎ হতাশ হইলেও অবসন্ন না।" (২২)

পরে ভরত গিয়ে চিত্রকূট পর্বতে রামকে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টায় অন্য এক যুক্তি দেন, রথ প্রজাপালনের জন্য আপনাকে বর্ধিত করিয়াছেন, যদি প্রজাপালনরূপ ফল না হয়, হইলে মহারাজ দশরথ প্রীতিলাভ করিবেন কিরূপে? আপনি আমাদের সকলেরই ও পালন করিতে সমর্থ, কিন্তু আপনি আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন না।.. ভরত াবে রামের নিকট প্রার্থনা করিলে পর নগরবাসী প্রধান অপ্রধান সকলেই 'সাধু', 'সাধু' য়া ভরতের প্রার্থনা অনুমোদন করিল।"(২৩) এখানে ভরত রামকে অন্য আর একটি র কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন—রাজধর্ম। প্রজাদের প্রতিও রামের যে একটি কর্তব্য হ সেই কর্তব্যের কথা। রাম এই প্রসংগও এড়িয়ে যান।

সুতরাং এই কথা বোধ হয় স্থির নিশ্চয়ভাবে বলা যায় যে, রামের বনগমনে যা প্রতিপন্ন তা ততটা তাঁর সত্যপরায়ণতা নয় যতটা তাঁর আকাশচুম্বী অহং বোধ। এবং পুরুষকার বের মধ্যে দৈবকেই যে রাম বেশী গুরুত্ব দেন তা শুধু লক্ষ্মণের তিরস্কার, যা আগে ত করেছি, তার মধ্যেই প্রকাশ পায় না, স্পষ্টভাবে তিনি নিজ মুখেই তা স্বীকার ন নিম্নলিখিত বাক্যে:

"জীব স্বভাবতই পরাধীন, সে স্বেচ্ছানুসারে কোন কার্য করিতে পারে না। সর্বগ্রাসী তাহাকে ইহলোকে ও পরলোকে সর্বদা পরিচালিত করিতেছে।" (২৪) তাঁর বোধের সংগে ছিল ভীতি। যার কথা তিনি নিজেই এইভাবে বলেছেন: "আমি ক্রুদ্ধ া একাকীই অযোধ্যা এমন কি সমস্ত পৃথিবীকে বাণের দ্বারা আয়ত্ত করিতে পারি। আমার বীরত্ব বৃথা যাইতেছে।...আমি অধর্ম ও পরলোকের ভয়ে ভীত বলিয়া অদ্যই য় অভিষিক্ত হইতে পারিতেছি না।"(২৫)

৩

রামের পত্নীপ্রেম তাঁর দ্বিতীয় প্রধান চারিত্রিক গুণরূপে কীর্তিত হয়ে এসেছে। সীতার রামের মনোভাবে যে বহুল পরিমাণে অতিশয় সুকোমল ও সূক্ষ্ম ভালবাসা ছিল এবং ভালবাসার মধ্যে কাম ও প্রেমের মিশ্রণ যে রকম সুন্দরভাবে ঘটেছিল তা যে প্রাচীন হত্যে বিরল তার আলোচনা আমরা 'রামকৃষ্ণ' প্রবন্ধে করেছি। রাম যে পত্নীতে অনুগত ছিলেন, এক পত্নী ছাড়া আর কোন নারীতে কোন দিনও যে তিনি পরিমাণেও আসক্ত হন নি, এই ঘটনাটি অবশ্যই অতি চমৎকার ও বিস্ময়কর। পুরাণ- ন্ধে খুব বেশী পুরুষের কথা মনে করা যায় না, যাঁরা এইভাবে একনিষ্ঠ প্রেমের উদাহরণ গেছেন। কিন্তু সীতার প্রতি রামের প্রেম যতই মহৎ হউক রামের প্রতি সীতার যে প্রেম

তার সমতুল্য তা কখন ছিল না। সীতার প্রেমের মধ্যে যে পরিমাণ দৃপ্ত মর্যাদাবোধ মিশ্রিত ছিল তা রামের পত্নীপ্রেমে ছিল না। তাঁর প্রেমের চেয়ে বড় ছিল তাঁর অহংবোধ। শক্তিশালী ছিল তাঁর লোকভয়। রাম যে সীতার সঙ্গে চূড়ান্ত নির্দয় ও অন্যায় করেছিলেন তা তাঁর ন্যায়বুদ্ধি বা দয়ার অভাব ততটা সূচিত করে না যতটা করে অহংবোধকে এবং লোকভীতকে। লঙ্কা জয়ের অব্যবহিত পরই সীতার সঙ্গে রাম যে রূপ ব্যবহার করেন তার তুলনা হয় না। সীতা, যিনি তাঁর প্রিয়তম স্বামীর সঙ্গে মিলনের জন্য উন্মুখ হয়ে ছিলেন, এত দীর্ঘকালের এত কৃচ্ছ্র ও লাঞ্ছনার পর তিনি পতির সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য কি প্রকার ব্যাকুল হয়েছিলেন তা বাল্মীকি শ্রোতার কল্পনার উপর ছেড়ে দেননি। অত্যন্ত সুন্দর কাব্যময় ভাষায় তার বর্ণনা করেছেন। সেই সীতাকে রাম মুহূর্তকালের জন্যও নিভৃত মিলনের সুযোগ দিলেন না। প্রথমে তিনি বিভীষণকে হুকুম দিলেন বিশেষভাবে স্নান করিয়ে বেশভূষা পরিয়ে সীতাকে "সত্বর এখানে আনয়ন কর, বিলম্ব করিও না।" (২৬) সীতার ধৈর্য ছিল না অত রকমভাবে প্রস্তুত হতে। কিন্তু তিনি স্বামীর আজ্ঞা মেনে নিলেন। তাঁকে রাক্ষস প্রহরীগণে পরিবৃত শিবিকায় আনয়ন করা হল। চতুর্দিকে ভল্লুক, বানর ও রাক্ষস পুরুষদের ভিড়। বিভীষণ সঙ্গতভাবে সীতা, যাঁর সম্বন্ধে অযোধ্যাকাণ্ডে বলা হয়েছে: "আকাশগামী প্রাণীরাও পূর্বে যাহাকে দেখিতে পারে নাই" সেই সীতার জন্য পথ করে দেওয়ার জন্য ঐ পুরুষদের অপসারণ করার ব্যবস্থা করলেন। রামচন্দ্রের হঠাৎ গণতান্ত্রিক চেতনা জেগে উঠল। তিনি "রোষভরে উৎসারণকারীদিগকে নিষেধ করিলেন। সক্রোধ দৃষ্টিতে যেন তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া বলিলেন, ইহারা সকলে আমার স্বজন...জানকী শিবিকা পরিত্যাগ করিয়া পদব্রজেই আমার নিকটে আগমন করুন। এবং বানরগণ সকলেই তাঁহাকে দর্শন করুন।" (২৭) এই কথা শুনে "লক্ষ্মণ সুগ্রীব ও বানররূপ হনুমান অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। এবং অনুমান করিয়া

আত্মমধ্যেই যেন প্রবিষ্ট হইয়া বিভীষণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত রাম সমীপে উপস্থিত হইলেন।" (২৮) কিন্তু সীতা তো তখনও কিছুই জানেন না যে তাঁর জন্য কি অপেক্ষা করছে। রাম প্রথমত তাঁর নিজের পৌরুষের গর্ব করলেন। পরে সুগ্রীব, হনুমান, বিভীষণ প্রভৃতিদের প্রশংসা করলেন যা শুনে সীতা "মৃগীর ন্যায় উৎফুল্ললোচন হইয়া অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন।" (২৯) তারপরেই সীতা পেলেন তাঁর অতুলনীয় পতি প্রেমের চরম পুরস্কার। রাম সীতাকে বললেন, "তোমার কল্যাণ হউক। তুমি জানিবে আমি সুহৃদগণের বীর্যবলে যে দারুণ রণ-পরিশ্রম করিয়াছি ইহা তোমার নিমিত্ত নহে। তোমার অপহরণজনিত অপবাদ অপনয়ন এবং প্রখ্যাত নিজ বংশের কলঙ্ক ক্ষালন করিবার নিমিত্ত আমি ঈদৃশ কার্য করিয়াছি। সীতে! তোমার চরিত্রে আমার সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। জনকাত্মজে! এই দশদিক দেখিতেছ ইহার যে দিকে ইচ্ছা হয়, গমন কর, আমি তোমায় অনুমতি দিলাম। তোমাকে আর আমার প্রয়োজন নাই।" (৩০) এবং এও যেন যথেষ্ট নয়, অপমানের ষোলকলা পূর্ণ করার জন্য রাম আরও বললেন, "এক্ষণে ভরত বা লক্ষ্মণ সংরক্ষণে থাকিবার তোমার ইচ্ছা হয়ত তাহাই কর। শত্রুঘ্ন, সুগ্রীব কিম্বা বিভীষণের নিকট থাকিবার মন চায়ত সুখে ইহাদিগের নিকট থাকিতে পার।" (৩১)

রামায়ণের এই চূড়ান্ত রকমের লজ্জাকর পর্যায় যদি সম্পূর্ণরূপে মর্যাদা শূন্য না হয়

।কে তার কারণ তেজস্বিনী সীতার দৃপ্ত প্রতিক্রিয়া। সীতা আত্মপক্ষ সমর্থনে যা বললেন, ।ার মধ্যে সংগত যুক্তি ছিল। কিন্তু এতটুকুও কাতরতা ছিল না। সীতা এই সময়ই রামকে প্রাকৃতজনের ন্যায়' ব্যবহার করার জন্য তিরস্কার করেছিলেন, যা আমরা আগেই উল্লেখ রেছি। এখানেও যদি মনে করা হয় যে এই ব্যবহারের দ্বারা রামের সীতার প্রতি অনু-াগের অভাব প্রকাশ পেয়েছে তা ভুল হবে, কেননা বাল্মীকি স্পষ্টই লিখেছেন রাম । করলেন তা "জনবাদ্‌ভয়াৎ"—"লোকাপবাদের ভয়ে রাজা রামের মন দ্বিধা বিভক্ত ইল।" (৩২)

রাম যে লোকভয়ের বশে সীতার সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করেছিলেন সেটা কিছু নতুন কথা য়, প্রসঙ্গটি পুরাতন ও পরিচিত। যখন কোন লোকনিন্দার ভয় নেই এমন অনেক বস্থাতেও কিন্তু রাম সীতার সম্বন্ধে এমন তাচ্ছিল্য ও অপমান সহকারে কথা বলেছেন । মোটেই তাঁর গৌরববৃদ্ধি করে না। কথায় কথায় তিনি সীতাকে অপর পুরুষকে দান রে দিচ্ছিলেন। যেমন কৈকেয়ী যখন দশরথের হয়ে রামকে বনবাসে যাওয়ার কথা বলেন তনি বিন্দুমাত্র সময় না নিয়ে পরম উদারতা সহকারে বলেন, "ভরত আমার ভ্রাতা। আমি াপনার প্রীতির জন্যই ভরতকে রাজ্য, প্রাণ, অন্যান্য প্রার্থিত বস্তু, ঐশ্বর্য এমন কি ীতাকেও দান করিতে পারি, ইহাতে আমার আনন্দই হইবে।" (৩৩) ইন্দ্রজিতের বাণে ূর্ছিত রাম চেতনা ফিরে পেয়ে লক্ষ্মণকে মৃতবৎ দেখে আক্ষেপ করে বললেন, "মর্ত্যলোকে নুসন্ধান করিলে সীতার ন্যায় রমণী মিলিতে পারে, কিন্তু লক্ষ্মণের সমান সহচর ও সমর নপুণ ভ্রাতা মিলিবে না।" (৩৪) একই ধরণের অবস্থায় রামের অপর একটি উক্তি তো াতি পরিচিত, যদিও তাকে রামের ভ্রাতৃপ্রেমের নিদর্শন হিসাবে নেওয়া হয়েছে, পত্নীর াতি অবজ্ঞার দিকটা লোকচক্ষে চাপা পড়েছে: "দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ ান্ধবাঃ। তং তু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ।"—"প্রতিদেশেই কলত্র এবং বান্ধব াওয়া যায়,—কিন্তু সহোদর ভ্রাতা প্রাপ্ত হওয়া যায়,—এইরূপ দেশ দেখিতে পাই না।' ৩৫) অবশ্য সুগ্রীবকে যখন তিনি বলেন, "অধুনা তুমি এইরূপ দুঃসাহস করিবে না যদি তামার কিছু হয়, তাহা হইলে আমি, সীতা, ভরত, লক্ষ্মণ, কনিষ্ঠ ভ্রাতা শত্রুঘ্ন এবং স্বীয় ারীর লইয়াই বা কি করিব।" (৩৬) তখন তিনি হয়তো সীতার সম্বন্ধে বিশেষ কোন মনোভাব াকাশ করেন না। যা করেন তা মিথ্যাশ্রয়ী অতিশয়োক্তি, যেই প্রবণতার আলোচনা আমরা াইবার করব।

৪

রামের সত্যপরায়ণতার প্রকাশ তাঁর বনবাসে যাওয়ার আত্মঘাতী জেদের মধ্যে যে ারিমাণে প্রকাশ পেয়েছিল তা অন্য কোন ব্যাপারেই পায়নি। অন্যান্য লোকেদের সম্বন্ধে াভিমত প্রকাশে তিনি একেবারেই সঙ্গতি মেনে চলতেন না। এই সঙ্গতির অভাব সজ্ঞান মথ্যাচার বা ভণ্ডামি না মনের স্বাভাবিক দোদুল্যমান অবস্থার প্রকাশক তা জোর করে বলা ায় না। কিন্তু যদিও তিনি গর্ব করে কৈকেয়ীকে বলেছিলেন, "নিশ্চয় জানিবেন রাম

দুই প্রকার কথা বলে না।"(৩৭) কিন্তু তাঁর দুই রকম কথা বলার উদাহরণ বেশ কিছু পা
যায়। কৈকেয়ী যখন প্রথম রামকে দশরথের নামে বনে যাওয়ার কথা বলেন তখন তি
মহত্ত্বের বাড়াবাড়ি দেখিয়ে বলেন, "রাজা দশরথ আমার পিতা, গুরু, হিতৈষী ও কৃত
আমি তাঁহার নিয়োগে বিশ্বস্তচিত্তে কোন্ প্রিয়কার্য না করিতে পারি।"(৩৮) কিন্তু
বনবাসে যাওয়ার পর তিনি লক্ষ্মণকে বলেন, "কোন অবিদ্বান ব্যক্তি স্ত্রীর জন্য আমার ন
আজ্ঞানুবর্তী পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে পারে?" (৩৯) তেমনি কৈকেয়ী যখন প্রথম তঁ
বনবাসে যাওয়ার কথা বলেন তখন এবং তার পরেও অনেক বারই তিনি ঘোষণা করেন
কৈকেয়ীর সম্বন্ধে তাঁর মনে কোন বিরূপতা নেই। কিন্তু বনবাসের প্রথম রাত্রিতে তি
লক্ষ্মণকে বলেন, "আমি মনে করি যে, দশরথের বিনাশের জন্য, আমার নির্বাসনের জ
ও ভরতের রাজ্যপ্রাপ্তির জন্যই কৈকেয়ী আমাদের গৃহে আসিয়াছেন। আমার আশঙ্কা
যে সৌভাগ্যমদে মত্ত হইয়া কৈকেয়ী আমার জন্য এক্ষণে মাতা কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে ক
কষ্ট দিতেছেন।.. তিনি তোমার মাতাকে ও আমার মাতাকে বিষও দিতে পারেন।"(
বিরাধ রাক্ষস যখন সীতাকে কোলে তুলে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ করে তখন তিনি হা হু
করে বলেন, "আমার প্রতি যেরূপ হওয়া কৈকেয়ীর অভিপ্রেত, যাহা তাঁহার প্রিয় ছিল এ
যে উদ্দেশ্যে তিনি বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা অতি শীঘ্র সিদ্ধ হইতে চলি
যিনি পুত্রের নিমিত্ত রাজ্যলাভ করিয়াও সন্তুষ্ট হন নাই, সমস্ত প্রাণী আমার প্রতি প্রী
থাকা সত্ত্বেও তিনি আমাকে বনে নির্বাসিত করিয়াছেন, অধুনা সেই মধ্যমজননী কৈকে
দেবীর মনোরথ সফল হইল।"(৪১) কিন্তু লক্ষ্মণ যখন কৈকেয়ীর সম্বন্ধে কিছু কটূ মং
করেন তখন রাম মহত্ব দেখান এই বলে, "ভ্রাতঃ তুমি কোন প্রকারেই সেই মধ্যম জননী
নিন্দা করিও না। যদি কিছু বলিতেই হয় তবে সেই ঐক্ষ্বাকুলনাথ ভরতের ক
বল।"(৪২) উদ্ধৃত উক্তিটির শেষাংশ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। দশরথের সম্বন্ধে
কৈকেয়ী সম্বন্ধে রামের পরস্পর বিরোধী কথা বলা খুবই স্বাভাবিক মানসিকতার পরিচায়
কিন্তু ভরতের সম্বন্ধেও রাম যেরকম পরস্পরবিরোধী কথা বলতেন তাকে অতটা ক্ষমার চে
দেখা যায় না। ভরতের সম্বন্ধে তিনি বহুবারই নিন্দাসূচক মন্তব্য করেছেন কিন্তু যখ
লক্ষ্মণ সেরকম কিছু বলছেন তখনই তাঁকে খুব ভালভাবে ধমকে দিয়েছেন। সীতার ক
যখন রাম তাঁর বনবাসের কথা বলতে যান তখন তিনি প্রসঙ্গক্রমে বলেন, "তুমি ভর
নিকট কখনও আমার প্রশংসা করিও না। সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিরা অন্যের প্রশংসা সহ্য করি
পারে না। সেই জন্য ভরতের সম্মুখে আমার গুণকীর্তন করিও না।"(৪৩) আরো বলে
"ভরত রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া কৈকেয়ীর বাধ্য থাকিবে, তখন সে দুঃখিনী কৌশল্যা ও সুমি
ভরণ-পোষণ করিবে না।"(৪৪)

কিন্তু লক্ষ্মণ যখন চিত্রকূটের দিকে আগমনকারী ভরতকে দেখে, সন্দেহ করে
"কৈকেয়ী নন্দন ভরত রাজ্য নিষ্কণ্টকে ভোগ করিতে ইচ্ছা হইয়া আমাদের উভয়কে নি
করিবার জন্য এইস্থানে আসিতেছে।"(৪৫) তখন রাম বলেন, "ভরত যখন যথাসম
আমাদিগকে দেখিতে আসিতেছে, তখন সে যে মনে মনেও আমাদের প্রতি কোনরূপ অ
আচরণ করিতে পারে ইহা আমার মনে হয় না।"(৪৬) তিনি যদি শুধু এইটুকুই বল
তো তাতে দোষ ধরার কিছু থাকত না। কিন্তু তিনি যখন লক্ষ্মণকে বলেন, "ভরত

র্বে কখনও তোমার কোনরূপ অনিষ্ট করিয়াছে, যাহার জন্য তোমার ঐরূপ ভয় উপস্থিত ইয়াছে এবং তুমি ভরতের সম্বন্ধে এইরূপ আশঙ্কা করিতেছ ?...রাজ্যের জন্যাই যদি তুমি ইরূপ বলিয়া থাক, তাহা হইলে ভরতের সহিত দেখা হইলেই বলিব যে—লক্ষ্মণকে রাজ্য দান কর। লক্ষ্মণ! আমি তোমাকে রাজ্য দানের কথা বলিলে পর ভরত নিশ্চয় ইহাতে ম্মত হইবে"(৪৭) তখন বোঝা যায় যে প্রিয়জনের প্রতি নিষ্ঠুরতা রামের চরিত্রে ছিল হজাত। সীতার প্রতি ও লক্ষ্মণের প্রতি ত'ার অত্যধিক প্রেম ও ভালবাসা ছিল সেকথা অস্বীকার করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু তারই সঙ্গে মিশে থাকত অকারণে কঠিন ও নিষ্ঠুর আঘাত দেওয়ার প্রবণতা যা কিনা অত্যধিক অহংবোধপূর্ণ মানসিকতার পরিচায়ক। লক্ষ্মণকে উপরে উদ্ধৃত ঐ অত্যন্ত নিষ্ঠুর দোষারোপ করার ঠিক পূর্বেই তিনি বলেছিলেন, "আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে—তোমাদের মত ভ্রাতাদের জন্যাই আমি ধর্ম অর্থ কাম ও পৃথিবী কামনা করি।...ভরতকে তোমাকে ও শত্রুঘ্নকে ছাড়িয়া যদি আমার কোনরূপ সুখ হয়, তাহা হইলে সেই সুখকে অগ্নি ভস্মে পরিণত করুক।"(৪৮) রাম এই কথা আন্তরিকভাবে বলেন নি তা মনে করার কোন কারণ নেই।

রাম সত্য প্রতিজ্ঞ বলে কীর্তিত হয়ে এসেছেন। আমরা বিশ্লেষণ করে দেখলাম ঐ গুণটি ছিল আসলে গোঁয়ারতুমি নামক দোষের মুখোশ। তিনি তেজস্বী বলে কীর্তিত। আমরা বিশ্লেষণ করে দেখলাম তিনি ছিলেন অত্যন্ত বেশী পরিমাণ লোকভয়ে ভীত। ত'ার পত্নীপ্রেম ও ভ্রাতৃপ্রেম অমর জ্যোতিতে ভাস্বর। আমরা বিশ্লেষণ করে দেখলাম সেই প্রেমের সঙ্গে মিশে ছিল এই প্রিয়জনদের অকারণে আঘাত দেওয়ার এক নিষ্ঠুর প্রবণতা। তা সত্ত্বেও বাল্মীকি অঙ্কিত রাম চরিত্র এক অতি চমৎকার ও মহান মনুষ্য চরিত্র।

উদ্ধৃতি-নির্দেশক

১। অযোধ্যাকাণ্ড, সর্গ ১
২। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, সর্গ ১৭
৩। অযোধ্যাকাণ্ড, সর্গ ২০
৪। অযোধ্যাকাণ্ড, সর্গ ৩০
৫। অরণ্যকাণ্ড, সর্গ ৯
৬। যুদ্ধকাণ্ড, সর্গ ১১৬
৭। অযোধ্যাকাণ্ড, সর্গ ১২
৮। ঐ
৯। ঐ
১০। ঐ
১১। অযোধ্যাকাণ্ড, সর্গ ১৮
১২। ঐ
১৩। অযোধ্যাকাণ্ড, সর্গ ১৯
১৪। ঐ
১৫। ঐ

১৬। অযোধ্যাকাণ্ড, সর্গ ৩৪
১৭। অযোধ্যাকাণ্ড, সর্গ ১৯
১৮। অযোধ্যাকাণ্ড, সর্গ ২১
১৯। ঐ
২০। ঐ
২১। অযোধ্যাকাণ্ড, সর্গ ২৩
২২। ঐ
২৩। অযোধ্যাকাণ্ড, সর্গ ১০৫
২৪। অযোধ্যাকাণ্ড, সর্গ ৫৩
২৫। ঐ
২৬। যুদ্ধকাণ্ড, সর্গ ১১৪
২৭। ঐ
২৮। ঐ
২৯। যুদ্ধকাণ্ড, সর্গ ১১৫
৩০। ঐ
৩১। ঐ
৩২। ঐ
৩৩। অযোধ্যাকাণ্ড, সর্গ ১৯
৩৪। যুদ্ধকাণ্ড, সর্গ ৪৯
৩৫। যুদ্ধকাণ্ড, সর্গ ১০১
৩৬। যুদ্ধকাণ্ড, সর্গ ৪১
৩৭। অযোধ্যাকাণ্ড, সর্গ ১৯
৩৮। ঐ
৩৯। অযোধ্যাকাণ্ড, সর্গ ৫৩
৪০। ঐ
৪১। অরণ্যকাণ্ড, সর্গ ২
৪২। অরণ্যকাণ্ড, সর্গ ৪১
৪৩। অযোধ্যাকাণ্ড, সর্গ ২৬
৪৪। অযোধ্যাকাণ্ড, সর্গ ৩১
৪৫। অযোধ্যাকাণ্ড, সর্গ ৯৬
৪৬। অযোধ্যাকাণ্ড, সর্গ ৯৭
৪৭। ঐ
৪৮। ঐ

এই প্রবন্ধটি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে ''রাম চরিত্র'' নামে প্রকাশিত হয়েছিল "দেশ" পত্রিকায় ১৩৮৭ সালে।

একাদশ অধ্যায়

ব্রাহ্মণ্য পুরুষাদর্শ—শ্রীকৃষ্ণ

১

রাজশেখর বসু কৃষ্ণকে "মহাভারতের সবচেয়ে রহস্যময় পুরুষ" বলে বর্ণনা করেছেন ; শুধু মহাভারতে কেন আমাদের সমগ্র প্রাচীন সাহিত্যে কৃষ্ণের তুল্য রহস্যময় চরিত্র আর কোন পাওয়া যায় না। এই রহস্য বহুমুখী। সবচেয়ে বড় রহস্য এই যে কেন কবে কি করে এমন একটি অধর্ম-আশ্রয়কারী চরিত্রকে দেবাদিদেব বিষ্ণুর অবতারে রূপান্তরিত করা হল। কৃষ্ণ যে আগাগোড়াই ধর্ম লঙ্ঘন করেছিলেন—যে ধর্মের কথা তিনি নিজেই প্রচার করেছিলেন তার কথাই বলছি, অন্য কোন বাহ্য ধর্মাদর্শ নিয়ে বিচার করতে বসিনি—তা প্রতিপন্ন করার জন্য নানা যুক্তি ও উদ্ধৃতি "ব্রাহ্মণ্য পুরুষাদর্শ—রাম ও কৃষ্ণ" প্রবন্ধে দিয়েছি। তাদের পুনরুক্তি করার প্রয়োজন দেখি না এবং এই জটিল ও বিপুল রহস্যের কোন কিনারা করার প্রচেষ্টাও করব না। কিন্তু এই প্রাথমিক রহস্য ছাড়াও আরও অনেক রহস্য মহাভারতের কৃষ্ণকে ঘিরে রেখেছে। মহাভারতের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য ও প্রমাণের সাহায্য নিয়ে এই রহস্যজনিত অন্ধকারের উপর কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা যায় কিনা তার সন্ধান করব। কিন্তু মহাভারতের বাইরের অন্য কোন সাক্ষ্য-প্রমাণের আশ্রয় নেব না। মূল মহাভারত বলে কিছু থাকলেও তাতে চরিত্র ও ঘটনার বিবরণ কি রকম ছিল, পরবর্তীকালে বারংবার বিভিন্ন কবিদের হস্তক্ষেপণের ফলে পরিবর্তন বা বিকৃতি কি ধরণের কতটা হয়েছে এবং এই সকলের সঙ্গে ঐতিহাসিক সত্যের সম্পর্ক কতটুকু এই সব প্রসঙ্গের মধ্যে একেবারেই যাব না। তার কারণ, আমার অনুসন্ধানের ক্ষেত্র ইতিহাস নয়, ভারতবাসীর মন, যে মনের প্রতিফলন রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে ঘটেছে এবং যে মনকে গঠন করেছে ঐ একই রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ।

কৃষ্ণ-সম্পর্কিত যে রহস্যগুলির আলোচনা করতে চাইছি তাদের কয়েকটি প্রশ্নের সাহায্যে সূচিত করতে চাই। আলোচনার ভিতরেও প্রশ্নই বেশী উত্থাপন করব, অনুসন্ধানের দিঙ্‌-নির্দেশ করার জন্য কিছু অনুমানের সাহায্যও নেব, কিন্তু সঠিক উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব না। প্রথম প্রশ্ন, কৃষ্ণকে দেবতা বলে, দেবাদিদেব বলে বর্ণনা করা হয়েছে কিন্তু তাঁর কার্যাবলীর মধ্যে দেবত্বই বা কতটুকু পাই আর মনুষ্যত্বই বা কতটুকু দেখতে পাওয়া যায় ? দ্বিতীয় প্রশ্ন, কৃষ্ণ যে মহাভারতের আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত পাণ্ডবদের পক্ষ নিলেন, তিনি যে পাণ্ডবদের ক্রীড়নকের মত ব্যবহার করে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধটি ঘটালেন এবং কৌরবপক্ষকে ধ্বংস করলেন তার কারণ কি হতে পারে [ক] ? তৃতীয় প্রশ্ন, মহাভারতে কৃষ্ণকে দেবাদিদেবের স্থান দেওয়া হয়েছে আবার একই কালে তাঁর চূড়ান্ত নিন্দাও করা হয়েছে। এই অসঙ্গতির কি কারণ হতে পারে ?

প্রথম প্রশ্নের প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য এই যে কৃষ্ণকে দেবতা-চরিত্র-রূপে মোটেই আঁকা হয় নি। সাধারণ মনুষ্যচরিত্রের রূপেও নয়। তাঁকে আঁকা হয়েছে একটি অতিমানবিক চরিত্র-রূপে, অর্থাৎ এমন এক চরিত্র যিনি কিছু অতি-প্রাকৃতিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। রাজশেখর বসু লিখেছেন—"মূল মহাভারতের রচয়িতা কৃষ্ণকে ঈশ্বর বললেও সম্ভবত তাঁর আচরণে অতিপ্রাকৃত ব্যাপার বেশী দেখান নি।" (১) কিন্তু এ তো মূল মহাভারতের সম্বন্ধে তাঁর অনুমান, মহাভারতকে এখন যেভাবে পাচ্ছি তার সম্বন্ধে মন্তব্য নয়। তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রও যেখানেই কৃষ্ণ কোন অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতার ব্যবহার করেছেন মহাভারতের সেই অংশকেই প্রক্ষিপ্ত বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। তার ফলে তাঁকে মহাভারতে বর্ণিত কৃষ্ণের কীর্তিকলাপের বৃহদংশকেই বর্জন করতে হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে মূল মহাভারতের কৃষ্ণ দেবতা নয়, একজন আদর্শ মানুষ। এই কথা একেবারেই মানা যায় না, যেমন মানা যায় না রাজশেখর বসুর নিম্নলিখিত উক্তিটিকে: "সাধারণত তাঁর আচরণ গীতা ধর্ম ব্যাখ্যাতারই যোগ্য, তিনি বীতরাগভয়ক্রোধ স্থিতপ্রজ্ঞ লোকহিতে রত।" (২) লোকহিতে তিনি কখন রত ছিলেন? তিনি শুধু পাণ্ডবদের হিতেই রত ছিলেন এবং প্রকাশ্যে তা ঘোষণাও করতেন। ভয়ের প্রকাশ তিনি কখনও করেননি বটে, কিন্তু ক্রোধের প্রকাশ তিনি বহুবারই করেছেন এবং এই ব্যাপারে শুধু যুধিষ্ঠির নন অর্জুনও বোধ করি তাঁর চেয়ে অনেক বেশী প্রশংসার দাবী করতে পারেন। উদাহরণ হিসাবে নেওয়া যাক, নিম্নলিখিত প্রসঙ্গটি: "কুন্তীনন্দনগণের অপমানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এমন ক্রুদ্ধ হইলেন, তাহাতে মনে হইল তিনি যেন সমস্ত প্রজা ধ্বংস করিয়া ফেলিবেন। অর্জুন তখন তাঁহাকে শান্ত করিলেন।" (৩) কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময়েও অন্তত দুইবার কৃষ্ণ ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হয়ে তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে গিয়ে সাক্ষাৎ যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে যান—তাঁকে নিবারণ করেন অর্জুন। স্থিতপ্রজ্ঞার উদাহরণ কোথায় পাওয়া যায়? যদি না অবশ্য ঠাণ্ডা মাথায় কুটিল চক্রান্তকারীকে স্থিতপ্রজ্ঞ আখ্যা দেওয়া যায়। বৃন্দাবনের কৃষ্ণ কামের ব্যাপারে কতটা সংযম দেখিয়েছিলেন সেই প্রসঙ্গ না হয় নাই টানলাম।

রাজশেখর বসু যাই বলুন কৃষ্ণ তাঁর অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতার ব্যবহার পদে পদেই করেছেন। তিন তিনবার তো তাঁকে বিশ্বরূপ দর্শনই করাতে হল—একবার কৌরব সভায় দৌত্য করার সময়ে, একবার কুরুক্ষেত্রের সমরপ্রাঙ্গণে অর্জুনকে, আরেকবার উতঙ্কমুনির শাপ থেকে আত্মরক্ষার জন্য। তাঁর আচরণে-ব্যবহারে তিনি যদি আদর্শ দেবতুল্য মানুষ হতেন তাহলে তাঁকে নিশ্চয়ই এইভাবে বিশ্বাস উৎপাদন করতে হত না? তাঁর সুদর্শন চক্রও তো একটি দিব্য-অস্ত্র। শিশুপালকে তিনি ক্ষত্রযুদ্ধে পরাজিত করেন নি। প্রতিপক্ষের প্রস্তুতি নেই, রণসজ্জা নেই, যুদ্ধের আরম্ভ ঘোষণা করা হয় নি, বলা নেই কওয়া নেই কোথা থেকে চক্রটি এসে প্রতিপক্ষের গলাটি কেটে দিয়ে চলে গেল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার ব্যবহার করেছিলেন জয়দ্রথ বধ করা সম্ভব করতে সূর্যকে কিছুকালের জন্য আবরণের অন্তরালে লুক্কায়িত করে। অর্জুনকেও তিনি কর্ণের তূণীরনির্গত বাণরূপী তক্ষকপুত্রের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন, পা দিয়ে চেপে অর্জুনের রথকে মাটিতে নিমজ্জিত করে। দুর্বাসার ক্রোধের হাত থেকে পাণ্ডবদের রক্ষা করতে দ্রৌপদীর দ্বারা আহূত কৃষ্ণ যে ভাবে এক কণা শাকান্নের সাহায্যে কয়েক সহস্র ব্রাহ্মণদের ভূরিভোজ করিয়েছিলেন সেও এক অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতার উদাহরণ। উত্তরার গর্ভ থেকে মৃতপুত্র প্রসব হওয়ার পর সেই মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার

কথা তো চূড়ান্ত অলৌকিকতার নিদর্শন। কুরুসভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের প্রচেষ্টায় দুঃশাসনকে ব্যর্থ করাও কৃষ্ণের অন্যতম দেবত্বের প্রমাণ হিসেবে কীর্তিত হয়ে এসেছে।

সংসারে অনেক লোক আছেন যাঁরা এই জাতীয় অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতার মধ্যে ঈশ্বরত্বের প্রমাণ পান। ভীষ্ম, পঞ্চপাণ্ডব ও অন্যান্য যাঁরা কৃষ্ণকে দেবতা বলে মেনে নিয়েছিলেন তাঁরা যে তাঁর অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতার প্রকাশের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন তার সপক্ষে অনেক সাক্ষ্য পাওয়া যায়। যেমন, "পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের দেবপূজিত অলৌকিক কর্মদ্বারা ইহা অনুমান করিলেন যে শ্রীকৃষ্ণের অবিজ্ঞাত কিছুই নাই এবং কোন কার্য্য নাই যাহা তিনি করিতে পারেন না।" (৪) তেমনি রাজসূয় যজ্ঞে শিশুপালের সঙ্গে বিতণ্ডার সময় ভীষ্ম কৃষ্ণের দেবত্ব প্রমাণের জন্য বলেন—"জন্ম হইতে ধীমান্ শ্রীকৃষ্ণ যে অলৌকিক কর্মসমূহ সম্পাদন করিয়াছেন, আমি তাহাও লোকমুখে বহুবার শুনিয়াছি।" (৫) কিন্তু সংসারে অন্য অনেক লোক আছেন যাঁরা এই সবের মধ্যে ঐশী ক্ষমতার প্রকাশ দেখেন না, দেখেন আর কিছুর। দুর্যোধন যুদ্ধের পূর্বে উলূককে দিয়ে পাণ্ডবদের যে বার্তা পাঠান তাতে কৃষ্ণ সম্বন্ধে বলেন—"মায়া, ইন্দ্রজাল ও ভয়ঙ্কর কুহক সংগ্রামে অস্ত্রধারী আমার কেবল ক্রোধ ও সিংহনাদই বাড়াইয়া দিবে।"(৬)

মায়া, ইন্দ্রজাল, কুহক। কৃষ্ণের অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতার বাস্তব ব্যাখ্যা এই তিনটি বাক্যের মধ্যেই ধৃত রয়েছে। এই ঘোর কলিকালেও তো ভারতবর্ষের আনাচে-কানাচে কত মন্ত্রসিদ্ধ ব্যক্তি রয়েছেন যাঁরা কত অদ্ভুত অদ্ভুত ক্ষমতার অধিকারী। কেউ রোগীর রোগ সারিয়ে দিচ্ছেন, কেউ বাতাসে হাত ঘুরিয়ে মণ্ডামিঠাই তৈরী করে অতিথিকে খেতে দিচ্ছেন, কেউ ভস্মকে সোনায় রূপান্তরিত করছেন—পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে এসব তো কিছুই না। তা ছাড়া মহাজাতি সদন ভাড়া করে যেসব যাদুকরেরা টিকিট বিক্রি করে খেলা দেখান তাঁদের তুলনাতেও কৃষ্ণের কীর্তিকলাপ এমন কিছু বেশী চমকপ্রদ নয়। বিশ্বরূপ দর্শন তো যে কোন হিপ্‌নোটিস্ট্‌ই দেখাতে পারেন। সূর্যকে কিয়ৎক্ষণের জন্য আবরণ করার জন্য নভোমণ্ডলের কোন ঘটনার কথা জ্যোতির্বিজ্ঞানের বা আবহাওয়াবিজ্ঞানের দ্বারা আগে থেকে জানা সম্ভব হতে পারে।

দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের ঘটনাটা একটু অন্যরকম। তাতে কৃষ্ণের কোন সাক্ষাৎ অংশ ছিল তা মনে করার কারণ নেই। সম্ভবত যা ঘটেছিল তা এই। দুঃশাসন যতই বদমায়েশ্ হোক নারীদেহকে বসনমুক্ত করার ব্যাপারে কৃষ্ণের পটুতার শতভাগের এক ভাগও সেই হতভাগার ছিল না। নারীবস্ত্ররহস্যে হাবুডুবু খেয়ে দুঃশাসনকে বোধ হয় নাজেহাল হতে হয়েছিল। এ জাতীয় ঘটনা তো আজকালও ঘটে। কোন নারীর উপর বলাৎকারের উপক্রম করে দুশ্‌মন ব্যক্তিকে বিফলমনোরথ হতে হল ঐ নারীবস্ত্রের জটিল রহস্যের দরুন—এরকম ঘটনা উপন্যাসে অন্নদাশঙ্কর একবার খুঁটিয়ে বর্ণনা করেছেন। গৌরকিশোর ঘোষের একটি সাম্প্রতিক গল্পেও তা পাওয়া যায়। আর এ যদি ঘটেও থাকে যে দুঃশাসনের আকর্ষণে একের পর এক নানান্ রঙ্-এর শাড়ীর পাহাড় জমে উঠল, তাও তো যেকোন মেলার যাদুকরের টুপির ভিতর থেকে একের পর এক নানা রঙ্-এর রুমাল বের করার চেয়ে চমকপ্রদ কিছু নয়।

কৃষ্ণ যে শুধু যাদু জানতেন, হিপ্‌নোটিজম্ জানতেন তাই নয়, তিনি তাঁর ব্যক্তিত্বের

দ্বারা উপস্থিত ব্যক্তিদের অসাধারণভাবে প্রভাবান্বিত করতে পারতেন! আধুনিক ভারতবর্ষে এমন অনেক গুরুর কথা শোনা যায় যাঁরা শিষ্যদের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করেন যে তাদের হিতাহিতজ্ঞান লোপ পায়, যে কোন ধরনের কাজই গুরুর কথায় তারা করতে পারে। এইভাবে সম্মোহিত শিষ্যদের কাছে ভগবান হয়ে গিয়েছেন এই ধরণের গুরু আধুনিক ভারতবর্ষেও ডজন ডজন পাওয়া যাবে। পাণ্ডবপক্ষ কৃষ্ণকে যে চোখে দেখতেন আর এই ধরণের শিষ্যরা এ জাতীয় গুরুদের যে চোখে দেখে তার মধ্যে কোন তফাৎ নেই। অন্য একটা তুলনার কথা মনে পড়ে। রাসপুটিন নামক একব্যক্তি রাশিয়ার সর্বশেষ জার (Tsar)-এর পরিবারের সকলের উপর সম্মোহন-জাল বিস্তার করে তাদের ক্রীড়নকের মত ব্যবহার করে যে ক্ষমতা অর্জন করেছিল তার কথা ইতিহাস-পাঠক জানেন।

এইবার দ্বিতীয় প্রশ্নে আসা যাক। কৃষ্ণ কখনও কখনও মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে পক্ষপাতশূন্যতা দাবী করেছেন। যেমন সঞ্জয়কে তিনি বলেন—"আমি যেরূপ পাণ্ডবগণের বিনাশ হইতে রক্ষা, তাঁহাদিগকে ঐশ্বর্য্যপ্রদান এবং তাঁহাদিগকে প্রিয় করিতে ইচ্ছা করি, সেইরূপ অনেক পুত্রবান রাজা ধৃতরাষ্ট্রেরও অভ্যুদয় কামনা করি।......আমার সর্ব্বদা এই অভিলাষ যে, উভয়পক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হউক। কুন্তীকুমারগণ! আপনারা কৌরবদিগের সহিত সন্ধি করুন এবং তাঁহাদের প্রতি শান্তভাব অবলম্বন করুন। এই কথা ব্যতীত আমি পাণ্ডবদিগের সমক্ষে অন্য কথা বলি না।"(৭) কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কৃষ্ণ খুব স্পষ্টভাবেই পাণ্ডবদের সম্পর্কে তাঁর পক্ষপাতিত্ব উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করেছেন। দুর্যোধনকে উদ্দেশ্য করে কৌরবসভায় প্রকাশ্যে তিনি বলেন—"যে পাণ্ডবগণকে দ্বেষ করে, সে আমাকেও দ্বেষ করে এবং যে তাহাদের অনুকূলে, সে আমারও অনুকূল। তুমি ধর্মাত্মা পাণ্ডবগণের সহিত আমাকে একাত্মারূপেই জানিও।"(৮) বলরাম একাধিকবার কৃষ্ণকে এই পক্ষপাতিত্ব-দোষে অভিযুক্ত করেছেন। তিনি নিজে পাণ্ডব ও কৌরব পক্ষের থেকে সমদূরত্ব রেখে চলেছিলেন। দুর্যোধনকে তিনি বলেন—"তোমার জন্য আমি শ্রীকৃষ্ণকে বাধ্য করিয়া বলিয়াছিলাম যে, আমাদের সহিত কৌরব ও পাণ্ডব উভয়পক্ষেরই সম্বন্ধ সমান। আমি এই কথা বারবার বলিয়াছি, কিন্তু তথাপি শ্রীকৃষ্ণকে বোঝাইতে পারি নাই।......অতএব আমি শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া মনে মনে স্থির করিয়াছি যে, আমি অর্জ্জুনেরও সহায়তা করিব না এবং দুর্যোধনেরও সহায়তা করিব না।"(৯) যুধিষ্ঠিরকে উদ্দেশ্য করে পরে তিনি বলেন—"আমি নির্জ্জনে শ্রীকৃষ্ণকে বারবার বলিয়াছি যে, মধুসূদন! তুমি নিজ সকল সম্বন্ধিগণের উপর সমান ব্যবহার কর; কারণ আমাদের নিকট যেরূপ পাণ্ডবগণ, সেইরূপ রাজা দুর্যোধনও। তাহারও তুমি সহায়তা কর। সে পুনঃপুনঃ তোমার নিকটে আসিতেছে। কিন্তু তোমাদের জন্যই মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ আমার কথা গ্রহণ করে নাই।" (১০)

পাণ্ডবেরা যে কৃষ্ণের দ্বারা পুত্তলিকাবৎ চালিত হয়েছিলেন তাও পাণ্ডবরাই নিজমুখে অসংখ্যবার স্বীকার করেছেন। যেমন নেওয়া যাক যুধিষ্ঠিরের এই স্তুতি: "তোমার কৃপাতেই আমরা রাজ্য পাইয়াছি, হে বীর! তোমার প্রসাদেই অতিশয় দুর্গম শূন্যস্থানও রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। তোমার কৃপাতেই আমরা রাজসিংহাসনে আসীন হইয়াছি। তুমিই পাণ্ডবগণের অন্তকালেও গতিস্বরূপ। আমরা পাণ্ডুকে জানি না, তুমি আমাদের মাতা, পিতা ও ইষ্টদেবতা। তুমি যাহা কর্তব্য মনে কর, তাহা আমাদের দ্বারা করাইয়া লও।

হে নিষ্পাপ! পাণ্ডবদিগের জন্য যাহা অভীষ্ট মনে হয়, আমাদিগকে তাহা আদেশ কর।"(১১) এই স্তুতিটি করা হয়েছে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আগে। যুদ্ধের পরে অর্জুন পাণ্ডবপক্ষের তরফ থেকে যেভাবে তাঁর স্তুতি করেছেন তার থেকে একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। অর্জুন বলেন—"তোমার কৃপায় রাজা যুধিষ্ঠির যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন, শত্রুসকল বিনাশ-প্রাপ্ত হইয়াছে এবং নিষ্কণ্টক রাজ্যলাভ করিয়াছেন। তোমার ন্যায় তরণীকে আশ্রয় করিয়া আমরা কৌরবসেনারূপ সাগর উত্তীর্ণ হইয়াছি।...তুমি শত্রুসৈন্যকে দগ্ধ করিয়াছ, তবেই আমি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছি। তুমি এমন উপায়সমূহ অবলম্বন করিয়াছ, যাহাতে আমার পক্ষে বিজয়লাভ সুলভ হইয়াছে। তুমি প্রেমপূর্ব্বক আমাকে যে কর্ম করিতে বলিবে, তাহা আমি অবশ্যই করিব, এ বিষয়ে কোন প্রকার বিচার করিব না।"(১২) শেষ বাক্যটি লক্ষণীয়। অর্জুন নিজমুখে বলেছেন, কৃষ্ণ তাকে যা করতে বলবেন তিনি তাই করবেন, বিচার করে দেখবেন না।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আগে থেকেই কি পরিমাণে যে লঘুগুরু সবরকমের বিষয়ে পাণ্ডবদের হয়ে সিদ্ধান্ত নিতেন কৃষ্ণ তা দেখে চমৎকৃত হতে হয়। ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যের উত্তরাধিকার পাণ্ডবদের উপর বর্তাবার কোন সঙ্গত কারণই খুঁজে পাওয়া যায় না। দুর্বলচিত্ত ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মের সঙ্গে পরামর্শ করে হঠাৎ যুধিষ্ঠিরকে ডেকে অভিষেকের কথা মুখ থেকে বার করতে না করতেই "কৃষ্ণ তাঁহাকে তাড়াতাড়ি অভিষেক করিবার জন্য প্রেরণা দিলেন।...মহর্ষি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দেশক্রমে বেদপরাগ ব্রাহ্মণগণ এবং মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজগণের সহিত সেই অভিষেক কার্য্য সম্পাদনা করিলেন।"(১৩) কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বীজ এইভাবে রোপণ করা হল—পাণ্ডবদের দাবীর সৃষ্টি করিয়ে। শুধু অভিষেক করিয়েই কৃষ্ণ ক্ষান্ত হলেন না। খাণ্ডবপ্রস্থে পুরী নির্মাণের সিদ্ধান্তও তাঁরই। বিশ্বকর্মাকে ডেকে তিনি বললেন—"তুমি কুরুরাজ যুধিষ্ঠিরের জন্য ইন্দ্রের দেওয়া নামানুযায়ী ইন্দ্রপ্রস্থ নামে নগর নির্ম্মাণ কর। উহা যেন ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় হয়।"(১৪) এরপর ময়দানব যুধিষ্ঠিরের জন্য যে পরম আশ্চর্য সভা নির্ম্মাণ করলেন তাও কৃষ্ণের আজ্ঞায়। "ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই আদেশ গ্রহণকরতঃ ময়াসুর অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিমিত্ত বিমানসদৃশ এক সুন্দর সভা নির্ম্মাণ করিতে মনস্থ করিলেন।"(১৫) রাজসূয়যজ্ঞ করার চিন্তা যুধিষ্ঠিরের নিজের মাথাতেই এসেছিল বটে, কিন্তু ইচ্ছাকে সংকল্প এবং সংকল্পকে কার্যে পরিণত করতে কৃষ্ণের ভূমিকা ছিল পরম গুরুত্বপূর্ণ। কৃষ্ণ এই উপলক্ষে পাণ্ডবদের সাহায্যে তাঁর চিরশত্রু জরাসন্ধকে অন্যায়যুদ্ধে বধ করিয়ে নিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির যে অশ্বমেধযজ্ঞ করেন তাও কৃষ্ণের অনুমতি নিয়ে এবং অনুমতি ভিক্ষা করেন এই ভাষায়ঃ "আমরা আপনারই প্রভাবে প্রাপ্ত এই পৃথিবীকে উপভোগ করিতেছি। আপনিই স্বীয় পরাক্রম ও বুদ্ধিবলে এই সমগ্র পৃথিবীকে জয় করিয়াছেন। আপনিই এই যজ্ঞের দীক্ষা গ্রহণ করুন।"(১৬) কৃষ্ণ পাণ্ডবদের এতই ঘনিষ্ঠ ছিলেন যে পাণ্ডবদের ত্রয়োদশ বৎসর বনবাসকালে দ্রৌপদীর পুত্রদের তিনি নিজগৃহে রেখে পালন করেছিলেন। বনবাসকালে দ্রৌপদীকে সত্যভামা বলেন—"অভিমন্যুর ন্যায় তোমার পুত্রগণ সকলেই দ্বারকায় আনন্দে অবস্থান করিতেছে। এবং দ্বারকা নগরী তাহাদের অত্যন্ত প্রিয়। সুভদ্রাও তোমার ন্যায় তাহাদের সকলকেই সর্ব্বপ্রকারে প্রসন্নচিত্তে পালন করিতেছেন। সুভদ্রা দেবী কাহারও উপর ভেদভাব না রাখিয়া, সকল পুত্রের উপর সমান স্নেহ বর্ষণ করত সকলের দুঃখে

সমান দুঃখ এবং সকলের সুখে সমান সুখ অনুভব করিতেছেন। প্রদ্যুম্নের জননী রুক্মিনী দেবীও তাহাদের সকলকে সর্বপ্রকারে পালন করিতেছেন। স্বয়ং কেশব ভানু প্রভৃতি নিজ পুত্রগণের চেয়েও ইহাদিগকে অধিক স্নেহের দ্বারা পালন করিতেছেন।" (১৭)

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের দায়িত্ব যে কৃষ্ণেরই সর্বাপেক্ষা অধিক তার সপক্ষে সাক্ষ্যপ্রমাণ মহাভারতে আগাগোড়াই ছড়ানো রয়েছে। কর্ণকে দল ভাঙিয়ে আনার চেষ্টায় কৃষ্ণ যখন তাঁর সঙ্গে সঙ্গোপনে কথাবার্তা বলেন তখন কর্ণ বলেছিলেন—"জনার্দন! বৃষ্ণিনন্দন! এখন দুর্যোধনের রাজত্বে এক অস্ত্রযজ্ঞ হইবে, যাহার উপদেষ্টা আপনিই হইবেন।" (১৮) কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর গান্ধারী এই ভাষায় কৃষ্ণকে দোষারোপ করেন: "পাণ্ডুপুত্র ও ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ পরস্পর সংগ্রাম করিয়া দগ্ধ হইয়া যাইল। তুমি ইহাদিগকে নষ্ট হইয়া যাইতে দেখিয়াও কেন উহা উপেক্ষা করিলে? তুমি অতিশয় শক্তিশালী পুরুষ। তোমার নিকট বহু সেবক এবং সৈন্যও ছিল। তুমি অসাধারণ বলে সুপ্রতিষ্ঠিত আছ। উভয় পক্ষকে নিজের মতে আনিবার সামর্থ্য তোমার মধ্যে ছিল। তুমি বেদাদি শাস্ত্রসমূহ ও মহাত্মাগণের বাক্য শুনিয়াছ এবং জান। এ-সমস্ত থাকিতেও তুমি স্বেচ্ছায় কুরুকুলের এই বিনাশকে উপেক্ষা করিয়াছ—অর্থাৎ জানিয়া শুনিয়াই তুমি এই বংশকে বিনষ্ট হইতে দিয়াছ।" (১৯) [খ] আর উতঙ্ক মুনি শ্রীকৃষ্ণকে অভিশাপ দিতে যান এই বলে—"কৌরবগণ আপনার সম্বন্ধী ও প্রিয়পাত্র ছিলেন। যেহেতু আপনার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আপনি তাঁহাদের রক্ষা করেন নাই, সেই হেতু আমি আপনাকে অভিশাপ দিব।...আপনার শক্তি থাকা সত্ত্বেও আপনি মিথ্যাচারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কুরুশ্রেষ্ঠগণ সপরিবারে নিহত হইলেন, আর আপনি তাহাদের উপেক্ষা করিলেন।" (২০)

যুদ্ধের কথা প্রথম ওঠে দ্রুপদের সভায়, যেখানে বিরাট, দ্রুপদ ও সাত্যকি প্রভৃতিরা সমাগত হয়েছিলেন। "ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের কার্যসিদ্ধির জন্য ঐ সব শ্রেষ্ঠ নরপতিবৃন্দকে একত্রে সংগঠিত করিয়াছিলেন।" (২১) কৃষ্ণ সেখানে যে ভাষণ দেন তাতে বলেন—"যদি এখনও ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ ইঁহাদের সহিত বিপরীত আচরণ করিতে থাকে—ইঁহাদের রাজ্য ফিরাইয়া না দেয় তবে এই পাণ্ডবগণ তাহাদের সকলকে বিনাশ করিবেন।"(২২) এবং এরপর বিরাট, দ্রুপদ ও যাদববংশীয় রাজন্যদের মধ্যে আলোচনা ও পরামর্শের পর "বন্ধুগণের সহিত রাজা বিরাট এবং মহারাজা দ্রুপদ মিলিত হইয়া সকল রাজার নিকট যুদ্ধের জন্য আমন্ত্রণলিপি পাঠাইলেন।" (২৩) এই পর্যায়ে পাণ্ডবদের সক্রিয় ভূমিকা প্রায় কিছুই নেই। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাক যে যুদ্ধে পাণ্ডব-পক্ষের সেনাপতির পদ অর্জুনকে দেওয়া হয় নি, হয়েছিল ধৃষ্টদুন্মকে। এই বিষয়টি আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণরূপে অর্থবহ বলে মনে হয়।

যুদ্ধের উদ্যোগ এইভাবে শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই কৌরবদের সম্বন্ধে কৃষ্ণ তার বৈরীভাব ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করে গেছেন। বনপর্বেই তিনি ঘোষণা করেন: "ইহারা চারিজন ইহাদের পদানুসরণকারী এবং ইহাদের সহায়ক রাজন্যবৃন্দ—ইহাদের সকলকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া আমরা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিব। যাহারা অধর্ম অবলম্বনে সুখ ভোগ করিতে চায়, তাহাদের বধ করাই সনাতন ধর্ম।" (২৪) একই কালে দ্রৌপদীকে তিনি আশ্বাস দেন: "যাহাদের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছ, তাহাদের পত্নীগণও স্বীয় পতিগণকে

যুদ্ধে অর্জুনের শরাঘাতে ভূমিতলে শয়ান ও নিহত দেখিয়া তোমার মতই ক্রন্দন করিবে। পাণ্ডবগণের হিতের জন্য আমার পক্ষে যাহা করা সম্ভব, তাহা সকলই আমি করিব।"(২৫) যুধিষ্ঠিরকে তিনি বলেন—"আপনি অনুচর ও সুহৃদবর্গের সহিত পাপীদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্যোধনকে ভৌমাসুর ও শাল্বের পথে প্রেরণ করুন। অথবা সভায় আপনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তাহা আপনি পালন করিতে থাকুন। এই যাদব যোদ্ধাগণই দুর্যোধনাদিকে বধ করিয়া আপনার জন্য হস্তিনাপুরে প্রতীক্ষা করিতে থাকুক।"(২৬) দেখা যাচ্ছে পাণ্ডবদের চেয়ে যাদবদেরই যেন বেশী আগ্রহ ছিল কৌরবদের বিনাশ করার ব্যাপারে। কৃষ্ণের প্ররোচনাতেই যে পাণ্ডবেরা যুদ্ধ করে রাজ্য দখল করার কথা ভাবতে শুরু করেন তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় নকুলের উক্তিতেঃ "আমরা যখন বনে বিচরণ করিতেছিলাম, তখন আমাদের রাজ্য বিষয়ে সেরূপ আকর্ষণ ছিল না, যেরূপ এইসময় হইয়াছে। বীর জনার্দন! আমরা বনবাস পূর্ণ করিয়া সমাগত হইয়াছি, এই কথা শুনিয়া আপনার কৃপায় সাত অক্ষৌহিণী সৈন্য এখানে সমবেত হইয়াছে।" (২৭)

পাণ্ডবপক্ষের হয়ে যে সাত অক্ষৌহিণী সৈন্য যুদ্ধ করেছিল তারা পাণ্ডবদের দ্বারা আহূত হয়ে আসে নি, তাদের পাণ্ডবপক্ষে যোগ দেওয়ার ব্যবস্থা পাণ্ডবদের বনবাসকালেই করে রাখা হয়েছিল। কৃষ্ণ সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে যে কুরুসভায় গিয়েছিলেন তার মধ্যে তাঁর শান্তি-কামনার কোন প্রমাণই মেলে না। তা ছিল নিতান্তই এক রাজনৈতিক কূটচাল। তিনি নিজমুখেই বলেন—"ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধন কিরূপ পাপাচারী, তাহা আমি জানি। তথাপি সেখানে যাইয়া সন্ধির জন্য চেষ্টা করিলে আমরা সকলে সমগ্র জগতের রাজগণের দৃষ্টিতে নিন্দার পাত্র হইব না।" (২৮) রওনা হওয়ার আগে তিনি দ্রৌপদীকে এই বলে আশ্বাস দেনঃ "তুমি অশ্রুবর্ষণ বন্ধ কর। আমি তোমাকে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, তুমি শীঘ্রই দেখিতে পাইবে—সমগ্র শত্রু নিহত হইয়াছে এবং তোমার পতিরা রাজলক্ষ্মীসম্পন্ন হইয়াছেন।"(২৯)। ভীমকে তিনি বলেন—"তুমি যেন ইহা মনে করিও না যে, আমি যুদ্ধ হইতে দিতে ইচ্ছুক নহি।"(৩০) পাণ্ডবদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী মারমুখী ছিলেন এই ভীম। সেই ভীমও আগে যতই আস্ফালন করে থাকুন, পাণ্ডবদের না চাওয়া সত্ত্বেও দ্রুপদ, বিরাট ও কৃষ্ণের প্রচেষ্টায় যখন সৈন্যসমাবেশ হতে শুরু করে দেয় এবং যুদ্ধ প্রায় অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে, তখন নিম্নলিখিতভাবে কৃষ্ণের কাছে তিনি শান্তির ইচ্ছা প্রকাশ করেন: "বরং আমরা সকলে নিম্নে পাদসঞ্চালনে যাইয়া অত্যন্ত নম্রতা সহকারে দুর্যোধনের অনুসরণ করিব, তথাপি আমাদের জন্য যেন ভরতবংশীয়গণের নাশ না হয়। কৌরবগণের সহিত আমাদের যাহাতে উদাসীনভাব অর্থাৎ সংস্রবশূন্যের ন্যায় ভাবব্যবহার বিদ্যমান থাকে, আপনি সেইরূপ প্রযত্ন করিবেন। কোন প্রকারেই কৌরবগণকে যেন অন্যায় স্পর্শ না করে। আপনি সেখানে বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম ও অন্যান্য সভাসদ্‌গণকে এইরূপ করিবার জন্যই বলিবেন, যাহাতে সকল ভ্রাতৃগণের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্যভাব প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং দুর্যোধনও শান্ত হইয়া যায়।" (৩১) ভীম যে শুধু নিজের কথাই বলছিলেন না যুধিষ্ঠির ও অর্জুনের কথাও বলছিলেন, তার প্রমাণ ভীমের এই উক্তিতেঃ "আমি এইরূপ শান্তিস্থাপনের জন্য বলিতেছি, রাজা যুধিষ্ঠিরও শান্তিরই প্রশংসা করেন অর্জুনও যুদ্ধ করিতে অভিলাষী নয়; কারণ, অর্জুনের মধ্যে অধিক দয়া বিদ্যমান আছে।" (৩২) যুধিষ্ঠির অনেকবার অনেক

অবস্থাতেই যুদ্ধে অনুৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন। আর অর্জুন তো রণপ্রাঙ্গণে দাঁড়িয়েও জ্ঞাতি-বিনাশের সম্ভাবনায় কাতর ও বিমর্শ হয়ে পড়েছিলেন। এ'দের প্রত্যেককেই পুনরায় উৎসাহিত ও উজ্জীবিত করে তুলেছিলেন কৃষ্ণ। ভীমকে কি ধরনের কথার চাবুক মেরে তিনি ক্ষিপ্ত করে তুলেছিলেন তা পড়লে লোমহর্ষণ হয়। "অহো! যুদ্ধের সময় উপস্থিত হইলে প্রথমে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণের বুদ্ধি এইরূপ হইয়া যায় যে, তাহারা তখন বিপরীত চিন্তা করিতে থাকে। ভীমসেন! মনে হইতেছে—এজন্য তোমারও মধ্যে ভয় উপস্থিত হইয়াছে।...মনে হইতেছে—তোমার হৃদয় কাঁপিতেছে, মন শিথিল হইয়া পড়িতেছে এবং তোমার উরু স্তব্ধ হইয়া যাইতেছে, সেজন্য তুমি শান্তির ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছ।" (৩৩)

কৃষ্ণ যে পাণ্ডবদের সম্পূর্ণভাবে নিজকক্ষপুটে স্থাপন করে তাদেরকে দিয়ে যথেচ্ছ কাজ করিয়েছিলেন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যে তিনিই সংঘটিত করিয়েছিলেন এবং এসবই করিয়েছিলেন পাণ্ডবদের স্বার্থে এই বক্তব্যের সমর্থনে এতক্ষণ যুক্তি ও প্রমাণ দেওয়া গেল। এইবার প্রশ্ন ওঠে, কেন তাঁর এই পক্ষপাত? কি কারণে তাঁর এই প্রবল প্রচেষ্টা যেন তেন প্রকারেন পাণ্ডবদের স্বার্থসাধন করার? এর কোন ব্যাখ্যা মহাভারতে দেওয়া নেই। কৃষ্ণ পাণ্ডবদের আত্মীয় ছিলেন, কুন্তী ছিলেন তাঁর পিতৃস্বসা—এই ব্যাখ্যাকে গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে না। কৌরব ও পাণ্ডবরাও তো খুড়তুতো জেঠতুতো ভাই। জ্ঞাতিশত্রুতাই তো মহাভারতের উপাখ্যানের মূলসুত্র।

পাণ্ডবদের সাহায্য করার বিনিময়ে কৃষ্ণ অবশ্য নিজেরও কিছু স্বার্থ সাধন করিয়ে নিয়েছিলেন—যেমন জরাসন্ধ-বধ। জরাসন্ধ ও কৃষ্ণের মধ্যে ছিল পুরাতন শত্রুতা। "শ্রীকৃষ্ণ কংসকে যুদ্ধে হত্যা করিয়াছিলেন শুনিয়া রাজা জরাসন্ধ তখন কংসপুত্রকে শূরসেন দেশের রাজা করিয়াছিলেন। তিনি মহৎ সৈন্য উত্থাপন করিয়া বাসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে পরাস্ত করিয়া তথায় নিজ পুত্রীর পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। প্রতাপশালী জরাসন্ধ মহাবল-সমন্বিত হইয়া তথায় উগ্রসেন ও বৃষ্ণিবংশোদ্ভব ব্যক্তিগণকে কষ্টদান করিতেন। জরাসন্ধ ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে শত্রুতার ইহাই কারণ।" (৩৪) কৃষ্ণ নিজে যুধিষ্ঠিরকে বলেন—"যদি আমরা শত্রুসংহারক মহাস্ত্রের দ্বারা নিরন্তর আঘাত করিতে থাকি, তথাপি তিনশত বৎসরেও তাহার সৈন্য বধ করিতে পারিব না।" (৩৫) ভীমকে দিয়ে অধর্মযুদ্ধে জরাসন্ধকে নিধন করানোর পূর্বে "ভগবান মধুসূদন দিব্যদৃষ্টিদ্বারা স্মরণ করিয়া ইহা জানিতে পারিলেন যে, শার্দ্দূল-সমবিক্রম, ভীমপরাক্রম, বলিশ্রেষ্ঠ সেই রাজা জরাসন্ধকে যদুবংশীয়গণ যুদ্ধে বধ করিতে পারিবে না।" (৩৬) জরাসন্ধ এবং অন্যান্য শত্রুদের নিধন করার জন্য সাহায্যের প্রয়োজন কৃষ্ণের ছিল ঠিকই, কিন্তু সে সাহায্য তিনি পাণ্ডবদের থেকে না নিয়ে কৌরবদের থেকেও নিতে পারতেন। গদাযুদ্ধে দুর্যোধন ও ভীম সমতুল্যই ছিলেন; অন্যান্য অস্ত্রযুদ্ধে কর্ণ অর্জুনের সমকক্ষ তো ছিলেনই, অর্জুনের চেয়েও তিনি অধিকতর পরাক্রমশালী ছিলেন এমন আভাসও মহাভারতে পাওয়া যায়। সুতরাং নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য কৃষ্ণকে পাণ্ডবদের বেছে নিতে হয়েছিল—এই যুক্তি টেঁকে না।

দীর্ঘকালীন পরিচয়ের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সাধারণ বন্ধুত্ব বলে একটা জিনিস আছে বৈকি। কিন্তু কৃষ্ণ ও পাণ্ডবদের মধ্যে এই সখ্যতা ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল বলে তো

দেখান হয় নি। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর-সভার পূর্বে পাণ্ডবদের সঙ্গে কৃষ্ণের কোন যোগাযোগের উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। ঐ প্রথম সাক্ষাতের পর থেকেই অতি দ্রুতগতিতে কৃষ্ণ নিজেকে পাণ্ডবদের পরামর্শদাতা ও রক্ষকের ভূমিকায় অপরিহার্য করে তোলেন।

কৃষ্ণের এই অকস্মাৎ-প্রকাশিত অগাধ পাণ্ডবপ্রীতি একটি রহস্য বৈকি। এই রহস্য ব্যাখ্যার দুটি সূত্র মহাভারতে পাওয়া যায়। এদের একটি অলৌকিক এবং তাকে মোটামুটি স্পষ্টভাবেই রাখা হয়েছে। যেমন এই উক্তিতে—"এই শ্রীকৃষ্ণ হইলেন নারায়ণ এবং অর্জুন নর—ইহাই জগতে কথিত আছে। "নারায়ণ ও নর উভয়ের একই সত্তা, পরন্তু লোকহিতের জন্য ইঁহারা দুই শরীর ধারণ করিয়া প্রকটিত হইয়াছেন।" (৩৭) আরও অনেক জায়গায় কৃষ্ণার্জুনের এই অলৌকিক সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। এই ব্যাখ্যাটি ছাড়া অন্য যে ব্যাখ্যাটি স্পষ্টভাবে কোথাও রাখা হয়নি, আভাসিত করা হয়েছে মাত্র, তা নিতান্তই লৌকিক এবং তার কেন্দ্রবিন্দুতে আছেন দ্রৌপদী।

২

মহাভারতের নায়ক যদি হয়ে থাকেন কৃষ্ণ তো নায়িকা নিঃসন্দেহে দ্রৌপদী। ফরাসীতে একটি কথা আছে—cherchez la femme। কোন রহস্যের যদি কিনারা করা যাচ্ছে না তো সন্ধান করে দেখো, নারী কে আছে কেন্দ্রবিন্দুতে। হেলেন না হলে ট্রয়ের যুদ্ধ হত না। সীতা না হলে লঙ্কাকাণ্ড ঘটত না। দ্রৌপদী না হলে কুরুবংশও বিনষ্ট হত না [গ]। শুধু এই জন্য নয় যে দুঃশাসন-দুর্যোধনের দ্বারা নিগৃহীত দ্রৌপদী রক্তের শোধ নেওয়ার প্রতিজ্ঞায় অটল থেকেছিলেন। সর্বপ্রধান কারণ এই যে দ্রৌপদীর জন্যই কৃষ্ণের পাণ্ডবদের সম্পর্কে অত পক্ষপাতিত্ব।

কৃষ্ণ ও দ্রৌপদীর মধ্যে এমন এক সখ্যভাব ছিল যা প্রাচীন সাহিত্যে তুলনারহিত। দ্রৌপদী ও কৃষ্ণের মধ্যে সম্পর্ক কি জাতীয় ছিল তা বুঝতে দ্রৌপদী বিভিন্ন স্থানে কি ধরণের কথা বলেছেন এবং কৃষ্ণের সমক্ষে কি প্রকার আচরণ করেছেন তার কয়েকটি উদাহরণকে পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন। কৌরবসভায় নিগৃহীত হওয়ার সময় তিনি নিজেকে "পাণ্ডবগণের ভার্যা ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী এবং বাসুদেবের সখী" (৩৮) এই বলে বর্ণনা করেন। উদ্যোগপর্বে তিনি নিজেকে "আমি বীর ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী ও আপনার প্রিয় সখী"(৩৯) বলে বর্ণনা করেন। বনপর্বে কৃষ্ণের কাছে কৌরবসভায় নিগৃহীত হওয়ার বিষয়ে নালিশ করার সময়ও তিনি নিজেকে "ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী, পাণ্ডবগণের পত্নী এবং তোমার সখী"(৪০) বলে বর্ণনা করেন। ঐ একই অবস্থায় তিনি তাঁর পঞ্চপতির চূড়ান্ত নিন্দা করে এইভাবে অভিমান প্রকাশ করেন—"আমার পতিও নাই, বান্ধবও নাই এবং ভ্রাতাও নাই। হে মধুসূদন! তুমিও আমার নও।" (৪১) তিনি আরও বলেন—"যেহেতু তোমার সহিত আমার আত্মীয়তা আছে, যেহেতু আমার যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন হওয়ার গৌরব আছে, যেহেতু আমি তোমার চিরসখী এবং যেহেতু তুমি আমাকে রক্ষা করিতে সমর্থ—কেশব! সেইহেতু সম্পর্ক, গুরুত্ব, সখিত্ব ও প্রভুত্ব এই চারিটি কারণে আমি তোমা-

কর্তৃক রক্ষিতা হওয়ার যোগ্যা।" (৪২) এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়—তাঁদের মধ্যে যে একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল অর্থাৎ দ্রৌপদী ছিলেন কৃষ্ণের পিসতুতো ভায়েদের স্ত্রী, সেইটুকুর অবলম্বন ছাড়াই তাঁদের দুজনের মধ্যে একটা সখ্যসম্পর্ক ছিল তা এখানে স্পষ্টভাবে দাবী করা হচ্ছে। এও লক্ষণীয় যে দ্রৌপদী নিজেকে শুধু সখীই বলছেন না, কখনও "প্রিয়সখী", কখনও "চিরসখী" বলছেন। সখ্যভাবও অনেক রকমের হতে পারে। বেশ কয়েক জায়গায় এই ভাবটি যে প্রণয়ের ভাব তাও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। যেমন—এই একই সময়ে একই প্রসঙ্গে দ্রৌপদী কৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন—"সা তেহহং দুঃখমাখ্যাস্যে প্রণয়ান্মধুসূদন।" (আমি যে ভাষ্যটি ব্যবহার করেছি—আর্যশাস্ত্র প্রকাশিত শ্রীভূতেশচন্দ্র তর্ক-স্মৃতিতীর্থকৃত—তাতে সংস্কৃতের 'প্রণয়'কে 'স্নেহ' বলে অনূদিত করা হয়েছে, সেইজন্য সংস্কৃতেই উদ্ধৃতিটি দিলাম। রাজশেখর বসুও তাঁর অনুবাদে 'প্রণয়বশে' কথাটি ব্যবহার করেছেন)। অশ্বমেধপর্বে কোন এক বিশেষ অবস্থায় যখন যুধিষ্ঠির ও অর্জুন কৃষ্ণের বিষয়ে আলোচনা করছিলেন তখন দ্রৌপদী ও কৃষ্ণের মধ্যে ব্যবহারের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে সে তো আরও সাংঘাতিক: "সেই সময় দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দিকে তির্য্যকভাবে ঈর্ষাপূর্বক দৃষ্টিপাত করিলেন। কেশিহন্তা শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীর এই প্রেমপূর্ণ উপালম্ভ সানন্দে গ্রহণ করিলেন। কারণ তাঁহার দৃষ্টিতে সখা অর্জুনের মিত্র ভগবান্ হৃষীকেশ সাক্ষাৎ অর্জুনেরই সমান ছিলেন।" (৪৩) এখানে শুধু যে অনুবাদে 'প্রেম' এবং সংস্কৃতে 'প্রণয়' কথাটি ব্যবহার হয়েছে তাই নয়, পরিষ্কার বলা হচ্ছে দ্রৌপদী কৃষ্ণ ও অর্জুনকে একই চোখে দেখতেন। ভুলে না যাই, পঞ্চপতির মধ্যে একমাত্র অর্জুন সম্বন্ধে দ্রৌপদীর কিছুমাত্র প্রেমভাব ছিল।

কৃষ্ণ ও দ্রৌপদীর মধ্যে সম্পর্কটা প্রেমের সম্পর্ক ছিল, ঘটনা শুধু এইটুকু হলে তাকে তুলনারহিত বলার কিছু থাকত না। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে পরপুরুষ ও পরনারীর সঙ্গে প্রেম তো আকছারই ঘটেছে, তাতে নূতনত্ব কি? দ্রৌপদী ও কৃষ্ণের প্রেম এই কারণে অতুলনীয় যে প্রাচীন সাহিত্যে আর কোন প্রেমের উদাহরণই পাওয়া যায় না যা ছিল সম্পূর্ণ নিষ্কাম। দ্রৌপদী ও কৃষ্ণের প্রেমের মধ্যে কামের গন্ধটুকুও ছিল না। এই কথাটা জোর করে বলা যায় এই কারণে যে কামের ব্যাপারে মহাভারতকার বা অন্যান্য প্রাচীন কবিদের বিশেষ কোন রাখঢাকের ব্যাপার ছিল না। পরদারগমন ও পরপুরুষগমনের উল্লেখও তো একেবারে ভূরি ভূরি। দ্রৌপদী ও কৃষ্ণের মধ্যে কাম ঘটিত সম্পর্ক থাকলে মহাভারতকারের তা লুকিয়ে রাখার কোন প্রয়োজনই ছিল না, যে রকম প্রয়োজন বিশে শতাব্দীর ভারতীয় জীবনীকার ও আত্মজীবনীকারদের হয়ে থাকে।

কৃষ্ণ ও দ্রৌপদীর এই কামহীন প্রেমের সম্পর্ক কতদিনের? দ্রৌপদী পঞ্চপাণ্ডবদের ঘরে বধূ হয়ে আসার পর এই সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল মনে করার পক্ষে কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। বরং নানান রকম সাক্ষ্য থেকে এই অনুমান করা যায় যে তাঁদের এই সম্পর্কের উৎপত্তি দ্রৌপদীর কুমারী অবস্থায় বা তাঁর বাল্যাবস্থায় ঘটেছিল।

এই অনুমানের সপক্ষে যে যুক্তি ও সাক্ষ্যপ্রমাণ দেওয়া যায় তারা নিম্নলিখিত প্রকারের। পাণ্ডবদের ইতিবৃত্তে কৃষ্ণের প্রথম আবির্ভাব যে দ্রৌপদীর স্বয়ংবর-সভায় সেখানে কৃষ্ণের অদ্ভুত আচরণ আমাদের অনুমানের প্রথম ভিত্তি। "বৃষ্ণিপ্রবর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলরামের

হাতকে নিজ হাতে পেষণ করিয়া অতীব হর্ষপ্রকাশ করিতে লাগিলেন।" (৪৪) দ্রৌপদী কর্ণ বা অন্য কোন বীরের হস্তগত না হয়ে অর্জুনের হস্তগত হওয়াতে কৃষ্ণের এই হর্ষের কারণ কি হতে পারে? কৃষ্ণ ও দ্রৌপদীর মধ্যে নিভৃতে কথোপকথনের যে অগণিত উল্লেখ পাওয়া যায় তা আমাদের অনুমানের দ্বিতীয় ভিত্তি। কৃষ্ণ পাণ্ডবদের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন এমন একটা ঘটনাও মনে পড়ে না যখন না তিনি স্বতন্ত্রভাবে এবং প্রায়শই নিভৃতে দ্রৌপদীর সঙ্গে দেখা করেছেন ও কথাবার্তা বলেছেন। পাণ্ডব বা কৌরবদের পরিবারভুক্ত অন্য কোন নারীকেই কোথাও পরপুরুষের সঙ্গে এত সহজভাবে দেখাসাক্ষাৎ করতে ও কথাবার্তা বলতে দেখা যায় না। পতির মামাতো ভাই এই সম্বন্ধটুকু তৎকালীন সামাজিক প্রথা অনুসারে এতদূর ঘনিষ্ঠতা ও অন্তরঙ্গতার ভিত্তি হতে পারে না। দ্রৌপদীও যে সাধারণভাবে পর্দা মেনে চলতেন না তেমন কোন ইঙ্গিত কোথাও পাওয়া যায় না। কৌরবসভায় নিগৃহীত হওয়ার সময় দ্রৌপদী বিলাপ করে বলেন—"যে আমাকে স্বয়ংবর-সভায় সমাগত রাজগণই দর্শন করিয়াছিলেন এবং তাহার পূর্বে যে আমাকে অন্যত্র কেহই দর্শন করেন নাই…যে আমাকে বায়ু এবং সূর্যও রাজভবনে দর্শন করিতে পারে নাই" ইত্যাদি। (৪৫) অর্থাৎ তিনি ছিলেন অসূর্যম্পশ্যা, অন্য সব কুলনারীদের মতই। এই অসূর্যম্পশ্যা রমণী কৃষ্ণের সঙ্গে কত সহজে কত খোলামেলাভাবে আচরণ করতেন তার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। অনেক দৃশ্যের মধ্যে নিম্নলিখিত নাটকীয় দৃশ্যটিকে স্মরণ করা যাকঃ "এইরূপ বলিয়া সুন্দরাঙ্গী, শ্যামনয়না ও পদ্মাক্ষী ও গজতুল্য মৃদুগামিনী দ্রুপদরাজকন্যা কৃষ্ণ নিজের সেই কেশগুচ্ছ, যাহা দেখিতে অতীব সুন্দর, ঈষদ্‌বক্র, অত্যন্ত কাল, একত্রে আবদ্ধ হইলেও কোমল, নানাবিধ সুগন্ধে সুবাসিত, সর্বপ্রকার শুভলক্ষণে সুসম্পন্ন এবং বিশাল সর্পের ন্যায় কান্তিমান্ ছিল, স্বীয় বাম হস্তে ধরিয়া কমললোচন শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিলেন এবং অশ্রুপূর্ণ নয়নে এই কথা বলিলেন, "হে কমললোচন কৃষ্ণ! শত্রুগণের সহিত সন্ধিস্থাপনের ইচ্ছায় আপনি যাহা যাহা করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন, সেইসব কার্যমধ্যে দুঃশাসনের হস্তে আকর্ষিত হইবার সময় উন্মোচিত এই কেশগুচ্ছের কথা স্মরণ রাখিবেন। হে কৃষ্ণ! যদি ভীমসেন ও অর্জুন কাতর হইয়া কৌরবগণের সহিত সন্ধিস্থাপনের ইচ্ছা করেন, তবে আমার বৃদ্ধ পিতা নিজ মহারথী পুত্রগণের সহিত যুদ্ধ করিবেন।" (৪৬) দেখা যাচ্ছে কৃষ্ণের সঙ্গে কথাবার্তা বলার ব্যাপারে বা কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারে দ্রৌপদী কোন পর্দার বালাই রাখতেন না। সর্পের মত কেশগুচ্ছ হাতে নিয়ে তিনি যখন উপরের বর্ণনা অনুযায়ী কৃষ্ণের কাছে গিয়ে কথা বলেন তখন নিশ্চয় কোন আবরণের ব্যবধান রাখেন নি।

কৃষ্ণ ও দ্রৌপদীর মধ্যে বাল্যকাল অবধি এক সখ্য-সম্পর্ক ছিল এই অনুমানটিকে মেনে নিলে তবেই এই সহজ খোলামেলা ব্যবহারের যেমন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, দ্রৌপদী কিভাবে কৃষ্ণের 'চিরসখী' হলেন তারও একটা মর্মার্থ পাওয়া যায়। বোধগম্য হয় কেন এবং কিভাবে পঞ্চপাণ্ডবদের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিবাহের পর অতি অল্পকালের মধ্যেই কৃষ্ণ পাণ্ডবদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। কেন তিনি পাণ্ডবদের রাজ্য পাইয়ে দেওয়ার জন্য এত পরিশ্রম ও অধর্ম করেন। সবই দ্রৌপদীর জন্য। দ্রৌপদী শুধু তাঁর পঞ্চপতিকেই ক্রমাগত কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য উত্তেজিত করে যান নি, কৃষ্ণকেও যখনই সুযোগ পেয়েছেন তখনই প্ররোচিত করেছেন।

আমাদের অনুমানের তৃতীয় ভিত্তি দ্রৌপদীর রূপ। তাঁর রূপ বর্ণনাকালে বলা হয়েছে

তিনি ছিলেন "কৃষ্ণা নহেন, অতি গৌরবর্ণাও নহেন", এবং "তাম্রবদনা।"(৪৭) রাজশেখর বসু লিখেছেন : "তিনি অতিরূপবতী, কিন্তু শ্যামাঙ্গী, সেজন্য তাঁহার নাম কৃষ্ণা।" কৃষ্ণের নামের সঙ্গে তাঁর গাত্রবর্ণের কোন সম্পর্ক থাকুক বা নাই থাকুক তিনি যে জলধরকান্তি ছিলেন তার অসংখ্য উল্লেখ, অসংখ্য উপমা-সহকারে কৃষ্ণসংক্রান্ত অধিকাংশ সাহিত্যেই পাওয়া যায় (যদিও খুবই কৌতূহলের বিষয়, তাঁর গাত্রবর্ণের উল্লেখ মহাভারতে খুবই কম পাওয়া যায়)। সেই সময়কার মর্যাদাসম্পন্ন বংশগুলির স্ত্রী-পুরুষেরা গৌরকান্তি ছিলেন (ইচ্ছা করেই ভাষাভিত্তিক তথাকথিত 'আর্যজাতি'র কথাটা এড়িয়ে যাচ্ছি)। কৃষ্ণ বা শ্যামল গাত্রবর্ণ সামাজিক মর্যাদায় অন্তেবাসী অপ্রধান বংশ সূচিত করে, এই অনুমান অসঙ্গত নয়। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণা উভয় সম্পর্কেই অনুমান করা যেতে পারে যে তাঁরা এই প্রকার অপেক্ষাকৃত হীন মর্যাদাসম্পন্ন বংশোদ্ভূত ছিলেন। এবং এই বংশগত নৈকট্যের কারণে তাদের মধ্যে কোন যোগ ছিল।

দ্রৌপদীর কুলপরিচয় সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। তিনি দ্রুপদের কন্যা ছিলেন না। বলা হয়েছে তিনি যজ্ঞবেদী থেকে উদ্ভূত হয়েছিলেন, যার থেকে শুধু এইটুকু অনুমান করা যায় যে কানীন, জারজ বা অন্য কোন প্রকারের সন্তান হওয়ার কারণে তিনি তাঁর পিতা-মাতার দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছিলেন। তিনি যে এককালে পাঁচপাঁচটি পুরুষকে বিবাহ করতে সম্মত হয়েছিলেন তার মধ্যেও এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে তাঁর শরীরে এমন কোন বংশের রক্ত ছিল যে বংশের লোকেদের পক্ষে এক নারীর একাধিক পতি চিন্তার অতীত ছিল না। মহিলাটি সাংঘাতিক তেজঃস্বিনী ছিলেন। তাঁর নিজের সায় না থাকলে তাঁর পিতার কথাতে বা কোন ব্যসদেবের কথাতেই পাঁচ পাঁচটি পুরুষকে বিয়ে করার মত এমন একটা সৃষ্টিছাড়া কাজ তাঁকে দিয়ে কেউ করাতে পারত না।

কৃষ্ণও যে সামাজিক মর্যাদায় হীন কোন বংশের থেকে উদ্ভূত এই অনুমানের সমর্থনে শুধু তাঁর গাত্রবর্ণই না, যদুবংশীয়দের আচরণ আগাগোড়াই সাক্ষ্য বহন করে। বৃন্দাবনের নারীরা কৃষ্ণের সঙ্গে যে প্রকার যৌন যথেচ্ছাচার করেছিলেন, কৃষ্ণ তাঁদের সঙ্গে যত তথাকথিত লীলারঙ্গ করেছিলেন, তা সবই তৎকালীন শ্রেষ্ঠ মর্যাদাপূর্ণ বংশদের থেকে বহু নীচে অবস্থিত এবং তৎকালীন আদর্শের বিচারে কদাচারে লিপ্ত জনগোষ্ঠীদের পরিচায়ক। দুগ্ধব্যবসায়ী গোপীরা তো সমাজের নিম্নস্তরে অবস্থিত বটেই ! কিন্তু তাদের মধ্যে স্থাপিত কৃষ্ণ ও বলরামের যে বংশ সেই বংশের স্ত্রী-পুরুষদের ব্যাভিচারের অন্য অনেক উল্লেখই মহাভারতে পাওয়া যায়। মৃত্যুমুখী ভূরিশ্রবা অর্জুনকে বলেন : "বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশের লোকেরা ত' সংস্কারহীন, হিংসাপ্রধান কর্মকারী এবং স্বভাবতই নিন্দিত।"(৪৮) এই কুৎসার সমর্থন পাওয়া যায় যদুবংশ ধ্বংসের ঘটনা ও তার অব্যবহিত পূর্বকালীন ঘটনাবলীর মধ্যে। যদুবংশীয়রা মদ্যপান অতিরিক্ত মাত্রায় করতেন। মদ্যপান অবশ্য সে যুগে খুবই সাধারণ ছিল। কিন্তু যদুবংশীয়রা শুধু মদ্যপানই করতেন না। সেই ধরণের মিলিত উন্মাদনা ও উন্মত্ততায় রত হতেন যাকে ইংরেজীতে বলে Orgy—বাংলায় যাকে যৌথ বেলেল্লাপনা ছাড়া আর কোনভাবে প্রকাশ করতে পারছিনা। উদাহরণ হিসাবে নেওয়া যাক একটি তথাকথিত উৎসবের বিবরণ। "মুনিগণের দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া রৈবতক পর্বত অত্যন্ত দর্শনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। পর্ব্বতরাজের শিখরে হর্ষোন্নত স্ত্রী-পুরুষগণের সুমধুর শব্দ যেন গগন স্পর্শ

করিয়াছিল। ক্রীড়া প্রভৃতিতে আসক্ত, সুরাদির দ্বারা মত্ত এবং হৃষ্টচিত্ত মনুষ্যগণের সিংহনাদ, কোলাহল এবং কিলকিলা শব্দে সেই পর্ব্বত মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছিল। নানাস্থানে বহু দোকান ও বাজার বসিয়াছিল, ভক্ষ্য ও ভোজ্য পদার্থ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ছিল, বিহারেরও যথেষ্ট ব্যবস্থা ছিল, বস্ত্র ও মাল্য সমূহের দ্বারা শোভিত ছিল, বীণা, বেণু ও মৃদঙ্গ বাজিতেছিল। এইভাবে পর্ব্বতটি অত্যন্ত রমণীয় হইয়া উঠিয়াছিল। দীন, অন্ধ ও অনাথগণের জন্য নিরন্তর সুরা ও মৈরেয় মিশ্রিত ভক্ষ্য ও ভোজ্য পদার্থ বিতরণ করা হইতেছিল। তখন মহাগিরির মহোৎসব পরম মঙ্গলজনকরূপে প্রতীয়মান হইতেছিল। পুণ্যানুষ্ঠানের জন্য বহু গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল যাহাতে পুণ্যাত্মাগণ বাস করিতেছিলেন। রৈবতক পর্ব্বত এই উৎসবে বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণের বিহারস্থলরূপে পরিণত হইয়াছিল। সেই গিরিপ্রদেশ নানাগৃহ পরিপূর্ণ হইয়া দেবলোকের ন্যায় শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল।"(৪৯) এই জাতীয় orgy-র উদাহরণ মহাভারতে আর একটি পাওয়া যায় যেখানে অর্জুনও যোগ দিয়েছিলেন বটে কিন্তু নিতান্তই যদুবংশীয়দের দলে পড়ে এবং যে দলে পুরুষদের সঙ্গে নারীরাও ছিলেন এবং বিশেষভাবে লক্ষণীয় দ্রৌপদীও ছিলেন। আরও লক্ষণীয় যে বুদ্ধদেব বসুর (৫০) ব্যাখ্যা-অনুসারে মূল সংস্কৃতে 'মদ' কথাটি যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তাতে যদি মনে করা হয় যে অন্যান্য নারীদের সঙ্গে দ্রৌপদী ও সুভদ্রাও শুধু যৌবন-মদেই মত্ত হন নি সুরাপানজনিত উন্মত্ততাও তাঁদের হয়েছিল তো ভুল হবে না। ঘটনাটি ঘটে দ্রৌপদীর বিবাহের অল্পদিনের মধ্যে। বর্ণনাটি এইপ্রকার: "নানাবৃক্ষে পরিপূর্ণ, ছোটবড় গৃহসমূহে সুশোভিত, ভক্ষ্য, ভোজ্য, পেয় ও রসাল বস্তুসমূহে সমাকীর্ণ, মহামূল্য মাল্য ও গন্ধদ্রব্যে পরিপূর্ণ, পুরন্দরপুরসদৃশ সেই উত্তম বিহারদেশে পার্থ ও শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হইলে, সহযাত্রী স্ত্রীগণ নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর রত্নের সহিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, তখন তথায় সকলে নিজ নিজ রুচি অনুসারে জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন। বিপুলনিতম্বা চারুপীনপয়োধরাবিশিষ্টা, যৌবনমদে মদমত্ত হইয়া স্খলিতগামিনী বামনয়না নারীগণ যথেচ্ছ-ভাবে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। নারীগণ অর্জ্জুন ও কৃষ্ণের রুচি অনুসারে কেহ কেহ বনে, কেহ কেহ জলে, কেহ কেহ বা গৃহে যথাযোগ্য ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। সেই সময় দ্রৌপদী ও সুভদ্রা যৌবনমদে মত্ত হইয়া (খ) অনেক বস্ত্র ও আভরণ সহচরীগণকে দিলেন। কোন কোন স্ত্রী আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ কোলাহল করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ আবার হাসিতে লাগিলেন এবং কোন শ্রেষ্ঠ নারী তাল ও লয় সহকারে গান করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ অপরকে ধরিয়া থাকিলেন ও কেহ কেহ অপরকে কৃত্রিম প্রহার করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ পরস্পরের গোপন বিষয় মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন, বীণা, বেণু ও মৃদঙ্গের মনোহর ধ্বনিতে সেই মহাসমৃদ্ধিশালিনী বনভূমি ও সেখানকার রাজভবন সর্বপ্রকারে মুখরিত হইল।" (৫১) এই বর্ণনার মধ্যে বৃন্দাবনের রাসলীলার প্রেত-চ্ছায়া দেখলে চোখের দোষ দেওয়া যায় না। অবশ্য রাসলীলার তুলনায় এ কিছুই না। বৃন্দাবনের কৃষ্ণ অগণিত নারীদের সতীত্ব-হননে ব্যস্ত ছিলেন; কিন্তু দ্বারকায় যাওয়ার পর থেকে তাঁর বোধ হয় ঐ ব্যাপারে অরুচি হয়েছিল; ক্ষত্রিয়-হননের ক্রীড়াই তখন তাঁকে বেশী আনন্দ দিত।

এরপর প্রভাসতীর্থে যাদবেরা কিভাবে নিজেদের ধ্বংস করলেন তার বিবরণে আসা যাক। "উগ্রসেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম এবং মহানুভব বভ্রুর আদেশ অনুযায়ী নর-

পালগণ রাজভৃত্যগণের মাধ্যমে নগরীতে ঘোষণা করাইলেন যে, "অদ্য হইতে এই রাজ্যে বৃষ্ণি ও অন্ধকগণের কেহই মদ্য প্রস্তুত করিতে পারিবে না। যে নগরবাসী আমাদের অসাক্ষাতে অপেয় দ্রব্য প্রস্তুত করিবে, তাহাকে সবান্ধব শূলদণ্ড দেওয়া হইবে।" (৫২) কিন্তু কে কার কথা শোনে? "তাহার পর নরশ্রেষ্ঠ সেই বৃষ্ণিবংশীয় ও অন্ধকবংশীয় ধুরন্ধরগণ দ্বারকা পরিত্যাগকরত সস্ত্রীক তীর্থযাত্রা করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রস্তুত হইলেন। অনন্তর বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশধরগণ বিবিধ উপায়ে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য, পানীয়, মদ্য ও মাংসাদি সংগ্রহ করিলেন।...ক্রমে প্রচুর খাদ্য ও পেয় দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া সেই যাদবগণ সস্ত্রীক প্রভাসতীর্থে যাইয়া পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে এবং গৃহে বাস করিতে লাগিলেন।...সেই মহাত্মা যাদবগণ ব্রাহ্মণদের জন্য যে অন্নাদি পাক করাইয়াছিলেন, তাহাতে মদগন্ধ থাকায় উহা বানরগুলিকে প্রদান করিয়াছিলেন [৬]। অনন্তর প্রভাসতীর্থে মহাতেজা যাদবগণের ইচ্ছামত মদ্যপান আরম্ভ হইল। সেই সঙ্গে শত শত তূর্যধ্বনি এবং নট-নর্তকাদির নৃত্যগীত প্রবলভাবে আরম্ভ হইল।...মদ্যপানজনিত মত্ততায় সেই ভোজবংশধরেরা অদৃষ্টলেখনে আঘাত করিবার মত কৃপাণের অভাবে উচ্ছিষ্ট মদ্যপানের পাত্রসমূহ দ্বারাই সাত্যকিকে আঘাত করিতে লাগিলেন।" (৫৩)

এই বর্ণনা থেকে দেখা যাচ্ছে, "বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের লোকেরা সংস্কারহীন, হিংসাপ্রধান কর্মকারী।" ভূরিশ্রবার এই বাক্যটি সম্পূর্ণই সমর্থনযোগ্য। যদুবংশ যে ভাবে ধ্বংস হল তার মধ্যে গৌরব এতটুকুও নেই। এর চেয়ে হীন অবসানের কথা ভাবাই যায় না। কুরুক্ষেত্রে যে সব ক্ষত্রিয় বীরেরা সম্মুখসমরে মৃত্যুবরণ করেছিলেন তাঁদের মৃত্যুকে গৌরবজনক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পুরস্কার হিসাবে তাঁরা সকলেই স্বর্গে গতিলাভ করেছিলেন। কিন্তু মদ খেয়ে মাতলামি করে পরস্পরকে মারার পর যদুবংশীয়দের কারও ক্ষত্রিয়ের স্বর্গের অধিকার পাওয়ার কথা নয়। এই প্রকার হীন মৃত্যু যাঁদের বরণ করতে হল না সেইসব নারীরা, যাঁরা দ্বারকায় থেকে গিয়েছিলেন, তাঁদের অন্য যে গতি হল তা একই বা অধিকতর পরিমাণে অমর্যাদাকর। অর্জুনের উপর ভার পড়েছিল ঐ যদুবংশীয় স্ত্রীদের রক্ষার ব্যবস্থা করার। কিন্তু কৃষ্ণের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অর্জুন হয়ে পড়লেন হীনবল— যাতে আবারও প্রমাণ হয় অর্জুনের বীর্যের মূলে ছিল কৃষ্ণের সম্মোহনকারী ক্ষমতা। অর্জুনের "অস্ত্রশস্ত্র সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞান লোপ পাইল, বাহুবলও নষ্ট হইল, ধনুকও আয়ত্তের বাহিরে গেল এবং অক্ষয়বাণগুলিও ক্ষয়প্রাপ্ত হইল......ম্লেচ্ছের ন্যায় ধর্মবিহীন সেই দস্যুগণ অর্জুনের সমক্ষেই বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের উত্তম স্ত্রীগণকে চতুর্দ্দিকে লইয়া গেল।" (৫৪) যদুবংশের স্ত্রী ও পুরুষদের এই কালিমালিপ্ত অবসানের সঙ্গে সমতা রেখেই কৃষ্ণের মৃত্যুও গরিমাহীন। তিনি যদি ক্ষত্রিয়বীর হতেন তো সম্মুখসমরে মৃত্যুই হত তাঁর পরম গতি। আর তিনি যদি সত্যিই ভগবান হতেন তো যোগমৃত্যুই হত তাঁর উপযুক্ত। তিনি যোগমৃত্যুর জন্য নিজেকে তৈরীও করেছিলেন। "সকলার্থতত্ত্ববিৎ এবং অবিনাশী শ্রীকৃষ্ণ ঐহিকলীলা সংবরণ করিবার জন্য মহাযোগ অবলম্বন করিয়া ইন্দ্রিয়, বাক্য ও মনকে নিরুদ্ধ রাখিয়া ভূমিতে শয়ন করিলেন।" (৫৫) কিন্তু যোগমৃত্যু তাঁর কপালে ছিল না। তিনি নিহত হলেন এক ভয়ঙ্কর ব্যাধের বাণে, যে ব্যাধ "হরিণবোধে বাণদ্বারা যোগযুক্ত অবস্থায় শায়িত শ্রীকৃষ্ণের পদতল বিদ্ধ করিল।" (৫৬) পাপী বলে অতিনিন্দিত যে দুর্যোধন, তাঁরও

মৃত্যুকালে "তাঁহার উপর পবিত্র সুগন্ধযুক্ত পুষ্পসমূহ প্রবলভাবে বর্ষিত হইতে লাগিল, গন্ধর্বগণ অত্যন্ত মনোহর বাদ্য বাজাইতে আরম্ভ করিলেন এবং অপ্সরাদল রাজা দুর্যোধনের সুযশসম্বন্ধী গীত গান করিতে লাগিলেন। রাজন! সেই সময় সিদ্ধগণ বলিয়া উঠিলেন, উত্তম উত্তম।"(৫৭) ভীষ্মের মৃত্যু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তাঁর নিজ ইচ্ছা অনুসারে হয়েছিল. তিনি তাঁর জীবিত আত্মীয়পরিজন সকলের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন এবং "সেই সময় দেবতাগণের দুন্দুভিসমূহ বাদিত হইতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে দিব্য পুষ্পসকল বর্ষিত হইতে লাগিল। সিদ্ধ ও ব্রহ্মর্ষিগণ অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন। তাঁহারা তখন ভীষ্মকে সাধুবাদ প্রদান করিলেন।" (৫৮) এই দুই মৃত্যুর তুলনায় একাকী, বনচারী, পরাজিত, হৃতগৌরব ও নিঃশক্তি কৃষ্ণের মৃত্যু এতই 'কুৎসিত' (গান্ধারীর অভিশাপের ভাষায়) যে এই মৃত্যুক্ষণে তাঁকে দেবাদিদেব বিষ্ণুর সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে অসুবিধা হয়।

৩

জীবনে ও মরণে, আচরণে ও ব্যবহারে যদুবংশীয়দের অন্যান্য ক্ষত্রিয়-বংশদের তুলনায় নীচ ও হীনরূপে চিত্রিত করা হয়েছে, এই প্রতিপাদনটি আমাদের আলোচ্য তৃতীয় প্রশ্নটিকে জোরদার করে তোলে। একটি নীচকুলোদ্ভব মিথ্যাচারী কুচক্রী ব্যক্তিকে দেবতার স্থান কখন কিভাবে কেন দেওয়া হল এই প্রশ্নটিকেই আমরা উল্টো করে রাখছি। কৃষ্ণ, যাঁকে বিভিন্ন চরিত্রের মুখ দিয়ে বিষ্ণুর অবতার হিসাবে স্তুতি করা হয়েছে, একই কালে অন্যান্য অনেক চরিত্রের মুখ দিয়ে তাঁর এত নিন্দা কেন করা হয়েছে, তাঁর আচরণকেই বা কেন এত নিন্দনীয়ভাবে দেখান হয়েছে? বহুবার বহুহস্তের লেপন হয়েছে, অনেক প্রক্ষিপ্ত অংশ যুক্ত হয়েছে এই অবিসংবাদিত সত্যের মধ্যে ব্যাখ্যা থাকতে পারে বলে মনে হয় না। শৈব ও বৈষ্ণবদের মধ্যে যতই রেষারেষি থাকুক কোন শৈবসাহিত্যে বিষ্ণুর দেবত্ব অস্বীকার করা হয় নি, বিষ্ণুকে নিন্দাও করা হয়নি, যেভাবে কৃষ্ণের নিন্দা করা হয়েছে শিশুপালের মুখ দিয়ে, গান্ধারীর মুখ দিয়ে ও অন্যান্য আরও অনেকভাবে।

এই প্রহেলিকাকে অনুধাবন করলে অন্য একটি রহস্যঘন প্রশ্ন উঠে পড়ে। পঞ্চপাণ্ডবরাই যদি হবেন মহাভারতের নায়ক তো পদে পদে পঞ্চপাণ্ডবদের দ্বারা ক্ষত্রধর্ম লঙ্ঘনকারী এত কুকীর্তির বিবরণ কেন দেওয়া হয়েছে?

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। তবে একটি ইঙ্গিত আমার মনে আসে। ইঙ্গিতটিকে অবশ্য একেবারেই আমল দেওয়া যেতে পারে না যদি না ধরে নেওয়া হয় যে যত সামান্য পরিমাণেই হোক কুরুপাণ্ডব যুদ্ধের একটা ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে। তা যদি থেকে থাকে তো ঐ যুদ্ধের ইতিহাস স্মৃতিতে বদ্ধ করার কাজটা একেবারে ঘটনার সময়ে নিশ্চয় পড়েছিল কৌরবসভার সভাকবিদের উপর। চারণ-জাতীয় লোকগাথার স্রষ্টারাও একই কালে ভাবীকালের জন্য ঐ ইতিবৃত্তকে নিজেদের মত করে রক্ষা করার কাজ শুরু করেছিলেন অনুমান করা যেতে পারে। ঐ সভাকবিরা দুর্যোধন ও কৌরবদের সমর্থক ছিলেন মনে করে নেওয়াটাও স্বাভাবিক। কেননা সভাকবিদের বেতন দিয়ে রাখা হয়—সেকালেও বটে,

একালেও বটে—শাসনকর্তাদের স্তুতি করার জন্য। কৌরবদের পৃষ্ঠপোষকতায় পুষ্ট না এমন চারণ কবিরাও যদি অনেকে কৌরবদের সমর্থক হয়ে থাকেন তো আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কেন না প্রজাদের মধ্যে তাঁদের সম্পর্কে ব্যাপক অসন্তোষ ছিল এমন কোন উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। বরং জনমত পাণ্ডব ও কৌরবদের মধ্যে বিভক্ত ছিল তার সপক্ষে নিম্ন-লিখিত সাক্ষ্যটিকে নেওয়া যেতে পারে। ধৃতরাষ্ট্র বলেন—"পাণ্ডু অমাত্যগণ, সৈন্যগণ এবং তাহাদের পুত্রপৌত্রগণকেও ভরণপোষণ করিয়াছে। সেইসব সৈন্য ও নাগরিকগণ সকলেই তাহার দ্বারা পরিপুষ্ট। তাহারা যুধিষ্ঠিরের জন্য যে সবান্ধব আমাকে বধ করিবে না—তাহা কে বলিতে পারে?" দুর্যোধন বললেন, "আপনি যে কথা বলিলেন তাহা আমিও চিন্তা করিয়াছি। সেইজন্য পূর্ব হইতেই সকল নাগরিকগণকে অর্থ ও সম্মানের দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়াছি। হে রাজন্! এ সময় রাজকোষ ও মন্ত্রীবর্গ আমার হাতে। সুতরাং নাগরিকগণও মুখ্যরূপে আমার সহায়ক হইবে।"(৫৯) সাধারণ প্রজাদের চোখে এবং সভাসদ্‌দের চোখে হয়তো পাণ্ডবপক্ষই দোষী বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। তাদের হয়তো মনে হয়েছিল, ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যের উত্তরাধিকার ন্যায়সঙ্গতভাবে দুর্যোধন ছাড়া আর কারও হতে পারে না, পাণ্ডবপক্ষীয়রা এক ছলনাকারী কুচক্রী পরামর্শদাতার দ্বারা চালিত হয়ে এবং মূলত পাঞ্চাল, বিরাট ও যদুবংশীয় রাজাদের সাহায্যে অধর্মযুদ্ধে কৌরবদের পরাজিত করে রাজ্য দখল করেছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর কৌরবসভাই পাণ্ডবদের সভায় পরিণত হয়। আধুনিককালে যাকে purge করা বলে তা বহুপরিমাণে করলেও কোন রাজ্যেই কোন রাষ্ট্রেই শাসকবদলের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সভাসদ্‌দের পরিবর্তন হতে পারে না। সভাসদ্‌রা নিজেদের স্বার্থে নূতন মনিবদের মন যুগিয়ে চলার চেষ্টা করবে তাই স্বাভাবিক। এর ফলে যে দোটানার সৃষ্টি হয় তার মধ্যেই কুরুপাণ্ডবদের আখ্যানে যে সাংঘাতিক অসঙ্গতি পদে পদে পাওয়া যায় তার মূল প্রোথিত আছে মনে করা যেতে পারে। একদিকে মনে মনে এই সভাসদ্‌রা এবং প্রজাদের মধ্যে অনেকে পঞ্চপাণ্ডবদের উপর ক্ষুব্ধ, তাদের অন্যায় কীর্তিকলাপ তাদের কাছে জ্ঞাত অথবা তাদের দ্বারা কল্পিত। অপরদিকে নূতন মনিবদের সন্তুষ্ট রাখার জন্য মাঝে মাঝেই তাদের স্তুতি গাইতে হয়। সুতরাং পরবর্তীকালে প্রক্ষেপের পরে আরও যত অসঙ্গতিই প্রবেশ করে থাকুক একেবারে জন্মসূত্র থেকেই, লিখিত আকার ধারণ করার অনেক আগে থেকেই, পঞ্চপাণ্ডবদের বর্তমান থাকার কাল থেকেই, এই আখ্যান অসঙ্গতির দ্বারা বহুধাবিভক্ত হয়ে রয়েছে মনে করা যেতে পারে।

টীকাপঞ্জী

ক) এই প্রশ্নের দিকে এবং উদ্ধৃতিতে একটি ত্রুটির দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সহকর্মী ও সুহৃদ শ্রীসুব্রত চক্রবর্তী। এই প্রবন্ধে উত্থাপিত অনেক বিষয় সম্পর্কেই তার সঙ্গে আলোচনা করে উপকৃত হয়েছি।

খ) লক্ষণীয় যে গান্ধারী কেবল লৌকিক ক্ষমতার কথাই বলছেন, একবারও তাঁর ঐশী ক্ষমতার কথা বলছেন না।

গ) কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মূল কারণ-হিসাবে দ্রৌপদীকে সনাক্ত করেন গান্ধারী এইভাবে :
"গান্ধারী কৃষ্ণাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আলিঙ্গন করিলেন। তিনি কমলনয়না কৃষ্ণাকে আলিঙ্গন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই পাঞ্চালী আমার পুত্রগণের মৃত্যুস্বরূপই হইবে।"

ঘ) অনুবাদে যৌবনমদে মত্ত লেখা হয়েছে, সংস্কৃতে আছে "মদোৎকটা।"

ঙ) এই অনুবাদে প্রকাশ পাচ্ছে না এমন কিছু কিছু চিহ্ন অন্যভাবে পাওয়া যায়। যেমন রাজশেখর বসু লিখেছেন, "সেখানে তাঁরা নারীদের সঙ্গে নিঃশঙ্কে পান করছেন, বক্ষচন্দন এবং ব্রাহ্মণ-অন্ন প্রস্তুত, অন্নে সুরা মিশ্রিত করে [illegible] আসছেন।" আর বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন, "বিশ্রু হলো যৌন প্রক্রিয়ায় নিজ জড়ত্ব [illegible] ও পুরুষ; মদ্য শুধু পান করা হ'লো না, বানরক্তের মধ্যে বিলানো হ'লো।"

উদ্ধৃতি-নির্দেশক

১। রাজশেখর বসু, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকৃত মহাভারত-সারানুবাদ
২। ঐ
৩। বনপর্ব, অধ্যায় ১১
৪। সভাপর্ব, অধ্যায় ১৩
৫। সভাপর্ব, অধ্যায় ১৮
৬। উদ্যোগপর্ব, অধ্যায় ১৬১
৭। উদ্যোগপর্ব, অধ্যায় ২৯
৮। উদ্যোগপর্ব, অধ্যায় ৩১
৯। উদ্যোগপর্ব, অধ্যায় ৭
১০। উদ্যোগপর্ব, অধ্যায় ১৫৭
১১। উদ্যোগপর্ব, অধ্যায় ২০৬
১২। আশ্বমেধিকপর্ব, অধ্যায় ৫২
১৩। আদিপর্ব, অধ্যায় ২০৬
১৪। ঐ
১৫। সভাপর্ব, অধ্যায় ১
১৬। আশ্বমেধিকপর্ব, অধ্যায় ৭১
১৭। বনপর্ব, অধ্যায় ২৩৫
১৮। উদ্যোগপর্ব, অধ্যায় ১৪১
১৯। স্ত্রীপর্ব, অধ্যায় ২৫
২০। আশ্বমেধিকপর্ব, অধ্যায় ৫১
২১। উদ্যোগপর্ব, অধ্যায় ১
২২। বিরাটপর্ব, অধ্যায় ১
২৩। উদ্যোগপর্ব, অধ্যায় ৫
২৪। বনপর্ব, অধ্যায় ১২
২৫। ঐ
২৬। বনপর্ব, অধ্যায় ১৮৩
২৭। উদ্যোগপর্ব, অধ্যায় ৮০

২৮। উদ্যোগপর্ব, অধ্যায় ৭২
২৯। উদ্যোগপর্ব, অধ্যায় ৮২
৩০। উদ্যোগপর্ব, অধ্যায় ৭৭
৩১। উদ্যোগপর্ব, অধ্যায়, ৭৪
৩২। ঐ
৩৩। উদ্যোগপর্ব, অধ্যায় ৭৫
৩৪। সভাপর্ব, অধ্যায় ২২
৩৫। সভাপর্ব, অধ্যায় ১৪
৩৬। সভাপর্ব, অধ্যায় ২২
৩৭। উদ্যোগপর্ব, অধ্যায় ৪৯
৩৮। সভাপর্ব, অধ্যায় ৬৯
৩৯। উদ্যোগপর্ব, অধ্যায় ৮২
৪০। বনপর্ব, অধ্যায় ১২
৪১। ঐ
৪২। ঐ
৪৩। আশ্বমেধিকপর্ব, অধ্যায় ৮৭
৪৪। আদিপর্ব, অধ্যায় ১৮৬
৪৫। সভাপর্ব, অধ্যায় ৬৯
৪৬। উদ্যোগপর্ব, অধ্যায় ৮২
৪৭। সভাপর্ব, অধ্যায় ৬৫
৪৮। দ্রোণপর্ব, অধ্যায় ১৪৩
৪৯। আশ্বমেধিকপর্ব, অধ্যায় ৫৯
৫০। বুদ্ধদেব বসু 'মহাভারতের কথা'
৫১। আদিপর্ব, অধ্যায় ২২১
৫২। মৌসলপর্ব, অধ্যায় ১
৫৩। মৌসলপর্ব, অধ্যায় ৩
৫৪। মৌসল পর্ব' অধ্যায় ৭
৫৫। মৌসলপর্ব, অধ্যায় ৪
৫৬। ঐ
৫৭। শল্যপর্ব, অধ্যায় ৬১
৫৮। অনুশাসনপর্ব, অধ্যায় ১৬৮
৫৯। আদিপর্ব, অধ্যায় ১৪১
৬০। আদিপর্ব, অধ্যায় ১১৬

এই প্রবন্ধটি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে "কৃষ্ণ-রহস্য" নামে প্রকাশিত হয়েছিল "জিজ্ঞাসা" পত্রিকায় ১৩৮৭ সালে।

দ্বাদশ অধ্যায়

সামন্ততন্ত্র নয়, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র

ভারতীয় ঐতিহাসিক মহলে কিছুদিন যাবৎ একটি বিতর্ক চলেছে, যার বিষয়বস্তু হল ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাসের কোন পর্বে সামন্ততন্ত্রের অভ্যুত্থান ও পতন ঘটেছিল কি ঘটেনি এই প্রশ্নটি। একই কালে ভারতবর্ষের মার্কসবাদী রাজনীতিবিদ্ ও অর্থনীতিবিদ্‌দের এক মহলে গত দশ বৎসর যাবৎ একটি বিতর্ক চলেছে, যার বিষয়বস্তু হল ভারতবর্ষের কৃষি ব্যবস্থাকে ধনতান্ত্রিক আখ্যা দেওয়া সংগত না আধা-সামন্ততান্ত্রিক আখ্যা দেওয়া উচিত! এই বিবদমান সমাজবিজ্ঞানী গোষ্ঠীদ্বয়ের মধ্যে মনে হয় কোন প্রকার যোগাযোগই নেই। বিতর্কে নিযুক্ত ঐতিহাসিকদের কাছে প্রশ্নটি নিতান্তই শাস্ত্রীয়, বর্তমান ভারতীয় সমাজের সম্পর্কে কোন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশই দুইপক্ষের কোনটির মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায় না। অপরদিকে মার্কসবাদীদের মধ্যে যাঁরা আধা-সামন্ততন্ত্র বনাম ধনতন্ত্র নিয়ে লড়ে যাচ্ছেন তাঁরা যেন অবহিতই নন যে বর্তমানটা অতীতেরই অংশ বিশেষ। অতীতের সমাজ ব্যবস্থায় সামন্ততন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল কি ছিল না এবং আজকের দিনের সমাজব্যবস্থাকে আধা-সামন্ততান্ত্রিক আখ্যা দেওয়া হবে কি হবে না এই দুই প্রশ্ন যে পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত সেই বিষয়ে কোন চেতনার প্রকাশই এঁদের আলোচনায় পাওয়া যায় না।

ঐতিহাসিকরা তাঁদের বিতর্কে একটি ব্যাপারে কোন সমালোচনার অবকাশ রাখেন না। সামন্ততন্ত্রের সংজ্ঞা ও সেই ব্যবস্থার মূল লক্ষণগুলির বিষয়ে শাস্ত্রীয় বৈদগ্ধ্যের কোন অভাব তাঁদের বিতর্কে লক্ষিত হয় না। রাজনীতিবিদ ও অর্থনীতিবিদ্‌দের মধ্যে যে বিতর্ক তার অবস্থাটা বিপরীত। 'আধা-সামন্ততন্ত্র' বলতে কি বোঝায় তাকে আলোচনাকারীদের কেউ স্পষ্টভাবে বলে নেন না। কৃষিতে ভাগপ্রথার প্রচলন, মহাজনী কারবারের প্রসার প্রভৃতিকে রাখা হয় আধা-সামন্ততন্ত্রের পাল্লায়। আর ধনতন্ত্রের পাল্লায় রাখা হয় ক্ষেতমজুরদের সংখ্যাগুরুত্ব, উৎপাদনে পুঁজিনিয়োগ প্রভৃতিকে। কিন্তু ভাগপ্রথা বা সুদের কারবারকে আধা-সামন্ততন্ত্রের মূল লক্ষণ বলে কেন মনে করে নেওয়া হবে তার কোন ব্যাখ্যা করা হয় না।

বাংলায় 'সামন্ততন্ত্র' শব্দটিকে ব্যবহার করা হয় ইংরেজী ফিউড্যালিজম শব্দের অনুবাদ হিসাবে। কিন্তু ফিউড্যালিজমের মূল লক্ষণ কী সেই বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কোন মতৈক্য নেই। কোন একটি বিশেষ মত অনুসারে কিছু লক্ষণকে ফিউড্যালিজমের মূল লক্ষণ বলে মেনে নেওয়ার পরও প্রশ্ন থেকে যাবে, "আধা-ফিউড্যালিজমের" মধ্যে তাদের কোন কোনটিকে অন্তর্ভুক্ত হতেই হবে আর কোনটি বা না থাকলেও চলবে? একটা কুমড়োর মত সরল জিনিসকেও দুভাগ করার কাজটাকেও অসংখ্যভাবে করা যেতে পারে। সমাজ ব্যবস্থার ধারণা একটি অত্যন্ত জটিল চিন্তাপুঞ্জ। তার অর্ধেক বলতে কি বোঝায় তা মোটেই স্বয়ংপ্রকাশ নয়। দুঃখের বিষয় এই যে রাজনীতিবিদ্ ও অর্থনীতিবিদ্‌দের আলোচনায় 'আধা-সামন্ততন্ত্র কথাটিকে এমনইভাবে ব্যবহার করা হয় যেন তার অর্থ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। মার্কসবাদী রাজনীতির প্রচারসাহিত্যে অনেক সময়ই 'আধা-

সামন্ততন্ত্র' বাক্যটিকে এই প্রকার একটি স্বয়ংবোধ্য বাক্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। খুবই জটিল একটি ধারণাকে স্বয়ংবোধ্য মনে করে কোন ব্যাখ্যা ছাড়াই ব্যবহার করে যাওয়ার ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছে। অর্থাৎ আকার ও অবয়বহীন একটি ঘোলাটে ধারণা সব আলোচনাকে ঘোলাটে করে দিয়েছে।

এই প্রবন্ধে আমাদের বক্তব্য এই হবে যে ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে ফিউড্যালিজমের ধারণা আমদানি করাটা সমাজ বিশ্লেষণের দিক থেকে খুবই ক্ষতিকর হয়েছে। ইউরোপীয় ইতিহাসের প্রসঙ্গে ফিউড্যালিজম্ কথাটির যত বিভিন্ন রকমের সংজ্ঞা ও লক্ষণের উল্লেখ পাওয়া যায় তাদের থেকে কিছু রেখে কিছু বাদ দিয়ে এমন কিছুই দাঁড় করান যায় না যা ভারতবর্ষের সমাজের গতিপ্রকৃতিকে বুঝতে সাহায্য করে। প্রাচীন যুগ বা মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও যেমন আমাদের এই বক্তব্য, আধুনিক ভারতবর্ষীয় সমাজ সম্পর্কেও তথৈবচ। অবশ্য আধুনিক ভারতবর্ষকে আমরা আমাদের আলোচনায় সরাসরিভাবে আনব না। আমাদের প্রতিপাদ্য হবে এই যে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের কোন পর্বেই সমাজের গঠন এমন ছিল না যাকে ইউরোপীয় ফিউড্যালিজমের সমগোত্রের কিছু বলে দেখানোর মধ্যে কোন তাত্ত্বিক সুবিধার সম্ভাবনা রয়েছে। ঐ যুক্তির পরম্পরাই আধুনিক ভারতবর্ষের পক্ষে আধা-সামন্ততন্ত্র জাতীয় ধারণারও উপযোগিতাকে নস্যাৎ করে দেয় বলে আমি মনে করি।

আমার নিজস্ব যুক্তি অবতারণা করার আগে আমার বক্তব্যে নূতনত্ব কি থাকবে তার ইঙ্গিত দিয়ে রাখি। ভারতীয় ইতিহাসের কোন পর্বেই সামন্ততন্ত্র আবিষ্কার করা যায় না এই বক্তব্যটি নূতন নয়, এই বক্তব্য অনেক ঐতিহাসিকেরই, অনেক সমাজবিজ্ঞানীরই। কিন্তু তাঁদের বক্তব্য নেতিবাচক। সামন্ততন্ত্রের বিকল্প কোন ধারণার কাঠামোর প্রস্তাব তাঁরা করেন নি। এইরকম একটি বিকল্প বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে। নেতিবাচক যুক্তির পর আমরা আমাদের ইতিবাচক যুক্তিকে পেশ করব।

২

প্রথমে কিছু জঞ্জাল সাফ্ করে নিতে হয়। কোন কোন বিষয়ে আলোচনার সময়ে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয় এই কারণে যে কিছু কিছু শব্দ ও বাক্য একইকালে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা হিসাবেও ব্যবহৃত হয়, আবার কোন বিশেষ অর্থ ব্যতিরেকেই সাধারণ মানুষের সাধারণ কথাবার্তার অংশ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 'বুর্জোয়া' শব্দটি যেমন কোন কোন বিশেষ মহলে একটি গালির পর্যায়ে পরিণত হয়েছে, 'ফিউড্যাল' বা 'সামন্ততন্ত্র' কথাটিরও হয়েছে একই হাল। বুর্জোয়া বলে গাল দেওয়ার প্রবণতাটা বোধহয় মার্কস্‌বাদের দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু 'ফিউড্যাল' তথা 'সামন্ততান্ত্রিক' বিশেষণটির অপব্যবহারের বদভ্যাস ব্যাপকতর। যা কিছুই ব্যক্তি বিশেষের মনোমত আধুনিক নয়, যা কিছুই কোন আধুনিকমন্য ব্যক্তির কাছে পশ্চাৎপদ, প্রগতির পরিপন্থী, তাকেই 'ফিউড্যাল' বা 'সামন্ততন্ত্র' বলে বর্ণনা করাটা বেশ উচ্চশিক্ষিত, এমনকি বুদ্ধিজীবী মহলেও খুবই প্রচলিত।

সাধারণ মানুষের চিন্তায় এই ধূম্রকুণ্ডলীর কথা বাদ দিলেও, পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যেও, 'ফিউড্যাল' কথাটি মোটেই কোন বিশেষ পরিষ্কার অর্থ বহন করে না। সর্বোচ্চস্তরের পণ্ডিতদের মধ্যেই স্পষ্ট দুটি মত রয়েছে। একটি মত অনুসারে ফিউড্যালিজম্ সমাজের কাঠামো সম্পর্কিত এমন একটি সাধারণ ধারণা যা সার্বলৌকিক প্রয়োগের সম্ভাবনা সমন্বিত। দ্বিতীয় মত অনুসারে ফিউড্যালিজম্ ইউরোপের মধ্যযুগীয় সামাজিক ইতিহাসের একটি বৈশিষ্ট্য। এই মতের বৈপরীত্যকে প্রসিদ্ধ ফরাসী ঐতিহাসিক মার্ক ব্লক সুন্দরভাবে প্রকাশ করছেন নিম্নলিখিতভাবে: Montesquieu-এর চোখে ফিউডাল আইনের প্রতিষ্ঠা ছিল এমন একটি ঘটনা যা দুনিয়ায় একবারই ঘটেছিল এবং যা আর কখনই ঘটবে না। অপরদিকে ভলটেয়ার-এর মতে ফিউড্যালিজম্ কোন একটি ঘটনা নয়, তা হল এমন একটি সামাজিক গঠন যা বিভিন্ন প্রকারের গতিভঙ্গী সহকারে তার সমসাময়িক পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের তিন চতুর্থাংশে কায়েম ছিল। মার্ক ব্লক, যাঁকে ইউরোপীয় ফিউড্যালিজমের একজন প্রামাণিক পণ্ডিত বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, নিজে ফিউড্যালিজমের কোন সাধারণ সংজ্ঞায় আস্থাশীল ছিলেন না। তাঁর মতে ফিউড্যাল ব্যবস্থার জন্ম ঘটেছিল দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের ও অসম স্তরের সমাজের সংঘর্ষের ফলস্বরূপ —একদিকে সভ্যতার শীর্ষস্থান অধিকারী রোমক সাম্রাজ্য, অপরদিকে উপজাতিক সমাজ-গঠন সমন্বিত বর্বর জার্মান আক্রমণকারীরা। (১) কিন্তু সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকেই ভিন্ন মত পোষণ করেন। ম্যাক্স ওয়েবের-এর অর্থনৈতিক ইতিহাস পড়লে দেখা যায় যে তিনি ছিলেন ভলটেয়ারের অনুগামী। (২) তেমনি ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে ফিউড্যালিজমের অবসানের মধ্যে ধনতন্ত্রের বিকাশ বিষয়ে গবেষণার জন্য যে মরিস্ ডব্ বোদ্ধা মহলে সমাদৃত, তাঁর কাজে ফিউড্যালিজম্‌কে 'সাফ' ব্যবস্থার সঙ্গে সমার্থক করে দেখা হয়েছে এবং 'সাফ' প্রথাটিকেও এমনই সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে যা নিতান্তই অবিশেষ যে কোন দেশের সামাজিক ইতিহাসেই যা প্রযোজ্য। (৩) ভারতবর্ষের ইতিহাসে ফিউড্যালিজমের ধারণার প্রয়োগের সর্বপ্রধান দায়িত্ব মনে হয় পণ্ডিতপ্রবর দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বির। মূলত গণিতশাস্ত্রবিদ্ কিন্তু সংস্কৃতকাব্য থেকে শুরু করে প্রাচীন তথা বর্তমান ভারতবর্ষের সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের উপর অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী এই অক্লান্ত জ্ঞানসাধক ভারতবর্ষের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের উপর আমার প্রচুর শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও বলব, তিনি যে সার্বলৌকিক গুণসমন্বিত ফিউড্যালিজমের ধারণাকে ব্যবহার করেন তার বিশদ আলোচনা কোথাও করে নেন না। অন্য দুই ক্ষেত্রেও ফিউড্যালিজম্ কথাটিকে অবিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কিত যে সার্বলৌকিক ধারণা এই ব্যবহারের ভিত্তি তার কোন তাত্ত্বিক বিশদীকরণ কোথাও পাওয়া যায় না। বস্তুত, সার্বলৌকিক ধারণা হিসাবে ধনতন্ত্রের উপর যে বিপুল পরিমাণ তাত্ত্বিক আলোচনা এ যাবৎ করা হয়েছে তার তুলনায় ফিউড্যালিজমের উপর তাত্ত্বিক কাজ যা হয়েছে তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু কাজটাতে যে হাতই দেওয়া হয়নি তা ঠিক নয়।

একটি প্রচেষ্টা করা হয়েছে সোভিয়েত সমাজবিজ্ঞানীদের এক মহলে। এই মহলে ফিউড্যাল সমাজ-ব্যবস্থা বলতে বোঝান হয়েছে এমন এক ব্যবস্থা যার ভিত্তিপ্রস্তর স্বরূপ কাজ

করে ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের করায়ত্ত জমির মালিকানার দ্বারা সম্ভাবিত অর্থনৈতিক শোষণ। অপর একটি প্রচেষ্টার ফল পাওয়া যায় একটি প্রবন্ধ সংকলনের আকারে যা ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত হয়েছিল কয়েকজন পাশ্চাত্ত্য ঐতিহাসিকদের মিলিত প্রচেষ্টায়। (৪) উদ্যোগী পণ্ডিতেরা ফিউড্যালিজমের মূল লক্ষণ বলতে কী মনে করেন তাকে গ্রন্থের ভূমিকায় বিশদ ও স্পষ্টভাবে আলোচনা করে নেওয়া হয়েছে; তারপর বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্নকালে এই সমাজব্যবস্থা কী আকার নিয়েছিল তার উপর নিবন্ধ লেখান হয়েছে উপযুক্ত বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের দিয়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে ঐ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত ভারতবর্ষীয় ফিউড্যালিজমের উপর প্রবন্ধটিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেছে যে ঐ গ্রন্থের উদ্দেশ্যে স্বীকৃত সংজ্ঞা অনুসারী কোন সমাজব্যবস্থাকে ভারতবর্ষের কোন পর্বে খুঁজে পাওয়া যায় না।

বিশেষ ধারণা এবং অবিশেষ ধারণার প্রভেদ যদি হয়ে থাকে মতভেদের একটি উপলক্ষ্য, তো দ্বিতীয় একটি মতভেদের প্রকাশ দেখা যায় মার্কসবাদী ও অন্যান্য ঐতিহাসিকদের মধ্যে। মার্কসবাদীরা যখন ফিউড্যালিজম বা ধনতন্ত্রের কথা বলেন তখন তাঁদের প্রধান ঝোঁক থাকে একটি উৎপাদন ব্যবস্থার উপর যে উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে একদিকে রয়েছে উৎপাদিকাশক্তিসমূহ অপরদিকে রয়েছে উৎপাদন সম্পর্ক সমূহ। এই উৎপাদন ব্যবস্থাকে সমাজের ভিত্তি-কাঠামো রূপে দেখে সমাজের বাদবাকি অঙ্গগুলিকে মার্কসবাদীরা উপরিস্থিত-কাঠামো রূপে চিহ্নিত করেন। মার্ক্সবাদী পণ্ডিতদের অধিকাংশই কোন সমাজব্যবস্থার গতি-প্রকৃতি অনুধাবনের কাজে ভিত্তি কাঠামোর উপর অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এই কারণে ফিউড্যালিজমের মূল লক্ষণ চিহ্নিত করতে মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিকেরা উৎপাদকের সঙ্গে ভূস্বামীদের সম্পর্কের উপর জোর দেন। অন্য ঐতিহাসিকেরা রাষ্ট্রের গঠন এবং সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার অনুসৃত কিছু নীতি ও পদ্ধতির উপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন।

দৃষ্টিভঙ্গীর এই প্রভেদকে পরিস্ফুট করে দেখানর জন্য আমরা মার্ক্ ব্লক, মরিস ডব্ ও কুলবোর্ণ এই তিন পণ্ডিত কীভাবে ফিউড্যালিজমের মূল লক্ষণগুলিকে চিহ্নিত করছেন তাদের তুলনা করব। এই কাজ করতে গিয়ে এবং পরবর্তী আলোচনায় আমরা ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক অনুষঙ্গ সমন্বিত পরিভাষার ক্ষেত্রে মূল ইংরেজী শব্দই ব্যবহার করব, তাদের বাংলায় ভাষান্তরিত করার চেষ্টা করব না। বলা বাহুল্য ইংরেজী শব্দগুলির যথাযথ প্রতিশব্দ ফরাসী ও জার্মান ভাষায় অবশ্যই পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতীয় ভাষায় একেবারেই যায় না। বাংলায় পরিভাষা সৃষ্টি করে নেওয়ার চেষ্টাই করব না, কেননা তা করলে আমার প্রবন্ধের উদ্দেশ্যেরই বিরোধিতা করা হবে। আমার বক্তব্য এই যে ফিউড্যালিজমের সঙ্গে সম্পর্কিত সামাজিক প্রতিষ্ঠান, অনুষ্ঠান, রীতিনীতি, প্রচলন, ধ্যানধারণা প্রভৃতির সব কিছুই অত্যন্ত বেশী রকমভাবে ইউরোপীয় সভ্যতার অঙ্গীভূত এবং একইভাবে ভারতীয় সভ্যতার বহির্ভূত। সংস্কৃত ব্যাকরণ ব্যবহার করে এদের জন্য পরিভাষার সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা বিড়ম্বিত হতে বাধ্য।

মার্ক্ ব্লকের প্রদত্ত মূল লক্ষণগুলিকে পশ্চিম ইউরোপীয় ফিউড্যালিজমের সম্পর্কে প্রামাণ্য বলে মেনে নেওয়ার ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। তাঁর চিহ্নিত লক্ষণগুলি এই প্রকার:

১) উৎপাদন ব্যবস্থায় manor, lord ও serf এই তিনের অবশ্য ভূমিকা।

২) রাষ্ট্র গঠনে vassalage-এর অবশ্য ভূমিকা।

৩) বেতন প্রথার পরিবর্তে fief পদ্ধতির প্রচলন।

৪) ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বশ্যতা স্বীকার ও শরণ প্রদানের সম্পর্ক, যে সম্পর্ককে স্থিতিশীলতা দেওয়া হত কিছু বিশেষ সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানের দ্বারা। যথা, homage, commendation, fealty ইত্যাদি।

৫) সমাজে যোদ্ধ-শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদের প্রাধান্য।

ইংরেজী শব্দগুলির একটু ব্যাখ্যা দিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন। manor (বা seigniorie) বলতে বোঝান হয় এমন একটি ভূসম্পত্তি যার উপর উৎপাদনের কাজ করা হত নিম্নলিখিত ব্যবস্থায়। সম্পত্তির অন্তর্গত কৃষিযোগ্য ভূমি দুইটি ভাগে বিভক্ত থাকত। একটি ভাগ ছিল lord বা ভূস্বামীর খাস্—যাকে বলা হত demesne। অপর অংশটিকে ভাগ করে দেওয়া হত কর্ষণকারী শ্রমিকদের মধ্যে, যাদের বলা হত serf অথবা villein। serf-রা তাদের কাজের সময়টাকে দুইভাগে ভাগ করে নিতে বাধ্য থাকত। সময়ের এক অংশে তারা কাজ করত ভূস্বামীর খাস্ জমিতে যেখানে উৎপাদিত শস্যের সবটুকুই যেত মালিকের খামারে। অন্য সময়টাতে তারা কাজ করত তাদের নিজেদের জমিতে এবং এখানকার উৎপাদিত শস্য তারা তাদের নিজেদের খোরাকির জন্য পেত। জমিতে তাদের কোন মালিকানা স্বত্ব থাকত না, তাদের ব্যবহারের জন্য দেওয়া হত মাত্র। manor ছেড়ে চলে যাওয়ার বা manor এর নিয়ম মেনে কাজ না করার কোন স্বাধীনতা তাদের থাকত না। বেগার খাটা ছাড়াও তাদের মালিককে নানাবিধ ভেট, নজরানা প্রভৃতি দিতে হত।

খুবই সংক্ষেপে ও সরলীকৃতভাবে ব্যবস্থাটির বর্ণনা করা হল। বলাই বাহুল্য ঘটনার স্থানে ও কালে ব্যতিক্রম ও ব্যঞ্জনার কোন অভাব ছিল না। তাদের ভূরি পরিমাণ বিবরণ যথোপযুক্ত সাহিত্যে পাওয়া যায়।

Vassal-ই একমাত্র শব্দ যার কাছাকাছি অর্থবহনকারী একটি শব্দ আমাদের ভাষায় পাওয়া যায়। তা হল "সামন্ত"। এই সাযুজ্যের ভিত্তিতেই মনে হয় ফিউড্যালিজমকে ভারতীয় ভাষাগুলিতে সামন্ততন্ত্র আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

Fief বলতে বোঝান হত এমন এক ভূসম্পত্তি যাকে কোন একজন প্রদান করতেন অধস্তন কোন ব্যক্তিকে এবং যার বিনিময়ে দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির প্রতি কোন নির্দিষ্ট শর্ত অনুযায়ী দায়বদ্ধ থাকত। এই fief কথাটির থেকেই ফিউড্যালিজম্ কথাটির উৎপত্তি। অবশ্য সে কারণেই ফিউড্যালিজমের মূল লক্ষণদের মধ্যে fief-এর গুরুত্ব সর্বাধিক, এই প্রস্তাবটিকে সব বিশেষজ্ঞরা মেনে নেন না।

Homage ও সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানগুলির প্রকৃতি অনুধাবন করতে আমাদের দেশের সম্পূর্ণ ভিন্ন ক্ষেত্র থেকে দ একটি তুলনার কথা ভাবা যেতে পারে। ভারতবর্ষীয় ঐতিহ্যে ধর্মীয় অনুশীলনে গুরু ও যজমান সম্পর্কের প্রচলন আছে। এই রীতি অনুসারে কোন এক ব্যক্তি কোন একজন গুরুর কাছে গিয়ে মন্ত্র নিয়ে বা দীক্ষা গ্রহণ করে নিজেকে সপরিবারে গুরুর সঙ্গে এক আজীবন বিশেষ সম্পর্কে আবদ্ধ করে। তেমনি সংগীত সাধনার ক্ষেত্রে "নাড়া-বাঁধা"র প্রথা আছে। অনেক সাধ্যসাধনা করে কোন একজন শ্রেষ্ঠশিল্পীকে গুরুপদ নিতে স্বীকৃত করিয়ে ঐ সম্পর্কটিকে পাকাপাকি করার জন্য করা হত এক বিশেষ অনুষ্ঠান। মার্ক্ ব্লক তাঁর গ্রন্থে এক বিরাট অংশ জুড়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যে homage নামক অনুষ্ঠানের

বর্ণনা করেন তা ঐ একইভাবে দুই ব্যক্তির মধ্যে শরণদাতা ও শরণপ্রার্থীর এক বিশেষ সম্পর্ককে আজীবন স্থায়িত্ব দিত।

কোন এক ব্যক্তির প্রয়োজন কারও কাছে আশ্রয় পাওয়া ও কারও দ্বারা রক্ষিত হওয়া। পরিবর্তে সে দিতে রাজী তার বশ্যতা এবং নির্দিষ্ট ধরণের সেবা। অপর এক অধিকতর ক্ষমতাশালী ব্যক্তির প্রয়োজন কোন অধস্তন ব্যক্তির সেবার। ঐ সেবা হতে পারে বিভিন্ন প্রকারের। উৎপাদন করা অথবা উৎপাদিত সামগ্রীর সরবরাহ করা এক ধরণের সেবা। লড়াইয়ের প্রয়োজনে সৈন্য হিসাবে কাজ করা আর এক ধরণের সেবা। দুই ব্যক্তি নিজ নিজ স্বার্থের প্রেরণায় পরস্পরের মধ্যে সেবক ও রক্ষকের সম্পর্ক স্থাপন করতে ইচ্ছুক হয়ে অনুষ্ঠিত করত যে আচার তারই নাম ছিল homage।

এই সম্পর্কটিকে যেহেতু মার্ক ব্লক ফিউড্যালিজমের প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ বলে মনে করতেন সেজন্য এই প্রসঙ্গে তার নিজস্ব ভাষায় কিছু বিস্তৃত উদ্ধৃতি দিতে পারলে ভাল হত। বিস্তৃতিও সম্ভব নয়, ফরাসী উদ্ধৃতিও সুবিধাজনক নয়। কিন্তু বাংলায় অনুবাদ করে দেওয়ার চেয়ে লেখকের অনুমোদিত ইংরেজী অনুবাদ অধিকতর উপযোগী হবে মনে করে তারই খানিকটা দিচ্ছি :—

"To be the 'man' of another man : in the vocabulary of feudalism no combination of words was more widely used or more comprehensive in meaning……

"Imagine two men face to face : one wishing to serve, the other willing or anxious to be served. The former puts his hands together and places them, thus joined, between the hands of the other man—a plain symbol of submission, the significance of which was sometimes further emphasized by a kneeling posture. At the same time, the person proffering his hands utters a few words—a very short declaration—by which he acknowledges himself to be the "man" of the person facing him. Then chief and subordinate kiss each other on the mouth, symbolzining accord and friendship……

"...the ceremony was called "homage". The superior party, whose position was created by this act, was described by no other term than the very general one of "lord". Similarly, the subordinate was often simply called the "man" of this lord ; or sometimes, more precisely, his "man of mouth and hands" (homme de bouche at de mains). But more specialized words were also employed, such as "vassal" or, till the beginning of the twelfth century at least "commended man" (commende)".

ইউরোপীয় ফিউড্যালিজমের সর্ববাদীসম্মত এই মূল লক্ষণগুলির কিছু বাদ দিয়ে কিছুকে নির্বাচন করে নিয়ে কীভাবে অন্য কোন কোন তত্ত্ববিদরা তাঁদের নিজস্ব সংজ্ঞাগুলিকে দাঁড়

করিয়েছেন এইবার তার দু-একটা উদাহরণ দেখা যাক। মরিস্ ডব্ শুধু মাত্র ভিত্তি-কাঠামোর অন্তর্গত উৎপাদন ব্যবস্থার দিকে নজর দিয়েছেন এবং সেখানেও manor ব্যবস্থাকে আবশ্যক বলে মনে করেননি। যে চাষীকেই বাধ্যতামূলকভাবে তার কাজের সময়ের এক অংশকে বা তার উৎপাদিত শস্যের এক অংশকে বা উভয়ের পরিবর্তে নির্দিষ্ট কিছু পরিমাণ অর্থকে জমির ভাড়া হিসাবে মালিককে দিতে হয় তাকেই ডব্ serf বলে অভিহিত করেন এবং যে সমাজব্যবস্থায় চাষী ঐ প্রকার জবর-দস্তির সামিল হয় সেই ব্যবস্থাকেই ডব্ ফিউড্যাল্ আখ্যা দেন। মার্ক্স অনুসারে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রথম লক্ষণ এই যে সেই ব্যবস্থার অন্তর্গত উৎপাদকেরা কোন প্রকার জবরদস্তির সামিল নয়। আর দ্বিতীয় মূল লক্ষণ, উৎপাদকদের অধিকারে উৎপাদনের হাতিয়ার কিছুই থাকে না, একমাত্র নিজেদের শ্রমকেই তারা যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারে ও কার্যত তাকেই সে স্বেচ্ছায় বিক্রয় করে। ধনতন্ত্রের এই সংজ্ঞা মনে রাখলে দেখা যায় যে ডব্ যাকে ফিউড্যাল ব্যবস্থা বলছেন তা আসলে নেতিবাচকভাবে দাসপ্রথা ব্যতীত অন্য সব প্রাক্-ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থারই নামান্তর। বর্তমান কালের অধিকাংশ মার্ক্সবাদী মনে হয় এই সংজ্ঞা অনুসরণ করেন।

সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী সমন্বিত কুলবোর্ণের নজর আবদ্ধ থাকে শুধুমাত্র উপরিস্থিত কাঠামোর উপর। তাঁর সংজ্ঞার মূল সূত্র দিতে গিয়ে তিনি বলেন, "ফিউড্যালিজম্ মূলত কোন অর্থনৈতিক বা সামাজিক ব্যবস্থা নয়, তা একটি শাসনপদ্ধতি", যে পদ্ধতির ভিত্তি vassalage। অন্যান্য কোন কোন তত্ত্ববিদ্ অন্য আরও কিছু মূল লক্ষণের কথা বলেন। উদাহরণ হিসাবে ইউরোপীয় মধ্যযুগের ইতিহাসের দিক্‌পাল পণ্ডিত পিরেণ্ এবং পল্ সুইজি প্রমুখ কিছু আমেরিকান মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিকদের লেখার মধ্যে ফিউড্যাল্ সমাজের যে বৈশিষ্ট্য বিশেষ গুরুত্ব পায় তা হল তৎকালীন অর্থনীতিতে আঞ্চলিক ও বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কের স্বল্পতা ও তজ্জনিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্বনির্ভরতা। অন্যান্য কোন কোন তত্ত্ববিদ্ সরলীকরণের দিকে এত দূর গিয়েছেন যে ফিউড্যাল্ ব্যবস্থা বলতে তাঁরা বোঝান এমন এক সমাজব্যবস্থা যার অন্তর্গত শাসক শ্রেণীর অর্থনৈতিক ভিত্তি কৃষক শ্রেণীর উৎপাদনে উদ্বৃত্তের অংশের শোষণ।

এই সব সাধারণীকৃত সংজ্ঞার অসুবিধা এই যে এদের দ্বারা প্রাক্-ধনতান্ত্রিক সবরকমের সমাজব্যবস্থাকে তালগোল পাকিয়ে এক করে দেখা হয়। ধনতন্ত্রের বিকাশ ও শিল্পবিপ্লব মোটামুটি সমসাময়িক ও একই ঐতিহাসিক বিকাশের অন্তর্ভুক্ত। পূর্ববর্তীকালে উৎপাদন সর্বত্রই ছিল সীমিত এবং মুখ্যত কৃষিনির্ভর। বিনিময় করার মত প্রচুর পরিমাণ পণ্যের উৎপাদন ঘটত না, পরিবহনের ব্যবস্থাও ছিল অনুন্নত, ফলে স্বাভাবিকভাবেই বাণিজ্যের ভূমিকা ছিল সীমিত। এই সীমাবদ্ধতাকে সমাজব্যবস্থা সংক্রান্ত কোন এক 'তন্ত্র' বলে বর্ণনা করার মধ্যে তাত্ত্বিক সুবিধা কিছুই থাকে না।

তাত্ত্বিক সুবিধা বলতে কি বোঝাচ্ছি তার একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন। একটি সমাজ-ব্যবস্থার আভ্যন্তরীন শক্তিদের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলে কিভাবে সেই ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়ে অন্য এক নূতন সমাজব্যবস্থার জন্মদান করে তা প্রদর্শন করা ছিল মার্ক্সের ইতিহাস সংক্রান্ত তত্ত্বের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইউরোপীয় ফিউড্যালজমের জঠরে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উৎপত্তি কীভাবে ঘটেছিল এই বিষয়ে মার্ক্সীয় ইতিহাস-তত্ত্বের বিশ্লেষণ মানুষের জ্ঞানের

ভাণ্ডারে এক মূল্যবান অবদান। (যদিও বলে রাখা ভাল যে এই তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ব্যাপারে মার্ক্সবাদীদের ভিতরেই অনেক বিতর্ক আছে।) সমাজব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ শক্তিদের ঘাতপ্রতিঘাতে কি ধরণের চলৎশক্তি সমাজ প্রাপ্ত হয় তৎসংক্রান্ত সাযুজ্যের উপর ভিত্তি করে যদি সেই ব্যবস্থাদের সমগোত্র বা বিভিন্ন গোত্র বলে চিহ্নিত করা হয় তো সেই শ্রেণীবিভাগ হয় তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পক্ষে সুবিধাজনক। অন্য যে কোন প্রকারের শ্রেণীবিভাগই নিতান্তই তাত্ত্বিক তাৎপর্যবিহীন taxonomy। যে কোনভাবেই করা যেতে পারে—করলেও যা, না করলেও তা। ইউরোপীয় ফিউড্যালিজম্ তার আভ্যন্তরীন ঘাতপ্রতিঘাতজনিত শক্তির দ্বারা যেভাবে বিবর্তিত হয়েছিল অনুরূপ বিবর্তনের সম্ভাবনা অন্য দেশ ও কালের যে সমাজ-ব্যবস্থায় অনুপস্থিত সেই ব্যবস্থাকে কোন কোন বাহ্যিক সাদৃশ্যের ভিত্তিতে ফিউড্যাল আখ্যা দিলে সেই সমাজব্যবস্থার আভ্যন্তরীন গতিপ্রকৃতি বোঝার ব্যাপারে কোনই সুবিধা পাওয়া যায় না। বরং অসুবিধারই সম্ভাবনা বেশী। কারণ ইউরোপীয় নজিরটিকে মাথায় রাখার দরুন ঐ বিশেষ সমাজ ব্যবস্থার স্বকীয় গতিধর্ম তাত্ত্বিকের বিশেষ মনোযোগ থেকে বঞ্চিত থাকে।

৩

এতক্ষণে আমরা ভারতীয় ইতিহাসে ফিউড্যালিজমের অস্তিত্ব সম্পর্কিত যুক্তিগুলির বিচার করার প্রস্তুতি অর্জন করতে পারলাম। সেই বিচারে প্রবেশ করার পূর্বে একটি কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়ের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিই। যাঁরা ভারতীয় ইতিহাসে ফিউড্যালিজমের অস্তিত্বকে মেনে নেন তাঁদের নিজেদের মধ্যেই একটি বিষয়ে চূড়ান্ত রকমের মতভেদ দেখতে পাওয়া যায়। বিষয়টি হল ভারতীয় ফিউড্যালিজমের উত্থান ও পতনের কাল। ঐ সমাজব্যবস্থার অস্তিত্বের সপক্ষে সবচেয়ে বেশী জোর দিয়ে ওকালতি করেন যে পণ্ডিতেরা তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক রামশরণ শর্মা (৫) ও অধ্যাপক যাদব অগ্রগণ্য। এ'দের মতে ভারতীয় ফিউড্যালিজমের জন্ম হয়েছিল চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দে এবং তা পরমোৎকর্ষ অর্জন করেছিল একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে। তারপর থেকে দিল্লীতে সুলতানী শাসনের পত্তন থেকে শুরু হয় ঐ সমাজব্যবস্থার অবনতির কাল। ভারতীয় ফিউড্যালিজমের আর এক প্রধান প্রবক্তা রাশিয়ান ঐতিহাসিক কোভালেস্কির মতে কিন্তু ঐ সমাজ ব্যবস্থার আবির্ভাবই ঘটে মুসলিমদের আগমনের সময় থেকে। অর্থাৎ প্রথম দুই বিশেষজ্ঞের মতে যে যুগটা ছিল ভারতীয় ফিউড্যালিজমের পতনের যুগ তাকেই অন্য এক বিশেষজ্ঞ চিহ্নিত করেন ঐ একই ব্যবস্থার উত্থানের যুগ বলে। অধ্যাপক শর্মা ও যাদব পদানুসরণ করেন যে কোশাম্বির তিনি আবার ফিউড্যালিজমের পতনের কালকে সপ্তদশ শতাব্দীতে স্থাপিত করেন।(৬) এদিকে কর্ণেল টড্ ঊনবিংশ শতাব্দীর রাজস্থানে এমন সমাজব্যবস্থার অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন যা তাঁর কাছে মনে হয় ফিউড্যাল ব্যবস্থার আদর্শ প্রতিরূপ। পণ্ডিতে পণ্ডিতে তারিখ নিয়ে তর্ক থাকতেই পারে। কিন্তু একই সময়কে যদি কোন এক বিশেষজ্ঞ জন্মলগ্ন বলে সূচিত করেন, দ্বিতীয় এক বিশেষজ্ঞ যদি তাকেই মৃত্যুলগ্ন বলে সূচিত করেন, এবং তৃতীয় এক বিশেষজ্ঞ যদি জন্ম ও মৃত্যু উভয়কেই

ঐ কালের থেকে অনেক দূরে স্থাপিত করেন তো আমাদের মতো সাধারণ ইতিহাস পাঠকের মনে সন্দেহ না জেগেই পারে না সত্যিই কতটা নির্ভরযোগ্য ভিতের উপর বিশেষজ্ঞরা তাঁদের ইমারৎগুলি খাড়া করছেন :

যেসব ঐতিহাসিকেরা ফিউড্যালিজম্ কথাটিকে ভাসাভাসা ভাবে ব্যবহার করেন, যাঁরা কৃষিনির্ভর যে কোন সমাজকে, বা বহির্জগতের সঙ্গে ক্ষীণ বাণিজ্যিক যোগাযোগে যুক্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি সমন্বিত যে কোন সমাজব্যবস্থাকে ফিউড্যালিজম্ আখ্যা দিয়ে ভারতীয় ইতিহাসে সেই আখ্যা প্রয়োগ করেন, তাঁদের সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হওয়ার কিছু নেই। শিল্প-বিপ্লবের পূর্ববর্তী প্রাক্-ধনতান্ত্রিক কিন্তু দাসপ্রথা ব্যতিরেকে যে কোন সমাজব্যবস্থাকেই যদি ফিউড্যাল্ আখ্যা দেওয়া হয় তো ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী যে কোন কালের ভারতীয় সমাজকে ফিউড্যাল্ আখ্যা অবশ্যই দেওয়া যেতে পারে। আমাদের শুধু বক্তব্য এই যে সেই আখ্যা দেওয়ার মধ্যে কোনই তাত্ত্বিক সার্থকতা থাকে না।

তর্কের জন্য আমরা সামনে রাখব শর্মা ও যাদব অধ্যাপক যুগলের সংজ্ঞা ও যুক্তিগুলিকে। তাঁদের সংজ্ঞাকে অধ্যাপক শর্মা নিজে এইভাবে পেশ করেছেন : "ইউরোপের সমাজব্যবস্থার অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের মনে হয় সামন্ততন্ত্রের রাষ্ট্রনৈতিক তাৎপর্য ভূমির সাংগঠনিক এবং প্রশাসনিক কাঠামোর উপর নির্ভরশীল। এর অর্থনৈতিক তাৎপর্য ভূমি-দাস প্রথার উপর নির্ভরশীল যে ব্যবস্থায় জমির সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্কযুক্ত প্রকৃত জমিচাষীরা প্রত্যক্ষ-ভাবে জমি পায় না, পায় মধ্যবর্তী ভূস্বামী-শ্রেণীর কাছ থেকে এবং তাদেরই নিজ উৎপাদিত ফসল এবং কায়িক শ্রম দিয়ে খাজনা পরিশোধ করে। এই ব্যবস্থা অবশ্য স্বনির্ভর অর্থ-নীতিব্যবস্থা সৃষ্টি করে। এই অর্থনীতিব্যবস্থায় স্থানীয়ভাবে চাষীদের ও মালিকের ভোগের জন্যই সামগ্রী উৎপাদিত হত—বাজারে বিক্রির জন্য নয়।"(৭)

এই সংজ্ঞার উপর ভিত্তি করে কি ধরণের যুক্তি ও ঐতিহাসিক নজির এই অধ্যাপকদ্বয় উপস্থিত করেছেন, তাঁদের বিপক্ষেই বা কি জাতীয় যুক্তি ও নজির অন্য পণ্ডিতেরা উপস্থিত করেছেন অথবা আমরা নিজেরা করতে পারি এবার তার আলোচনায় রত হব। অধ্যাপক শর্মা ও যাদব তাঁদের ভারতীয় সামন্ততন্ত্র সম্পর্কিত যুক্তির ইমারৎকে খাড়া করেন যে ভিত্তি প্রস্তরের উপর তা হল ব্রাহ্মণদের ভূমিদান ও গ্রামদান, যার প্রচুর উল্লেখ বিভিন্ন শিলালিপি, তাম্রলিপি ও অন্য বিভিন্ন সাক্ষ্য চিহ্নে পাওয়া যায়। এই দান করা ভূসম্পত্তিগুলিকে তাঁরা ইউরোপীয় ফিউড্যালিজমের fief-এর গুণাবলীর প্রতিচ্ছায়া দেখেন। দানগ্রহীতার ভূমিকাকে তাঁরা দেখেন ইউরোপীয় vassal-এর ভূমিকার সমরূপে।

Manor জাতীয় কোন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ভারতীয় কৃষিব্যবস্থায় কোন কালেই ছিল না এই কথা সকলেই মেনে নিয়েছেন, এঁরাও মেনে নেন। Manor-এর ভিতরে কর্ষণকারী শ্রমিকেরা যেভাবে মালিকের জমি চাষ করত এক সময়, অন্য সময় নিজেদের (স্বত্বহীন) জমি চাষ করত সেই রকম কোন ব্যবস্থার সপক্ষে কেউই কোন কথা বলেননি। manor-এর আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা না থাকলেও serfdom-কে মরিস্ ডব্ যে ব্যাপক (যথা, বাধ্যতা-মূলক শ্রমপ্রদান) অর্থে নিয়েছেন সেই অর্থে গ্রহণ করলে অবশ্য তার অস্তিত্বের সপক্ষে কিছু কিছু সাক্ষ্য পাওয়া গিয়েছে। বেগার খাটার রেওয়াজ কমবেশী পরিমাণে ঐতিহাসিক

বিভিন্ন পর্বে অশংই ছিল। কিন্তু এই বেগার খাটাকে মরিস্ ডবের অর্থে serfdom বলে মনে করে নেওয়াতে দুইটি আপত্তি তোলা হয়েছে। প্রথম আপত্তি এই যে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে বেগার খাটুনিটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হত উৎপাদনের ক্ষেত্রের বাইরে, ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের পারিবারিক প্রয়োজন তথা শাসনব্যবস্থা ও পৌরব্যবস্থার বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাবার জন্য। (৮) দ্বিতীয় আপত্তি এই যে এ প্রয়োগ যেখানেই ঘটুক বেগার খাটুনির প্রচলন কোন সময়ই খুব ব্যাপক ছিল না। (৯)

কর্ষণকারী শ্রমিকদের জমির সঙ্গে যুক্ত থাকার সপক্ষে যুক্তি হিসাবে অধ্যাপক শর্মা যা বলেন তা এই যে যখন গ্রামদান করা হত তখন গ্রামের অধিবাসীরাও সকলেই মিলিতভাবে দাতার ক্ষমতা থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গ্রহীতার ক্ষমতার আওতায় এসে পড়ত। এই প্রসঙ্গে নানাবিধ আপত্তি তোলা হয়েছে। গ্রামদানের সঙ্গে রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ক্ষমতার কিছু কিছু অংশ যে দানগ্রহীতার হস্তে অর্পিত হত তা মেনে নেওয়া হলেও ক্ষমতার কোন অংশ হস্তান্তরিত হত, কোন অংশ হত না এই বিষয়ে সাক্ষ্যও অপ্রতুল, বিতর্কও প্রচুর। এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা যা উল্লেখযোগ্য তা এই যে ইউরোপীয় ফিউড্যালিজমের ক্ষেত্রে জমির সঙ্গে serf-দের বদ্ধ থাকার অবস্থাটা বহাল ছিল শুধু ঐ ব্যবস্থার প্রাথমিক পর্বে। পরবর্তীকালে ঐ বন্ধনদশা অনেক দূর শিথিলতাপ্রাপ্ত হয়েছিল, ফিউড্যাল্ ব্যবস্থার অভ্যন্তরেই। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই জমির সঙ্গে বদ্ধ থাকার অবস্থার সপক্ষে অধ্যাপক শর্মা আরও নজির উপস্থিত করেছেন দেখাতে যে উৎপাদকদের স্বাধীনতা ছিল না গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার। এই যুক্তিকে খণ্ডন করতে অধ্যাপক হরবনস্ মুখিয়া (১০) বলেছেন যে, এই নিজ গ্রামে আবদ্ধ থাকার পিছনে কোন প্রকার প্রশাসনিক বা অন্য জাতীয় জোর জবরদস্তির ভূমিকা ছিল না। তারা আবদ্ধ থাকত অন্যত্র যাওয়ার অর্থনৈতিক সুযোগের দরুণ। অপর এক প্রতিবাদী অধ্যাপক ডি. সি. সরকার বিরুদ্ধ যুক্তি দেন এই বলে যে তৎকালীন ভারতবর্ষে রাজারও ক্ষমতা ছিল না কোন গ্রামবাসীকে কোন এক বিশেষ গ্রামে আবদ্ধ রাখার। (১১) সুতরাং দান গ্রহীতার উপর সেই ক্ষমতা বর্তাতেই পারে না। তাঁর মতে দান করার পর গ্রামবাসী ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্কের পরিবর্তন এইটুকু ঘটত যে আগে যে ব্যক্তি রাজস্ব দিত নৃপতিকে পরে সেই ব্যক্তি রাজস্ব দিত দানগ্রহীতাকে। তাছাড়া আরও একটি প্রতিবাদী বক্তব্য এই যে রাজার ক্ষমতা যাই থাকুক, জমিদান বা গ্রামদান তো শুধু রাজারাই করত না, অন্য অনেক বিত্তশালী ব্যক্তিই করত। তাদের নিশ্চয় কোন ক্ষমতা থাকত না দান করে দেওয়া গ্রামের অধিবাসীদের নাগরিক অধিকারের কোন হেরফের করার।

এইবার vassal-এর প্রসঙ্গে আসা যাক। রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে ইউরোপের ইতিহাসে রাজা ও vassal-এর মধ্যে যে ধরণের সম্পর্ক ছিল আর ভারতবর্ষীয় ইতিহাসে নৃপতির সঙ্গে সামন্তের যে সম্পর্ক ছিল তা যে নিকট স্থানীয় তা আগেই বলা হয়েছে। ঊর্ধ্বমূল বৃক্ষের শাখাপ্রশাখার মত এক স্তর থেকে অন্য স্তরে ছড়িয়ে পড়া যোগসূত্রদের দ্বারা যুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীভবন ইউরোপে যে প্রকার ঘটেছিল তার অনুরূপ ঘটনা শুধু ভারতবর্ষে নয় অন্যান্য বহু দেশেই বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক

পরিবেশে ঘটেছিল। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। রাজ্যের বা সাম্রাজ্যের পরিসরের তুলনায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যখনই দুর্বল হয়ে পড়ে তখনই রাষ্ট্র পরিচালনা করার পক্ষে এই ধরণের ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকতা উপযোগী হয়ে ওঠে। রাষ্ট্র ক্ষমতার দুর্বলতার পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় অধিবাসীরা যে কোন ক্ষমতাশালী ব্যক্তির কাছে শরণার্থী হবে এবং একইকালে ঐ ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা যে নিজেদের ক্ষমতাকে বজায় রাখার জন্য নিজেদের আশেপাশে বিশ্বাসভাজন অধস্তন ব্যক্তিদের সমাবেশ চাইবে তাও সহজবোধ্য। এই প্রকার বিকেন্দ্রিত ক্ষমতার সঙ্গে ভূসম্পত্তির সংস্রব থাকবে তাও নিতান্তই স্বাভাবিক। শিল্পবিপ্লবের পূর্ববর্তীকালে ভূসম্পত্তিই ছিল একমাত্র মূল্যবান সম্পত্তি। খেটেখাওয়া মানুষ ছাড়া বাদ বাকি সকলেরই আয়ের উৎস ছিল কৃষিযোগ্য জমির উপর এমন কোন প্রকার স্বত্ব যার দৌলতে উৎপাদনের একভাগ আত্মসাৎ করা যায়। কিন্তু এই স্বত্বের নানান প্রকারভেদ ছিল। ইউরোপের জমির মালিক যে যে ধরণের অধিকার ভোগ করত তাদের অনেকগুলিই ব্রিটিশদের আগমনের পূর্বের ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল না। এই কারণে প্রাক্-ব্রিটিশ যুগের ভারতবর্ষে ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানাই ছিল না এইরকম একটি মত বেশ কিছুদিন যাবৎ ব্যাপক আকারে গৃহীত ছিল। সম্প্রতিকালে অবশ্য এই মতকে অতিসরলীকরণ দোষে দুষ্ট বলে পণ্ডিত সমাজে একঘরে করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাই বলে ইউরোপের ভূমির উপর স্বত্বাধিকারের সঙ্গে আমাদের দেশের ভূমি সম্পর্কিত অধিকারের মধ্যে যে আকাশ পাতাল তফাৎ ছিল তা নিশ্চয় মিলিয়ে যায়নি। মুসলমান আমলের জায়গীরদারদের জায়গীর এবং হিন্দু আমলের ব্রহ্মদেয় জাতীয় ভূসম্পত্তিকে এক কথায় ইউরোপীয় সমাজের fief-এর প্রতিরূপ বলে মেনে নিতে অনেক ঐতিহাসিকের সংগতভাবেই প্রবল আপত্তি আছে। এই প্রসঙ্গে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিরুদ্ধবক্তব্য রাখা হয়েছে। প্রথমত, ইউরোপীয় ফিউড্যাল সমাজে বেতন প্রথা ছিল না, রাষ্ট্রের কর্ণধারদের এবং তাদের অধস্তন কর্মচারীদের পারিশ্রমিক দেওয়া হত fief-এর মাধ্যমে। এর অনুরূপ ব্যবস্থার সপক্ষে কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ অধ্যাপক শর্মা বা যাদব দিতে পারেননি। তাঁরা যুক্তি দেন এই বলে যে ব্রাহ্মণদের যখন অর্থ না দিয়ে ভূমি অনুদান করা হত তখন রাষ্ট্রের অন্য কর্মচারীদের মুদ্রায় বেতন দেওয়া হত মনে কেন করা হবে? তাদেরও জমি অনুদান করা হত ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এতো নিতান্তই অনুমান। এই রকম অনুমানের উপর ভিত্তি করলে তো প্রাণে যা চায় অনেক কিছুই অনুমান করে নেওয়া যায়। তাছাড়া রাজকর্মচারীদের পারিশ্রমিক দেওয়া এবং ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করা—এই দুইয়ের মধ্যে তুলনাই বা আসে কি করে? এই প্রসঙ্গেই তোলা হয়েছে দ্বিতীয় আপত্তিটি। অধ্যাপক সরকার দেখিয়েছেন যে ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করার যে সব উল্লেখ বিভিন্ন লিপিতে পাওয়া যায় তাদের মধ্যে একটি বিষয় খুবই পরিষ্কার। তা এই যে দানগ্রহীতাকে ঐ দানের দ্বারা কোনভাবেই দায়বদ্ধ করা হত না। বিশেষ করে বেগার শ্রমের যোগান দেওয়ার কোন দায় (obligation অর্থে)-ই গ্রহীতার উপর বর্তাতো না। সৈন্য সরবরাহ করার তো প্রশ্নই ওঠে না। ব্রাহ্মণেরা সৈন্য সরবরাহ করবে কি? বাস্তবিকপক্ষে এই বিষয়ে তো রহস্যের কোনই অবকাশ নেই। ব্রাহ্মণদের কেন জমিদান করা হত তা তো খুবই স্পষ্টাস্পষ্টিভাবেই স্বীকৃত ও জ্ঞাত। তাদের জমিদান করা হত পুণ্যের লোভে। ব্রাহ্মণেতর দানগ্রহীতাদের উপর কোন কোন সামাজিক দায়

এসে পড়ার নজির পাওয়া যায়, যেমন অধ্যাপক মাইতি উল্লেখ করেছেন দানকর্তা রাজাকে সামন্ত কর্তৃক কন্যা সম্প্রদান করার দায়ের কথা। (১২) কিন্তু এসব কিছুর সঙ্গে যে fief এর সঙ্গে vassal-এর উপর যে জাতীয় দায় বর্তাতো তার কোন তুলনা চলে না সেই সিদ্ধান্তে একমত হয়েছিলেন এই বিষয়ের উপর অনুষ্ঠিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি আলোচনা চক্রে সমাবিষ্ট পণ্ডিতকুলের অধিকাংশ। (১৩)

আরও একটি জরুরি কথা অধ্যাপক সরকার বলেন। তা এই যে দানগ্রহীতা ব্রাহ্মণের সামাজিক অবস্থান কখনই দানকর্তার অধস্তন ছিল না। ব্রাহ্মণেরা ও মন্দিরের পুরোহিতরা ভারতীয় ঐতিহ্যে সমাজের শীর্ষস্থানে অবস্থান করত, দান গ্রহণ করার পরও তার কোন ইতরবিশেষ হত না। এই প্রত্যেকটি বিষয়েই ইউরোপীয় fief-এর সঙ্গে ভারতবর্ষের দান করা ভূসম্পত্তির তফাৎ আকাশপাতাল। ইউরোপের vassal-রা হত যোদ্ধশ্রেণীর (যদিও অনেক fief জাতীয় ভূসম্পত্তি চার্চের অধিকারভুক্ত ছিল বটে)। অধ্যাপক শর্মা নিজেই লেখেন যে ইউরোপীয় fief ব্যবস্থার এবং সেই কারণে ফিউড্যাল্ ব্যবস্থার মূল মন্ত্রই ছিল অধস্তন ব্যক্তির উপর আরোপিত কিছু নির্দিষ্ট দায় (obligations)। তাঁর নিজেরই এই স্বীকৃতির দরুণ তাঁকে চেষ্টা করতে হয় সাক্ষ্যপ্রমাণ দেওয়ার যে ব্রাহ্মণেতর অন্যদেরও ভূমি অনুদান করার রেওয়াজ ছিল। বিশেষ করে যুদ্ধের সময় সৈন্য সরবরাহ করতে হবে এমন স্বত্বযুক্ত ভূমি অনুদানের উল্লেখ পাওয়া যায় বলে তিনি দাবী করেন। পাওয়া হয়তো যায়, যদিও তা সব পণ্ডিত মেনে নেন না। কিন্তু অধ্যাপক শর্মা ও যাদব নিজেরাই তাঁদের মতবাদের ভিত্তিকে স্থাপন করেছেন ব্রাহ্মণদের ভূমিদানের প্রচলনের উপর। ঐ বিশেষ দানের সপক্ষেই তাঁরা সমাবিষ্ট করেছেন তাঁদের সাক্ষ্যপ্রমাণ। অন্য ধরণের ভূমি অনুদানের কথা তাঁরা তুলেছেন বটে কিন্তু নিজেরাই 'কিন্তু' 'কিন্তু' করেছেন তাঁদের সাক্ষ্যপ্রমাণগুলি ব্যতিক্রম স্থানীয় বলে।

Commendation-এর প্রতিষ্ঠান এবং তৎসংক্রান্ত homage-এর অনুষ্ঠানের প্রসঙ্গে বিতর্কের বিশেষ অবকাশ নেই। ভারতীয় ফিউড্যালিজমের প্রবক্তারাও মেনে নেন যে এদের সঙ্গে তুলনীয় রীতি বা আচার আমাদের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। এই বিষয়টিকে বিতর্কে রত ঐতিহাসিকদের কোন পক্ষই মনে হয় বিশেষ গুরুত্ব দেননি। বর্তমান লেখকের মতে কিন্তু এই বিষয়টি চূড়ান্তরকমে গুরুত্বপূর্ণ। কেন, তার আলোচনা যথাস্থানে করা হবে।

মার্ক ব্লকের পঞ্চম ও অন্তিম মূল লক্ষণটি, যথা সমাজে যোদ্ধশ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদের প্রাধান্য, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় হিন্দুসমাজের সম্পর্কে কতটা প্রযোজ্য তাও তর্ক-সাপেক্ষ। এক অর্থে অবশ্যই জোর যার মুল্লুক তারই ছিল। ক্ষত্রিয় নৃপতি ও সামন্তরা যে সাধারণ দেশবাসীর উপর কর্তৃত্ব করত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। রাষ্ট্র পরিচালনায় ক্ষত্রিয়দের স্থান যে ছিল সর্বোচ্চে সেই ঘটনাকে মার্ক ব্লক কথিত পঞ্চম মূল লক্ষণের সপক্ষে উল্লেখ করা চলতে পারত। কিন্তু গোল বাঁধিয়েছেন তো অধ্যাপক শর্মারা নিজেরাই। কারণ তাঁরা যে তাঁদের সামন্ততন্ত্রের ভিত্তিই স্থাপন করেছেন ব্রাহ্মণদের প্রদত্ত ভূমিদানের উপর। কিন্তু অনেক বেশী যা গুরুত্বপূর্ণ তা এই যে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণদের স্থান ছিল ক্ষত্রিয়দের উপরে। ইউরোপের ইতিহাসে চার্চ ও রাজশক্তির মধ্যে বরাবরই

একটা রেশারেশি এবং কোন কোন অবস্থায় লড়াইয়ের সম্পর্ক থেকে গিয়েছিল। ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে সেইরকম কোন ক্ষমতার লড়াইয়ের কথা আমাদের ইতিহাসে নেই। পৌরাণিক যুগে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের মধ্যে প্রতিযোগিতার উপাখ্যান যদি কোন রেশারেশির ইঙ্গিত বহন করে তো তার পর থেকে চিরকালের তরে ক্ষত্রিয়রা মনে হয় ব্রাহ্মণদের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছিল। এই শেষ নেতিবাচক যুক্তির সূত্র ধরে আমরা এবার আমাদের ইতিবাচক বক্তব্যে আসব।

৪

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যেভাবে ভারতীয় ফিউড্যালিজমের সপক্ষে যুক্তিগুলিকে খণ্ডন করার চেষ্টা করেছি তাতে ঐতিহাসিকদের মধ্যে যে বিতর্ক চলেছে তারই ধারা অনুসরণ করেছি। অর্থাৎ ইউরোপীয় ফিউড্যালিজমের লক্ষণগুলিকে একটি একটি করে নিয়েছি এবং তার সপক্ষে ও বিপক্ষে যে যুক্তি ও সাক্ষ্য দেওয়া যায় তাদের আলোচনা করেছি। বর্তমান লেখকের কিন্তু এই বিশেষ বিষয়টিতে এই পদ্ধতি অনুসরণ করায় ঘোর আপত্তি আছে। এ যেন একটি হাতীকে উট বলে ডাকার সপক্ষে যুক্তি দেওয়া এই ধরণের: দেখ হাতীরও চারটি পা উটেরও চারটি পা। হাতীরও একটা ল্যাজ উটেরও একটা ল্যাজ। এবং বিপক্ষ যুক্তি দেওয়া এই বলে, হাতীর শুঁড় আছে উটের নেই। উটের কুঁজ আছে হাতীর নেই। যে কোন চক্ষুষ্মান ব্যক্তিই দেখতে পায় যে হাতী ও উট সম্পূর্ণ ভিন্ন দুইটি জন্তু। হাতী ও উটের মধ্যে অবশ্যই অনেক সাদৃশ্য আছে। জীববিজ্ঞানের taxonomy-তে তাদের একত্র করে দেখার যুক্তিও আছে। কিন্তু আমি যদি সহস্র সহস্র জীবজন্তুকে শতশতভাগে শ্রেণীবদ্ধ করার কাজে রত না হয়ে থাকি, আমার সামনে যদি থাকে গুটি কয়েক মাত্র জন্তু, আমার যদি মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে তাদের মধ্যে হাতী নামক জন্তুটার ব্যবহার প্রণালী ও জীবন পদ্ধতি বুঝে দেখা তো হাতীটাকে উট জাতীয় এক জীব বলে না দেখে তাকে হাতী বলে পর্যবেক্ষণ করাই বিজ্ঞান সম্মত বলে মনে করি। অলঙ্কার বাদ দিয়ে আমার বক্তব্যটা সাদা ভাষায় এই। চোখের উপর দেখতে পাচ্ছি ভারতীয় সমাজব্যবস্থার গঠনে প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এমন অনেক কিছু যার কোন ভূমিকাই ইউরোপীয় মধ্যযুগে ছিল না। চোখের উপর দেখতে পাচ্ছি ইতিহাসে আমাদের সমাজব্যবস্থা যেভাবে বিবর্তিত হয়েছে তা ইউরোপীয় ফিউড্যাল্ সমাজের বিবর্তনের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এই সমাজব্যবস্থার গতিপ্রকৃতিকে বুঝতে গেলে এবং সেই বোঝাকে ধারণ করার জন্য যদি কোন তাত্ত্বিক আধারের প্রয়োজন বোধ করা হয় তো সেই আধারকে ভারতীয় ইতিহাসের মালমসলার সাহায্যেই তৈরী করে নিতে হবে, ইউরোপ থেকে ধার করে আনা কোন 'তন্ত্রে'র সাহায্যে ফল হবে না।

এই কাজটিতে হাত দেওয়া হয়েছে বলেও বর্তমান লেখকের জানা নেই। এই কাজটিকে সম্পন্ন করা তো দূরের কথা তার সূত্রপাত করাও এই প্রবন্ধের পরিসরে সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন যে বিরাট জ্ঞানযজ্ঞের তা সম্পন্ন করতে হলে লাগবে অনেক অনেক

পণ্ডিতের সারা জীবনের জ্ঞানচর্চা। এই প্রবন্ধে যেটুকু করতে পারি তা শুধু কয়েকটি ইঙ্গিত দেওয়া।

আমাদের দেশের সমাজব্যবস্থাকে বোঝার কাজে একটি তাত্ত্বিক আধারের আবশ্যকতার সপক্ষে একটি জোরাল যুক্তি দেওয়া যায়। তা এই যে এই সমাজকে গঠন করাই হয়েছিল একটি সুসংবদ্ধ তাত্ত্বিক ধাঁচ অবলম্বন করে। সমাজ জিনিসটা সচরাচর আপনা আপনি গড়ে ওঠে, তা কোন সচেতন মনের পরিকল্পনার ফল নয়। কিন্তু প্রাচীন ভারতের সমাজ এই নিয়মের এক ব্যতিক্রম। বিশ্বের ইতিহাসে আর কোন সভ্যতার কথা ভাবা যায় না যাতে তুলনীয়ভাবে মানুষের সমাজজীবনকে ছকে ফেলা কোন এক বিশেষ আকার ও গড়ন দেওয়া হয়েছিল। সে ছকের ভিত্তি ছিল এক সমাজ জীবন ও বিশ্ব সম্পার্কিত দর্শন, যার মূল নীতিগুলির মধ্যে ছিল এক আশ্চর্য সংগতি। আমি প্রাচীন ভারতের শাস্ত্রদের কথা বলছি, যাতে রাষ্ট্র পরিচালনা ও সামাজিক আচার বিচার থেকে শুরু করে কবিতার ছন্দ, মন্দিরের গঠন প্রণালী, নরনারীর কামক্রিয়া ইত্যাদি সমাজ সংসার ও জীবনের গুরুলঘু সব কিছুকেই বিচার করে বিশ্লেষণ করে শ্রেণীবিভাগ করে গুণে গেঁথে কার কি করণীয় আর কার কি পরিহার্য সবই চিরকালের জন্য নিয়ঃবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতাদের ক্ষেত্রেও যে এই জাতীয় শাস্ত্রীয় প্রচেষ্টা করা হয়নি তা বলছি না। কিন্তু আমাদের দেশের প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা তাঁদের সমকালে এবং পরবর্তী বর্তমান যুগ পর্যন্ত সবকালে তাঁদের পরিকল্পনা এবং আদর্শগুলিকে রূপায়িত করার ব্যাপারে যে পরিমাণে সফল হয়েছিলেন তার কোন তুলনা অন্য কোন সভ্যতার ইতিহাসে পাওয়া যায় বলে আমাদের জানা নেই।

সমাজব্যবস্থা সম্পার্কিত প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রকারদের যে মৌলিক পরিকল্পনার কথা বলছি তার দুইটি বিশেষ গুণের কথা আমরা আলোচনা করব। এক হল বর্ণের কাঠামো আর দ্বিতীয় হল সেই কাঠামোকে ধারণ করে রাখার উপযুক্ত এক ধর্ম। আদিতে উৎপাদিকাশক্তিদের বিকাশের জন্যই নিশ্চয় জাতিপ্রথার প্রবর্তন করা হয়েছিল। কারণ সেই পর্যায়ে প্রথাটি শ্রমের এক বিভাজন পদ্ধতি ছাড়া কিছুই ছিল না। শ্রমের বিভাজন ব্যতীত যে উৎপাদনের শাস্ত্রের সম্প্রসারণ সম্ভব নয় তা অর্থনীতির অন্যতম মূল সূত্র। সমাজকে স্থিতিস্থাপকতা দেওয়ার জন্য শাস্ত্রকারেরা এই শ্রমের বিভাজনকে একদিকে করে দিলেন মানুষের জন্মগত অবস্থার অন্তর্গত, অপরদিকে ঐ ধর্মের মূল অনুপ্রেরণাকে করা হল ব্যক্তি কর্তৃক জন্মের দ্বারা নির্ধারিত ও বর্ণের দ্বারা নির্দিষ্ট সামাজিক অবস্থান ও কর্তব্যকে বিনা প্রতিবাদে মেনে নেওয়া। প্রবন্ধের পূর্বেকার এক অংশে উল্লেখ করেছি যে অধিকাংশ মার্ক্সবাদী ভাবনায় উপরিস্থিত কাঠামোর তুলনায় ভিত্তি-কাঠামোর উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে। বর্তমান লেখকের মতে উপরিস্থিত-কাঠামো ভিত্তি-কাঠামোর দ্বারা একতরফাভাবে নির্ধারিত হয়ে যায় এই তাত্ত্বিক ধারণাটা ভ্রান্তিপূর্ণভাবে কার্ল মার্ক্সের উপর আরোপ করা হয়েছে। উপরিস্থিত-কাঠামো ও ভিত্তি-কাঠামো একে অপরকে প্রভাবান্বিত করে এই ধারণাটাই অধিকতর বৈজ্ঞানিক ও ইতিহাসসম্মত বলে মনে করি। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় এই দুই কাঠামোর একটি অধিকতর গুরুত্ব অর্জন করতেই পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে উপরিস্থিত-কাঠামো হয়ে উঠতে পারে ভিত্তি-কাঠামোর

তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী। বর্তমান লেখকের মতে এই ঘটনাই ঘটেছে ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাসে। উৎপাদিকা শক্তিদের বিকাশ উপরিস্থিত কাঠামোর অন্তর্গত জাতিপ্রথা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও ধর্মের অন্তর্গত রীতিনীতি আচারবিচার ধ্যানধারণা ইত্যাদিকে পরিবর্তিত করতে পেরেছে অনেক কম, পরন্তু ঐ জাতিভিত্তিক কাঠামো এবং ঐ ধর্মই উৎপাদিকাশক্তিদের কণ্ঠনালীকে চেপে ধরে রেখে তাদের শ্বাসরোধ করে তাদের বিকাশ করেছে অবরুদ্ধ। ইউরোপের ইতিহাস সম্বন্ধে যদি এই তত্ত্ব ঠিক হয়ে থাকে যে উপরিস্থিত-কাঠামোর মধ্যে গুণগত পরিবর্তন এসেছে ভিত্তি-কাঠামোর মধ্যে উৎপাদিকা-শক্তিদের বিকাশের প্রতিঘাতের ফল হিসাবে তো আমার বক্তব্য অনুসারে ভারতীয় সামাজিক ইতিহাস তার থেকে এক মৌলিক ভিন্নতা প্রদর্শন করে।

আরও দুইটি মৌলিক ভিন্নতার কথা উল্লেখ করব: প্রথমটি হল ভারতীয় সামাজিক ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকার নগণ্যতা। ইউরোপীয় ফিউড্যালিজমের অন্যতম মূল চিহ্ন commendation প্রথা ও তৎসংক্রান্ত homage-এর অনুষ্ঠানের উল্লেখ করার সময় বলেছিলাম যে এদের সঙ্গে তুলনীয় কিছুই যে ভারতীয় সামাজিক ইতিহাসে পাওয়া যায় না তার ওপর বিতর্করত পণ্ডিতেরা খুবই কম গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু বর্তমান লেখকের মতে তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মানুষের ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা সমাজে গুরুত্ব পেতে শুরু করেছে ইউরোপের রেনেসাঁসের যুগ থেকে। তার আগে ইউরোপীয় সমাজেও অন্য সব সমাজের মতই ব্যক্তি ছিল পরিবার ও সমাজের অন্তর্গত বিভিন্ন গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানের আওতার অধীনে। কিন্তু সংকীর্ণ হলেও ব্যক্তির নিজস্ব কিছু ভূমিকা ইউরোপীয় ফিউড্যাল সমাজেও ছিল। এই ভূমিকার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করার জন্যই আমরা মার্ক ব্লকের থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে homage অনুষ্ঠানটির কিঞ্চিৎ বিশদ বিবরণ দিয়েছি। পাঠক লক্ষ্য করবেন যে ঐ অনুষ্ঠানটির কর্তা ছিল দুইজন ব্যক্তি যারা স্বাধীনভাবে পরস্পরের সঙ্গে কোন এক সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য উদ্যত হয়েছে। ইউরোপীয় ফিউড্যালিজমের জটিল সমাজগ্রন্থনের মূল গ্রন্থিটি ছিল ঐ দুই একক ব্যক্তির মধ্যে তাদের নিজেদের উদ্যমে প্রতিষ্ঠিত এক শর্তের বন্ধন। এই রকম কোন ভূমিকার অধিকার ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যে কখনই কোন ব্যক্তি পায়নি। এই ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে ব্যক্তির ভূমিকা স্বল্প পরিসর বললে ঠিক বলা হয় না, বলতে হয় ব্যক্তির ভূমিকা ছিল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। সমাজে যে কোন ব্যক্তির স্থান জন্ম মাত্রই সারাজীবনের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যেত। তার পক্ষে এমন কিছুই করা সম্ভব ছিল না যা সমাজের গ্রন্থনে যোগ বা বিয়োগ করতে পারত। পাছে পাঠক ভুল বোঝেন একটি সতর্কবাণী বলে নিই। জাতিপ্রথাটি চিরদিন একরকম ছিল, তার মধ্যে কখনও কোন পরিবর্তন দেখা দেয়নি, এরকম কোন কথা একেবারেই বলা হচ্ছে না। চতুর্বর্ণ ভিত্তিক অতি সরল গঠন থেকে শুরু করে কালে কালে যে জাতিপ্রথা জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠেছিল, এবং তা যে হয়েছিল ঐ চতুর্বর্ণের কাঠামোর ভিতর নূতন নূতন অসংখ্য জাতির সৃষ্টি হওয়ার মধ্য দিয়ে সেই কথাটি সুবিদিত। বিভিন্ন জাতিদের মধ্যে উচ্চনীচ অবস্থানের সম্পর্কের মধ্যেও যে পরিবর্তন ঘটেছে তাও সমাজতাত্ত্বিকদের দ্বারা বহুলভাবে আলোচিত এক বিষয়।

আমি বলছি অন্য কথা। কোন একজন ব্যক্তি বিশেষের নিজের জীবদ্দশায় জাতিপ্রথাকে

অতিক্রম করে নিজের উদ্যমে কিছু করার স্বাধীনতা যতটুকু ছিল সেই কথা। মার্ক এক এক জায়গায় তাঁর বর্ণনা শুরু করেছেন এই বাক্য দিয়ে : "imagine two men face to face"। আমার বক্তব্য, এইরকম মুখোমুখি এক যুগলকে ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে কল্পনাই করা যায় না। কোন এক চণ্ডাল ব্যক্তি কোন এক ব্রাহ্মণ-ব্যক্তির সঙ্গে কখনই পারত না নিজেকে যুক্ত করতে কোন বিশেষ শর্তের দ্বারা। জন্মমাত্রই প্রতিটি চণ্ডাল ব্যক্তির প্রতিটি ব্রাহ্মণের সঙ্গে সম্পর্ক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নির্ধারিত হয়ে যেত।

ইউরোপীয় সামাজিক ইতিহাসের থেকে দ্বিতীয় যে প্রধান ভিন্নতা ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যকে চিহ্নিত করে তা হল এই। ইউরোপের শ্রেণীবিভক্ত স্তরনিবদ্ধ সমাজব্যবস্থাকে ধারণ করে রাখার জন্য প্রয়োজন হত (violence অর্থে) পীড়ন বা বলপ্রয়োগের। আমার বক্তব্য, ব্রাহ্মণ ঐতিহ্যে বলপ্রয়োগ এই জাতীয় কোন ভূমিকা পালন করেনি, পীড়নের স্থান গ্রহণ করেছিল ধর্ম। ইউরোপের দাসব্যবস্থায় দাসেদের শৃঙ্খলিত করে রাখা হত, তাদের চাবুক মেরে শায়েস্তা করা হত, পালাবার চেষ্টা করলে সৈন্যসামন্তদের দ্বারা ধরপাকড় করে তাদের ফিরিয়ে আনা হত, সমাজের উচ্চস্থানের অধিকারী নাগরিকদের প্রমোদের জন্য অবাধ্য দাসেদের শাস্তি দিতে ক্ষুধার্ত হিংস্র জন্তুদের সামনে ফেলে দেওয়া হত। ফিউড্যাল্ ব্যবস্থার সার্ফেরা লর্ডের উৎপীড়ন সহ্য করতে না পারলে manor ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করত, তাদেরও ধরে বেঁধে আনা হত, শারীরিক দণ্ড দেওয়া হত। কিন্তু আমাদের দেশের ইতিহাসে কোনদিন অচ্ছুৎরা অস্পৃশ্যতা প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে বলে জানা যায় না। শূদ্ররা বিনা প্রতিবাদে, বিনা বিদ্রোহে উচ্চবর্ণের ব্যক্তিদের সেবা করেই গিয়েছে। উচ্চতর বর্ণে আরোহণের পথ ছিল জন্মান্তরের সোপান বেয়ে এবং সেই আরোহণের প্রাথমিক শর্ত ছিল এই জন্মে নিজধর্ম পালন করে যাওয়া, যে ধর্মের মূল সূত্র নিজ অবস্থাকে মেনে নেওয়া বিদ্রোহকে যদি ইউরোপীয় মানসের অন্যতম প্রধান লক্ষণ বলে মনে করে নেওয়া যায় তো বিদ্রোহ না করা, বশ্যতা স্বীকার, নীতিস্বীকার করাকে ব্রাহ্মণ্য মানসিকতার সমগুরুত্ব সম্পন্ন মূল লক্ষণ বলে মানতে হয়।

শুধু জাতিভেদ বজায় রাখার ভূমিকাতেই নয়, সমাজে অন্য যত প্রকার বৈষম্য ও অবিচারকে প্রতিষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে তাদের সব ক্ষেত্রেই এই একই বিষয়টি লক্ষণীয়। ইউরোপীয় সমাজে যেখানে প্রয়োজন হয়েছে বলপ্রয়োগের, আমাদের সমাজে উদ্দিষ্ট সিদ্ধ হয়েছে ধর্মের প্রভাবে। উদাহরণ হিসাবে ভাবা যাক পুরুষদের দ্বারা নারীনিগ্রহের কথা। মধ্যযুগে ইউরোপে সৈন্যরা দূরবর্তীস্থানে যুদ্ধ করতে যাওয়ার সময় তাদের পত্নীদের অঙ্গে লাগিয়ে যেত এক বিশেষ ধাতু নির্মিত যন্ত্রকে যার নাম ছিল chastity belt, যার উদ্দেশ্য ছিল ঐ নারীদের সতীত্বকে তালাচাবি দিয়ে সুনিশ্চিত করা। এত করেও যে সেই পুরুষেরা খুব একটা নিশ্চিন্ত হতে পারত তা নয়, সুযোগ পেলেই যে স্ত্রীরা স্বামীদের ফাঁকি দিয়ে যেটুকু সম্ভব মজা লুটেপুটে নিত তার নিদর্শন ঐ যুগের ইউরোপীয় সাহিত্যে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। এই প্রকার গুরুমশায়কে ফাঁকি দেওয়া ইস্কুলপলাতক পড়ুয়ার মনোভাবের পরিচয় পৌরাণিক আমলের মুনিপত্নীরা হামেশাই দিতেন। কিন্তু তাঁদের শাস্ত্রকার পতিরা পরবর্তী সবকালের নারীদের একেবারে মজ্জার ভিতর সীতাসাবিত্রীর আদর্শকে এমনইভাবে প্রবেশ করিয়ে দিতে সমর্থ হন যে আর

কোনদিন হিন্দু পুরুষকে স্ত্রীদের সতীত্ব নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হয়নি। পুরুষেরা যত ইচ্ছা বিয়ে করেছে, বিবাহ বহির্ভূত যতপ্রকার নারীসংসর্গ সম্ভব. করেছে, কিন্তু তাদের পত্নীরা তাদের পাতিব্রত্যের আদর্শে অটল থেকে বিশ্ববাসীকে চমৎকৃত করে দিয়েছে। স্বামীর জীবিতকালে তার পাদোদক খেয়েছে, মৃত্যুর পর তার চিতায় আরোহণ করেছে। স্বেচ্ছায়, ধর্মের অনুপ্রেরণায়।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে বলপ্রয়োগের কোন ভূমিকাই ছিল না তা কিন্তু মোটেই বলা হচ্ছে না। অহিংসা নামক তথাকথিত আদর্শটি যা নাকি ভারতীয়দের ঐতিহ্যকে চিহ্নিত করে বলে বলা হয় তার কথা একেবারেই বলছি না। ওটি একটি বিরাট ধাপ্পা, বিংশ-শতাব্দীর ভারতবাসীদের আবিষ্কার। আমি যে হিংসার অভাবের কথা বলছি তা শুধু একটি বিশেষ ক্ষেত্রের সম্পর্কে, ক্ষেত্রটি হল সমাজে স্তরভেদ, শ্রেণীভেদ বজায় রাখার সামাজিক প্রয়োজন সিদ্ধি। এদেশের সামাজিক ইতিহাসে সংস্কারের কোন প্রচেষ্টা হয়নি তাও বলা হচ্ছে না। বুদ্ধ থেকে শুরু করে চৈতন্য পর্যন্ত সমাজসংস্কারকরা যে সামাজিক বিপ্লবের প্রচেষ্টা করেছিলেন তা সুবিদিত ও অনস্বীকার্য। কিন্তু ঐ সংস্কারকেরা সকলেই ছিলেন উচ্চবর্ণ ও উচ্চ শ্রেণীভুক্ত উদার হৃদয় সম্পন্ন ব্যক্তি। এঁদের উপর থেকে সংস্কার প্রচেষ্টা আর সমাজের নিম্নতম স্থানে স্থাপিত শোষিত বঞ্চিত জনগণের বিদ্রোহ নিশ্চয় এক কথা নয়।

রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সামন্তপ্রথা এবং উৎপাদন ব্যবস্থায় কৃষকদের নানাবিধ নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ থাকার অবস্থা, শুধু এই দুইটিকে নিয়ে বুঝবার চেষ্টা করলে ভারতীয় সমাজের বিবর্তনের ইতিহাসকে কিছুই বোঝা যাবে না বলে মনে করি। একদিকে সমাজের জাতিভিত্তিক কাঠামো অপরদিকে চূড়ান্ত রকমের বৈষম্য সমন্বিত ঐ কাঠামোকে ধারণ করে রাখার জন্য উপযুক্ত ধর্মের সমষ্টি, ভারতীয় সমাজব্যবস্থার এই দুই সার উপাদানের কোনটিকেই ইউরোপীয় ফিউড্যালিজমের ধারে পাশেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই কারণেই আমরা মনে করি যে ভারতীয় ইতিহাসকে বোঝার পক্ষে ফিউড্যালিজমের তাত্ত্বিক ধারণার আমদানি করাটা হয়েছে অত্যন্ত ক্ষতিকর। এই বোঝার জন্য একটি তাত্ত্বিক আধারের প্রয়োজন আছে তা আমরা আগেই স্বীকার করে নিয়েছি। এই আধারের আবশ্যিক উপাদান হতে হবে ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের ঐ দুই মূল লক্ষণ, বর্ণ কাঠামো ও ধর্ম যা একদিকে বিলোপ করে দেয় ব্যক্তির ভূমিকাকে, অপরদিকে অবান্তর করে দেয় সমাজ-ব্যবস্থাকে বহাল রাখার প্রয়োজনে বলপ্রয়োগকে। অত্যন্ত সুচতুর, আশ্চর্য রকমে দূরদর্শী, নির্লজ্জভাবে স্বার্থান্বেষী এবং তুলনাতীতভাবে সামাজিক বৈষম্যের সমর্থনকারী ব্রাহ্মণ শাস্ত্রকারদের দ্বারা আদিতে গঠিত আমাদের সমাজব্যবস্থাকে ধারণ করতে পারবে যে তাত্ত্বিক আধার তাকে নাম দিতে হলে দেওয়া যেতে পারে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রী। অবশ্য, নামে কিবা আসে যায়। সুতরাং এই বিশেষ নামকরণ নিয়ে তর্ক করার কিছু নেই। কিন্তু মধ্যযুগের ভারতীয় সমাজব্যবস্থাকে সামন্ততন্ত্র এবং আধুনিককালের ভারতীয় সমাজব্যবস্থাকে আধা-সামন্ততন্ত্র নাম দিলে যে অনেক কিছুই এসে যায় তার সপক্ষে বেশ কিছু যুক্তি এই প্রবন্ধে দিতে পেরেছি বলে মনে করি।